সোভিয়েত দেশ
পুস্তিকা

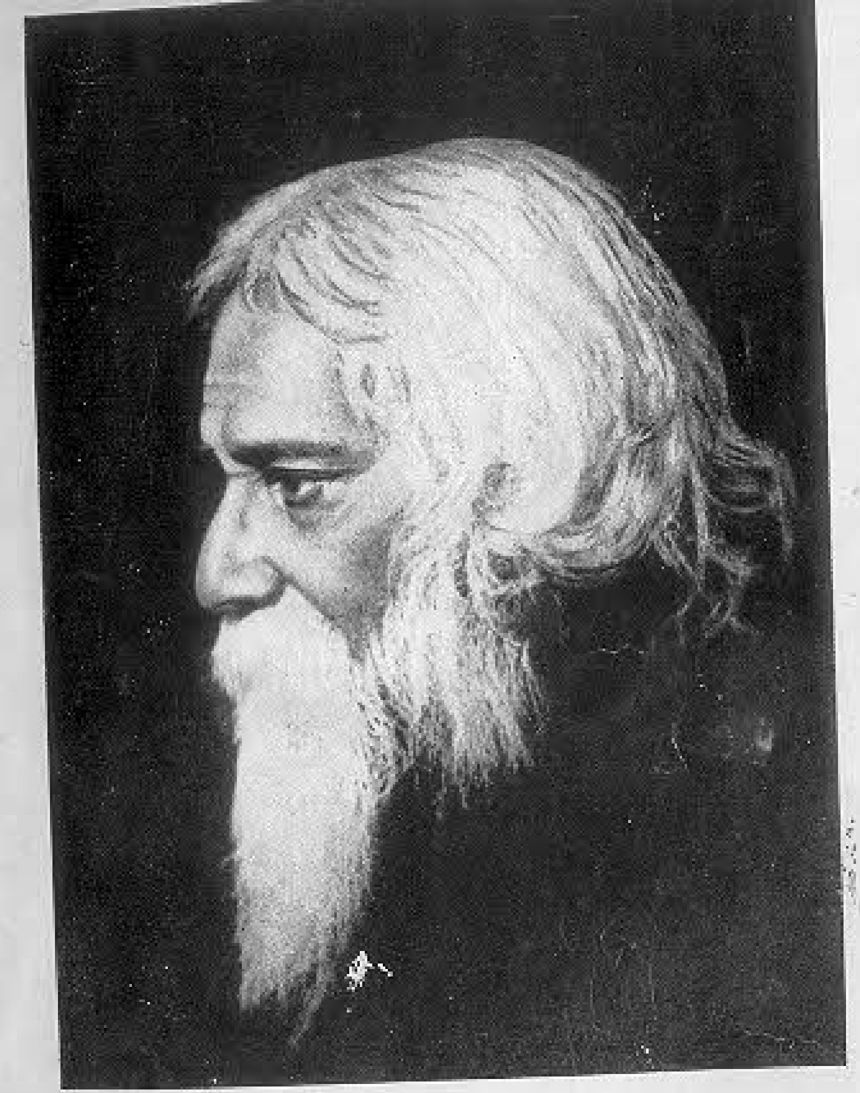

‘তীর্থদর্শন’এর পঞ্চাশ বছর

তীর্থদর্শন’এর পঞ্চাশ বছর

'তীর্থদর্শন'এর পঞ্চাশ বছর

সংকলন ও সম্পাদনা

শৈলেন চৌধুরী

1981

বই বইয়ের ঠিকানা

FIFTY YEARS OF 'PILGRIMAGE'

(An Anthology, in Bengali, on the occasion of 50th Anniversary of Rabindranath Tagore's visit to the Soviet Union)

Compiled & edited by
Sailen Chaudhuri

দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮১

সোভিয়েত রাষ্ট্রসংঘের কলিকাতাস্থিত দূতাবাসের বার্তাবিভাগের পক্ষে ওয়াই. কালাশনিকোভ কর্তৃক "সোভিয়েত দেশ" অফিস, ১৬, প্রমথেশ বড়ুয়া সরণি, কলিকাতা-৭০০০১৯ থেকে প্রকাশিত এবং "কালান্তর প্রেস", ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৭ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : তিন টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

মাত্র তিনমাসের মধ্যে " 'তীর্থদর্শনে'র পঞ্চাশ বছর" বইটির প্রথম মুদ্রণের সমস্ত কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। এ থেকেই বোঝা যায় বইটি পাঠক সমাজের কাছে সবিশেষ আদৃত হয়েছে এবং আমাদের প্রয়াস সার্থক হয়েছে।

ভারতের মহান কবি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অকৃত্রিম সুহৃদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের ৫০ বছর পূর্তির স্মারক হিসাবে ১৯৮০ সালে বইটি প্রকাশ করা হলেও এটির আরো যথেষ্ট চাহিদা লক্ষ করে আমরা বইটির পুনর্মুদ্রণ করছি। এই পুনর্মুদ্রণের বছরটিও আমাদের কাছে স্মরণীয় —কেনন এই ১৯৮১ সালেই কবির ১২০তম জন্মদিন। এই উপলক্ষে ভারতের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নেও কবির জন্মবার্ষিকী সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। বিশেষ উল্লেখ্য ছিল মস্কোতে ভারত ও বাংলাদেশের নাগরিকবৃন্দের ও কবির সোভিয়েত গুণমুগ্ধদের যুক্তভাবে সপ্তাহব্যাপী রবীন্দ্র-স্মরণ অনুষ্ঠান।

সত্বর ও সুষ্ঠুভাবে বইটির পুনর্মুদ্রণে যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। প্রচ্ছদের ছবিটি ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আমাদের ব্যবহার করতে দিয়েছেন বলে এই সুযোগে আমরা শ্রীবাসুদেব লাহিড়ী-কেও আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বই বইয়ের ঠিকানা

সূচীপত্র

ভূমিকা	৫
রবীন্দ্রনাথের 'এ জন্মের তীর্থদর্শন' —সত্যেন্দ্রনাথ রায়	১৭
সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্র-চর্চা —অধ্যাপক য়েভগেনি চেলিশেভ	২৯
মস্কোয় রবীন্দ্রনাথ	৪৩
রাশিয়ার চিঠি (নির্বাচিত অংশ)	৮৯

ভূমিকা

রাশিয়ার মানুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন ১৯১৪ সনে 'গীতাঞ্জলি' রুশ ভাষায় তর্জমা হবার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ভারতের জাতীয় চেতনার জাগরণের আলোকে কবি ও তাঁর রচনাকে সত্যিকার উপলব্ধি করবার পর্বটির উদ্বোধন হয়েছিল ১৯১৭ সনে রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের পরে।

রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিদর্শন করবার জন্যে সর্বপ্রথম আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান অকাদেমির দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯২৫ সনে ঐ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। তিনি এই আমন্ত্রণের দরুন ধন্যবাদ জানিয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন শেষ পর্যন্ত এতে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কবির ইওরোপ সফরকালে স্টকহোমে সোভিয়েত দূতাবাসের প্রথম সচিব আ. আরোসভ-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পরে আরোসভ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন মস্কোয় এই সাক্ষাৎকার ঘটলে সেখানে রুশ লেখক ও পাঠকগোষ্ঠী তাঁকে অন্তর দিয়ে বরণ করে নিতেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন তিনিও সেদেশে যাবার জন্যে উৎসুক। "আপনাদের দেশ, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, তুর্গেনেভ, চেখভ ও গোর্কির মাধ্যমে যা জেনেছিলাম, তা আর নেই। আপনাদের নতুন জীবনের নতুন সাহিত্য কবে আমাদের দরজায় উপস্থিত হবে আপাতত জানা নেই।" তিনি আরও বলেছিলেন, "হ্যাঁ, সত্যিই আপনাদের দেশ দেখবার আমার ইচ্ছা আছে। কিন্তু আমার কিছু বন্ধু বলেছেন আপনাদের দেশে যেতে গেলে ভিসা পাওয়া বড় কঠিন।" আরোসভ তখন জানিয়েছিলেন ভারতীয় কবি সাহিত্যিকদের সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে কোন অসুবিধা হবে না। কবি তখন বলেন, যদি লেখকগোষ্ঠী বা বুদ্ধিজীবী কোন সংস্থা তাঁকে আমন্ত্রণ পাঠায় তাহলে তাঁর ও সহযাত্রীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেতে সুবিধা হবে।

আ. আরোসভ পরে ভক্‌সের সভাপতি হিসেবে ১৯৩৭, ২৫ মে তারিখে পুনরায় সোভিয়েত ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখেছিলেন। লিখেছিলেন: "শুধু আমি নই, আমাদের সব বুদ্ধিজীবী ও আমাদের দেশের শ্রমজীবী জনগণ আমাদের দেশে আপনাকে আবার অতিথি হিসেবে পেলে খুবই আনন্দিত হবেন।"

বই বইয়ের ঠিকানা

১৯২৬ সনের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সংস্থা ভক্স রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করবার আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি পত্র পাঠায়। কবি তখন বার্লিনে ছিলেন, সেখানে সোভিয়েত দূতাবাসের প্রধান সচিব পত্রটি তাঁর হাতে দেন। তিনি এই আমন্ত্রণ ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করে সোভিয়েত সরকারকে একটি তার পাঠান। সেই তারবার্তায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, রাশিয়াকে তিনি জেনেছেন ও শ্রদ্ধা করেছেন তার মহান সাহিত্য পড়ে।

বার্লিনে এক সংবাদদাতার সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন : "এই যাত্রায় (ইওরোপে) খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাশিয়া যাব, দেখতে চাই তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, সলোভিওভের দেশ। তারপর মরলে আফশোষ নেই। খুবই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। আর আমার বেশি দিন নেই।… এই বুড়ো হৃদযন্ত্রটা এবার জানান দিয়েছে, আর সে বেঁচে থাকতে চায় না। তাই তাড়াতাড়ি রাশিয়া দেখে নিতে হবে।…মহান রুশ জাতি অন্তরের যে সম্পদ গড়ে তুলেছে তা বিশ্বসভ্যতার রত্নভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করেছে। গত কয়েক বছরের রক্তাপ্লুত ঘটনা সত্ত্বেও এখন তারা মহা ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়েছে।"

ইতিমধ্যে মস্কোতে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা ও শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে ভক্স ব্যাপক ব্যবস্থা করে, তাঁর অবস্থানকালের একটি কর্মসূচীও তৈরি করা হয়। অক্টোবর মাসে প্রাগে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধির কাছে কবি ও তাঁর সহযাত্রীদের জন্যে ভিসার আবেদন করা হয়। ১৯ অক্টোবর তারিখে সোভিয়েত বৈদেশিক মন্ত্রী গ. ও. চিচেরিন প্রাগস্থিত উক্ত প্রতিনিধিকে জানান : "শুধু ভিসা দেওয়াই নয়, পরন্তু নিশ্চয় করে আমাদের পক্ষ থেকে কবিকে যেন সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়।"

সব ঠিকঠাক। কিন্তু অকস্মাৎ কবি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শের জন্যে তিনি ভিয়েনায় গেলেন। আর অসুস্থতার দরুন শেষ পর্যন্ত ইওরোপ সফর অসমাপ্ত রেখেই রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরলেন।

১৯২৮ সনের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ভক্স রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে আর একবার পত্র পাঠায়। ১৯৩০ সনে কবি যখন পুনরায় ইওরোপ সফর করছিলেন সে সময় জেনেভায় অবস্থান-কালে তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়ন যাবার বন্দোবস্ত করা হয়।

কিন্তু কবির সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের আগ্রহে বাধা দেবার লোকের অভাব ছিল না। সরাসরি বাধা না দিয়ে নানা অসুবিধার অজুহাত তুলে কবিকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা হয়েছিল। তিনি নিজেই লিখেছেন : "আবার অনেকে আমাকে ভয় দেখিয়েছে—কিন্তু প্রধান ভয়ের বিষয় আরামের অভাব, বলেছে আহারাদি সমস্তই এমন মোটারকম যে আমি তা সহ্য করতে পারব না।

তাছাড়া এমন কথাও অনেকে বলেছে, আমাকে যা এরা দেখাবে তার অধিকাংশই বানানো।"

এবিষয়ে আরও কিছু তথ্য যুগিয়েছেন প্রখ্যাত রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন ('রবীন্দ্র জীবনী' তৃতীয় খণ্ড) : "বাধা যে একেবারেই নাই তাহা নহে। জনৈক মার্কিন সাংবাদিক লিখিতেছেন, "Although actively abstaining from politics, Tagore revealed, while resting in Geneva, that he is heart and soul for the Indian nationalist movement. It is understood—it is because of the impetus which his presence might give to pro-Gandhi sentiment in the U.S.A and Russia that the coterie of English-men who surrounded him here was continually against his trips for reasons of health." (New York World, 5 September, 1930).

ইঙ্গিতটা এত প্রকট যে মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না।

প্রভাতবাবু আরও লিখেছেন : "১৯২৯ সালেও কোরিয়া হইতে রাশিয়া যাবার ইচ্ছা ছিল, সেখানে জনসাধারণকে কীভাবে ও কী পরিমাণে অশিক্ষা হইতে উদ্ধার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে সেইটি জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ। সেবারও শরীরের জন্য ও জাপানী ডাক্তারের পরামর্শে বা আদেশে…রাশিয়া যাওয়া পণ্ড হয়। (জাপানী ডাক্তারের অত্যুৎসাহের কারণ কী ?) এবারও জেনেভা বাসকালে কবির বন্ধুবান্ধবরা তাঁহার খারাপ শরীরের অজুহাতে তাঁহাকে রুশ যাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টায় ছিলেন ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিয়া উঠিলেন না।" কবি নিজেই লিখেছেন : "কিন্তু পৃথিবীতে যেখানে সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না আসা আমার পক্ষে অমার্জনীয় হত।"

রবীন্দ্রনাথকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা যেমন হয়েছিল, তেমনি সেখান থেকে ফিরে যাতে সেদেশের বিষয়ে প্রকাশ্যে কোন কথা বলতে না পারেন সেজন্যেও তাঁর কিছু কিছু 'শুভানুধ্যায়ী' চেষ্টা করেছিলেন। আমেরিকায় ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর শরীর অসুস্থ বলে এমন সোরগোল তোলা হল যে বক্তৃতাদি বাতিল করতে হল—পাছে সোভিয়েত দেশের গুণকীর্তন করেন সেই ভয়েই কী ? রবীন্দ্র জীবনীকার লিখছেন : "অথবা আমাদের মতে কবি যাহাতে বক্তৃতাদি না করিতে পারেন সেইরূপ চাতুর্যপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হইল।… আমেরিকানদের ভয় রবীন্দ্রনাথ পাছে সাম্যবাদ সমর্থন করেন ও প্রশংসা করিয়া বক্তৃতাদি করেন।… রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদের যে পরীক্ষা শুরু হইয়াছে তাহা তো আমেরিকার ধনতন্ত্র ধুরন্ধরদের স্বার্থের চরম পরিপন্থী আন্দোলন—রবীন্দ্রনাথ সদ্য রাশিয়া সফর করিয়া ফিরিয়াছেন—যদি তিনি প্রশংসমান কথা বলেন।"

বই বইয়ের ঠিকানা

১৯৩০ সনের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে কবি সদলে মস্কোতে পৌঁছন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন হ্যারি টিম্বার্স, মারগট আইনস্টাইন, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আরিয়াম উইলিয়ামস (আর্যনায়কম) ও অমিয় চক্রবর্তী।

মস্কোতে প্রথম অনুষ্ঠানেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করেন। সোভিয়েত লেখকদের দ্বারা আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় জনুসের সভাপতি অধ্যাপক প. স. পেত্রভ কবিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "অন্য এক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আমরা মানুষকে কী রূপ দিচ্ছি তাই তিনি জানতে চান।··· আমাদের সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা কথা বলা হয়, লেখা হয়। বীভৎস সব গুজব ছড়ানো হয় আমাদের নামে। বলা হয় আমরা নাকি সংস্কৃতিকে মেরেছি, শিল্পকলার অবনতি ঘটিয়েছি। এর উত্তরে আমরা বলি : আসুন, স্বচক্ষে দেখে যান। দেখে যান অজ্ঞতার অন্ধকারে ভরা পুলিশী রাজতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষে, জনগণ যেখানে কয়েদীর মতো থাকত, আমরা কেমন জাতীয় সংস্কৃতির ফুল ফুটিয়েছি। আমরা মনে করি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বরাবরের মতোই, যা দেখবেন তার সুচিন্তিত মূল্যায়ন করবেন, আমাদের দেশ ও আমাদের কাজ সম্বন্ধে তাঁর মত সারা পৃথিবীকে জানাবেন।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেছিলেন : "আমি এসেছি শিখতে, জানতে কেমন করে আপনারা নিজেদের মতো করে এক বিরাট সমস্যা, লোকশিক্ষার বিশ্ব-সমস্যার সমাধান করেছেন।"

আর অধ্যাপক পেত্রভ যেমনটি আশা করেছিলেন, কবি তাঁর সোভিয়েত ভ্রমণ সম্বন্ধে যে বিষয়নিষ্ঠ মূল্যায়ন করেছিলেন তা 'রাশিয়ার চিঠি'র পাতায় পাতায়, অন্যান্য অনেক চিঠিতে বিধৃত রয়েছে।

মস্কো থাকাকালেই ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে আচার্য শ্চেরবাৎস্কিকে লেখা এক পত্রে কবি লিখেছেন : "আমার রাশিয়া ভ্রমণে অপ্রত্যাশিত অনেক কিছু দেখতে পেলেম, তার ফলে আমার নিজের দেশের বিষয়ে অনেক কিছু ভাবতে হয়েছে।"

সোভিয়েত ইউনিয়নে ভ্রমণকালে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভাগ দিতে রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। 'রাশিয়ার চিঠি'র এক জায়গায় লিখছেন : "কতবার মনে হয়েছে, আর কোথাও নয়, রাশিয়ায় এসে একবার তোমাদের সব দেখে যাওয়া উচিত।" প্রতিমা দেবীকে এক পত্রে লিখছেন : "আমি যা বহুকাল ধ্যান করেছি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে ; আমি পারি নি বলে দুঃখ হল। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে লজ্জার বিষয় হবে।" রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখেছেন : "যে-সব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম।··· এটা ধ্রুব করে বুঝেছি, আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ শ্রীনিকেতনে। সমস্ত দেশকে কী করে বাঁচাতে হবে এখানে ছোটো আকারে তারই নিষ্পত্তি করা আমাদের ব্রত। তুই যদি রাশিয়ায় আসতিস এ সম্বন্ধে অনেক তোর অভিজ্ঞতা হত।" অন্যত্র, "তোরা রাশিয়ায় যদি আসতিস তাহলে বুঝতে

পারতিস কাজ করবার ঢের আছে। টাকা কম হলেও চলে যদি বুদ্ধি থাকে ও উদ্যম থাকে, যদি নিজের উপরে ভরসা থাকে।"

অমিয় চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "সভ্যতার এই ভিত্তি বদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। মনে হয়েছিল নরমাংসজীবী রাষ্ট্রতন্ত্রের রুচির পরিবর্তন যদি এরা ঘটাতে পারে তবেই আমরা বাঁচব নইলে চোখরাঙানির ভান করে অথবা দয়ার দোহাই পেড়ে দুর্বল কখনোই মুক্তিলাভ করবে না। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখি নি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব—এ বিপ্লব অনেক দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। আর আজ য়ুরোপের যে সভ্যতার পিঞ্জরে বাঁধা হয়ে আছি আমরা, ঐশ্বর্যভোগের বিষবাষ্প তার তলায় তলায় জমে উঠেছে।··· কিন্তু সর্বমানবের তরফে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন এ কথা মনে আপনি আসে যে, নব্যরাশিয়া মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যু শেল তোলবার সাধনা করচে যেটাকে বলে লোভ।" অন্য এক পত্রে (১৯৩৬, ২৮ জুলাই—ইতিপূর্বে 'রাশিয়ার চিঠি' নিষিদ্ধ হয়েছে) লিখছেন : "সোভিয়েট রাশিয়ার নাম করা এ দেশে অপরাধবিশেষ। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে না করেও থাকতে পারিনে।··· সোভিয়েট রাশিয়া একটি অখণ্ড সজীব কলেবর। তার ভিন্ন অংশে বেদনার ও প্রয়োজনের তারতম্য নেই, ছিন্ন হয়ে যায় নি নাড়ী। সেখানে সোভিয়েট য়ুরোপ ও সোভিয়েট এশিয়ার মাঝখানে কোনো অসম্মান নেই।··· এই শান্তিময় সভ্যতা জাগতে সেখানে দুই শতাব্দী লাগে নি, অল্প কয় বৎসর মাত্র শাসনে এই আশ্চর্য ফল। ধনস্বাতন্ত্র্যমূলক অর্থনীতিই শাশ্বত এবং শ্রেয়, আর ধনসাম্যমূলক অর্থনীতি এতই অশ্রদ্ধেয় যে তার সম্বন্ধে চিন্তা আলোচনা বা গ্রন্থপাঠের স্বাধীনতা পুলিশের দণ্ডাভিঘাতে দমনীয়, শাসনকর্তাদের এই মনোভাব ভালো কি মন্দ তা নিয়ে তর্ক থাক্‌। সোভিয়েট মত প্রচার উপলক্ষ্যে উক্ত গবর্মেণ্ট জনমতের স্বাধীনতাকে যদি দণ্ড-প্রয়োগের দ্বারা শাসন করে থাকে তবে সে সম্বন্ধে আমরা বিচার করতে গেলে হাস্যাস্পদ হব।"

রবীন্দ্রনাথ যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণে যান সে-সময় ভারত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আসন্ন আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতিতে চঞ্চল। ইতি-মধ্যে, ১৯২৯ সনের শেষ দিনটির মধ্য রাত্রে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি পূর্ণ স্বরাজই ভারতের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে। ১৯৩০, ২৬ জানুয়ারি অগণিত ভারতবাসী সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্পবাক্য পাঠ করেন।

কুড়ির দশকের শেষভাগ থেকেই ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে র‍্যাডি-ক্যাল প্রবণতা স্ফুট হয়ে চলেছিল। যে-সাইমন কমিশনের একাধিক উল্লেখ

বই বইয়ের ঠিকানা

'রাশিয়ার চিঠি'তে রয়েছে তার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল ধিক্কার ও বিক্ষোভ প্রদর্শনে শ্রমিকদের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রমিকদের সংগ্রামের বিবর্ধমান বেগকে (১৯২৮ সনের ধর্মঘট আন্দোলনে মোট ৩১,৬৪৭,০০০ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল) খর্ব করবার জন্যে ঔপনিবেশিক সরকার প্রচণ্ড দমনপীড়নের আশ্রয় নিয়েছিল। শুরু করা হয়েছিল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯৩০ সনের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিদ্রোহও মুক্তি আন্দোলনে এক নতুন উপাদান যোগ করেছিল। এর পরিণতিতে 'ল অ্যান্ড অর্ডারের' প্রবক্তা ইংরেজ সরকার গোটা চট্টগ্রাম জুড়ে যে অত্যাচারের রথ চালিয়ে দিয়েছিল তা এককথায় অমানুষিক। এরই পাশাপাশি চিরাচরিত 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির অনুসরণে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামারও উস্কানি দেওয়া হচ্ছিল।

এরকম একটা অবস্থায় কবি গিয়েছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ায়। স্বভাবতই স্বদেশবাসীর বেদনাময় অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে তিনি সেদেশের কর্মকাণ্ডকে বিচার করেছেন। প্রতিদিনই ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন; সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন: "কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল—এই অল্পকালের মধ্যে দ্রুত বেগে বদলে গেছে—আমরা পড়ে আছি জড়তার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন।"

সোভিয়েত ইউনিয়নে অবস্থাটাই বা তখন কীরূপ ছিল? বিপ্লবের পর মাত্র তেরো বছর কেটেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি, বিপ্লব-পরবর্তী, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'আস্ত বিপ্লব', বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ও দেশী প্রতিক্রিয়াপন্থীদের চক্রান্তে সেই গৃহযুদ্ধের ধকল সবে কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে বিশ্বের এই প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের ফলে অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। একটা হিসেবে দেখছি, ১৯২০ সনে শিল্পোৎপাদন ১৯১৩ সনের শিল্পোৎপাদনের ১৪ শতাংশে নেমে গিয়েছিল। দুর্ভিক্ষ ও অবিশ্বাস্য মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতিকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছিল।

কিন্তু নবজাত শ্রমিক কৃষকের রাষ্ট্র বিমূঢ় হয়ে পড়ে নি। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দেশকে পুনর্গঠিত করবার জন্যে গোটা জাতি কাজে নেমে পড়েছিল। প্রথমে মহামতি লেনিনের পরিচালনায় গোয়েলরো পরিকল্পনা, নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী বা নেপ রূপান্তরণের দরজা খুলে দিয়েছিল। ১৯২৫ সনের মধ্যেই শ্রমশিল্পে উৎপাদন যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের তিন-চতুর্থাংশে গিয়ে পৌঁছেছিল; কৃষিতেও যুদ্ধ-পূর্ব উৎপাদনের স্তরে উপনীত হওয়া গিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ যে-সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলেন সে-সময় দেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ পূর্ণবেগে চলছে। ১৯২৯-৩৩ এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পূরণ হয়েছিল চার বছর তিন মাস সময়ের মধ্যে। এই বিরাট কর্মোদ্যোগকে লক্ষ্য করেই কবি লিখেছিলেন: "বহুদূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে

এরা একটা নতুন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে-··হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ পনেরো বছর জিতবে বলে পণ করেছে।"

এই প্রথম পরিকল্পনা দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বুনিয়াদ স্থাপন করেছিল। এক কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শিল্পোন্নত দেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরণ ঘটেছিল। ১৯৩২ সনে অর্থনীতিতে শিল্পজাত সামগ্রীর অংশ ছিল ৭০ শতাংশ। যৌথ চাষের চূড়ান্ত জয় সম্পন্ন হয়েছিল। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটেছিল চিরতরে, তেমনি চিরতরে দূর হয়েছিল বেকারত্বের অভিশাপ।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এই 'দুর্গতিনাশন যজ্ঞারম্ভের' এক চমৎকার বিবরণী উপস্থাপন করেছেন কবির প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন ঠাকুর। 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ' বইটিতে তিনি তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় বলেছিলেন: এইভাবে USSR মহা-সমীকরণ যজ্ঞ ফেঁদেছেন। তাই দেখে পৃথিবীর যত রাজা-রাজড়ার মেজাজ যেরকম খিঁচড়েছে, এর নাম 'রাজসূয় যজ্ঞ' দিলেও চলে। আকাশ বাতাস মাটি জল রোদ বৃষ্টিকে, নানা প্রাণীকে, তার উপর নিজের মনকেও, মানুষের মতো মানুষের জীবনধারণের উপযোগী করে আনা, এ হল এ যজ্ঞের এক এক অঙ্গ। অঙ্গগুলি ক্রমশ ভালোয়-ভালোয় উতরে গিয়ে যজ্ঞ পূর্ণ হলে তখন পৃথিবীমাতার বিশ্ব-মানব-ধারিণী নাম সাজবে।"

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আজ অর্থনীতিতে, শিল্প-সংস্কৃতিতে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে তা মানব ইতিহাসে বিস্ময়কর।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির সুষ্ঠু ও সফল রূপায়ণের কাজ ব্যাহত হয়েছিল হিটলারি-চমূর দ্বারা সোভিয়েতভূমি আক্রান্ত হবার ফলে। চার বছরের এই যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নে দুই কোটিরও বেশি জীবনহানি হয়েছিল, বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল জাতীয় সম্পদের ৩০ শতাংশ। কিন্তু গোটা জাতি মাতৃভূমি রক্ষার যুদ্ধের মতোই একাগ্রমনা হয়ে অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

দশম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হতে চলেছে। প্রস্তুতি চলেছে একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনার। সঙ্গে সঙ্গে খৃস্টীয় ২০০০ অব্দ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতির এক পরিপ্রেক্ষিত কর্মসূচীর খসড়া রচিত হয়েছে। একটা হিসেবে দেখছি, ১৯৭৬-১৯৯০ এই পনেরো বছরে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ববর্তী পনেরো বছরের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বৈষয়িক ও আর্থিক সম্পত্তির অধিকারী হবে।

কবি সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলেন "ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্য", দেখে "খুবই বিস্মিত" হয়েছিলেন। বিপ্লবের আগে রাশিয়ার অবস্থা ছিল শোচনীয়: জারের আমলাদেরই মতে নয় থেকে উনপঞ্চাশ বছর বয়সের জনসমষ্টির শতকরা ৭২ জন ছিল নিরক্ষর। ওরা হিসেব করে দেখেছিল, সে সময়কার

বই বইয়ের ঠিকানা

হারে চললে পুরুষদের মধ্যে পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জন করতে ১৮০ বছর সময় লাগবে, আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ২৮০ বছরেরও বেশি।

কিন্তু সোভিয়েত সরকার এই অসাধ্য সাধন করলেন। বিপ্লবের মাত্র বাইশ বছরের মধ্যে সাক্ষরতার হার দাঁড়িয়েছিল ৮৭·৪ শতাংশ। শিক্ষার এই সর্বজনীন বিকাশের অনুষঙ্গ হিসেবেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে। কাজেই ১৯৫৭, ৪ অক্টোবর তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়নই যে সর্বপ্রথম পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুৎনিক মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছিল আর এর মাত্র চার বছর বাদে ১৯৬১, ১২ এপ্রিল তারিখে যে সোভিয়েত নাগরিক ইউরি গাগারিন পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মনুষ্যবাহী মহাকাশযান ভোস্তক-এ করে মহাশূন্যে পাড়ি জমিয়েছিলেন এটা ছিল একান্তই স্বাভাবিক।

অপর যে-দিকটি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল সেটি হল "রাশিয়ার সমস্ত দেশ-প্রদেশকে জাতি-উপজাতিকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে এত বড়ো সর্বব্যাপী অসামান্য অক্লান্ত উদ্যোগ" যা "আমাদের মতো ব্রিটিশ সাব্‌জেক্টের সুদূর কল্পনার অতীত।" জারের আমলে মধ্য এশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিকে বলা হত 'জাতিসমূহের কারাগার'। এইসব অনগ্রসর উজবেক, তুর্কমেন, বশকির, তাতার, কিরঘিজদের একেবারে বিংশ শতাব্দীর উন্নয়নের স্তরে নিয়ে আসবার প্রয়াসকে তিনি সপ্রশংস দৃষ্টিতে লক্ষ করেছিলেন।

১৯২২ সনের ডিসেম্বর মাসে দেশের বিভিন্ন জাতি ও অধিজাতি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তভাবে সম্মিলিত হয়ে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের সংঘ গড়ে তুলেছিল। প্রকৃতপক্ষে, বিপ্লবের পরেই অনগ্রসর প্রান্তগুলিকে শিল্পে, কৃষিতে, শিক্ষায় অগ্রসর প্রান্তগুলির সমকক্ষ করে তোলবার প্রয়াসে হাত লাগানো হয়েছিল। সোভিয়েত রাষ্ট্র যথার্থই বুঝেছিল যে 'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' তাই অগ্রসর রুশ ফেডারেশন সহায় সম্বলের একটা বড় অংশ এইসব প্রত্যন্তভূমির উন্নয়নে নিয়োগ করেছিল। একটা দৃষ্টান্ত উজবেকিস্তান। কুড়ির দশকে মধ্য রাশিয়ার অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানকে উজবেকিস্তানে স্থানান্তরিত করে সেখানে শিল্পায়নের পত্তন করা হয়েছিল। ১৯২৫ সনে উজবেকিস্তানের শিল্পায়নের জন্যে বরাদ্দ অর্থের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি এসেছিল নিখিল-ইউনিয়ন বাজেট থেকে। আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, উজবেকিস্তানে শিল্পোন্নয়নের হার সোভিয়েত ইউনিয়নের গড় হারের অপেক্ষা বেশি ছিল যাতে করে, এই পিছিয়ে থাকা প্রজাতন্ত্রটি অতি দ্রুত দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে ধরে ফেলতে পারে (১৯২৭-২৮ সনে এই প্রজাতন্ত্রে মোট শিল্পোৎপাদন বেড়েছিল ৫৭ শতাংশ, আর গোটা দেশের গড় বৃদ্ধির হার ছিল ৪৭ শতাংশ)। ঠিকই একই কর্মনীতি অনুসৃত হয়েছিল অন্যান্য অনগ্রসর প্রান্তগুলির ক্ষেত্রেও।

একদা পশ্চাৎপদ (অক্টোবর বিপ্লবের আগে শতকরা তিনজন মাত্র সাক্ষর

ছিল) মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলিতে আজ নিরক্ষর একজনও নেই। যেখানে বিপ্লবের আগে জনস্বাস্থ্য শব্দটিই ছিল বলতে গেলে অনুপস্থিত আজ সেখানে প্রতি দশ হাজার অধিবাসী পিছু চিকিৎসক রয়েছেন কুড়িজন। বিপ্লবের আগে যেখানে বই বা পত্র-পত্রিকার অস্তিত্ব ছিল না আজ সেখানে বিভিন্ন অধিজাতির মাতৃভাষায় কোটি কোটি কপি সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও পুস্তক প্রকাশিত হয়। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে প্রায় ৫৭০টি গবেষণা ইনস্টিটিউটে কাজ করছেন ৭৫ হাজারেরও বেশি গবেষণাকর্মী।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবার আগে রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য দুনিয়া দেখা ছিল। সেখানকার ধনবৈষম্যের বড়াই তাঁকে পীড়া দিয়েছে বারবার। তাই মস্কোতে এসে পার্থক্য তাঁর চোখে খুবই প্রতিপদ ঠেকেছিল। তিনি লিখলেন ('রাশিয়ার চিঠি'): "এখানে এসে যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব।" সাত নম্বর পত্রে লিখছেন: "উপনিষদের একটা কথা এখানে এসে খুব স্পষ্ট করে বুঝেছি—মা গৃধঃ। লোভ কোরো না।···তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। সেই একের থেকে যা আসছে তাকেই ভোগ করো। এরা আর্থিক দিক থেকে সেই কথাটা বলছে। সমস্ত মানব সাধারণের মধ্যে এরা একটি অদ্বিতীয় মানবসত্তাকেই বড়ো বলে মানে; সেই একের যোগে উৎপন্ন যা-কিছু, এরা বলে, তাকেই সকলে মিলে ভোগ করো।"

আর এর বিপরীতে ধনগরিমার আড়ম্বরে কবি ক্ষুব্ধ হয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ফিরবার পথে। পত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন (১৪ অক্টোবর, ১৯৩০): "এবার রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় আমাকে গভীরভাবে অনেক কথা ভাবিয়েছে।···সেখান থেকে ফিরে এসে মেণ্ডেলদের ঐশ্বর্যের মধ্যে যখন পৌঁছলুম একটুও ভালো লাগল না—ব্রেমেন জাহাজের আড়ম্বর ও অপব্যয় প্রতিদিন মনকে বিমুখ করেছে। ধনের বোঝা কী প্রকাণ্ড এবং কী অনর্থক!"

আমেরিকার ধনতন্ত্র ও ধনের ইতরতা কীরূপ দৃষ্টিকটু তা নিউ ইয়র্কের Saturday Review-এরও দৃষ্টি এড়ায়নি। রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা ভ্রমণকালে ঐ পত্রিকাটি ৬ ডিসেম্বর তারিখে লিখেছিল যে বিল্টমোর হোটেলে ভোজসভায় "নিমন্ত্রিতদের তালিকাটিতে কারবারী লোক ধনীলোকের নাম অনেক দেখা গেল, কিন্তু একজন কবির নাম পাইলাম না, এমনকি একজন লেখকেরও নাম নয়।" (দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্র জীবনী')

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের যে আশ্চর্য সজীব অভিজ্ঞতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরেছিলেন সে সম্বন্ধে অপর উল্লেখ পাই দেশে ফেরার পথে লণ্ডন থেকে ১৯৩১, ৯ জানুয়ারি তারিখে ডক্সের সভাপতির কাছে কবির সেক্রেটারি অমিয় চক্রবর্তীর একটি চিঠিতে। তিনি লিখেছেন:

"কয়েকদিন হল আমরা আমেরিকা থেকে এখানে এসেছি আর আজই ভারতবর্ষ রওনা হচ্ছি। আপনাকে আনন্দের সঙ্গে জানাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

বই বইয়ের ঠিকানা

এবারকার ক্লান্তিকর ভ্রমণ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ভাল আছেন। তিনি ভারতে ফিরছেন পাশ্চাত্যে এবারকার ভ্রমণের সুন্দর স্মৃতি নিয়ে, বিশেষ করে রাশিয়া ভ্রমণের। আপনি তো জানেনই রবীন্দ্রনাথ আপনাদের দেশে তাঁর অত্যন্ত প্রেরণা-দায়ী ভ্রমণের বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন আর বাংলায় তিনি যেসব প্রবন্ধ লিখছেন তা শীঘ্রই ইংরাজীতে অনূদিত হবে।···

"আমরা মস্কো থাকার সময় আমাদের আপনি যেভাবে পরিচর্যা করেছেন তার জন্য আবার কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রী নভোমিস্কি ও শ্রী ইয়েগুনভকে আমার নমস্কার জানাবেন।"

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ কবির জন্মদিনে 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এর আগে গ্রন্থভুক্ত পত্রগুলি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৩৪ সনের জুন মাসে 'মডার্ন রিভিয়্যু' পত্রিকায় 'রাশিয়ার চিঠি'-র উপসংহার অংশটি প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ রাজপুরুষদের টনক নড়ে ওঠে। 'রাশিয়ার চিঠি'-র অন্তঃপাতী পত্রগুলির অনুবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আর. জে. ডেভিস-এর প্রশ্নের জবাবে ভারত-বিষয়ক আণ্ডার সেক্রেটারি বাটলার সাহেব বলেছিলেন, ('মডার্ন রিভিয়্যু' পত্রিকায়) এই অধ্যায়টির অনুবাদ প্রকাশের স্পষ্ট উদ্দেশ্য "তথ্য বিকৃত করে ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনকে হতমান করা।"

এদেশে রাজপুরুষেরা এই চরম ব্যবস্থা নেবার আগেও এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যা কোনোপ্রকার শোভন রীতিনীতির বিরোধী। যেমন, ১৩৩৮, অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'-তে দেখি : কয়েকদিন হইল রাশিয়া হইতে অধ্যাপক পেট্রভ রবীন্দ্রনাথকে একটি টেলিগ্রাম পাঠান। কর্তৃপক্ষ যে ব্যক্তিই হউন, উহার কোন কোন অংশ রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিলে তাঁহার অকল্যাণ হইবে এবং উহা প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের ও গ্রেটব্রিটেন সমেত পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অমঙ্গল হইবে, ঐ ব্যক্তির এই আশঙ্কায় তিনি (অর্থাৎ ঐ সর্বজনঅভিভাবক) টেলিগ্রামটির কোন কোন অংশ বাদ দিয়া বাকী রবীন্দ্রনাথকে ডাকঘরের মারফৎ প্রেরণ করেন।

১৯৩০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের বয়স সত্তর হতে চলেছে। তাঁর নিজেরই মতে "হৃদযন্ত্র বিকল হয়েছে তাই বেশি ঘোরাঘুরি, পরিশ্রম করার অবস্থা আমার নেই।" সেজন্যেই একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও লেনিনগ্রাদ গিয়ে বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপক ফ. ই. শের্বাৎস্কি-এর সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি বলে দুঃখ প্রকাশ করে তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন।

মস্কোতে তাঁর কর্মসূচী ছিল ঠাসা। এর মধ্যে তিনি নিজে আগ্রহ প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার সের্গেই আইজেনস্টাইনের

জগদ্বিখ্যাত 'ব্যাটলশিপ পতেমকিন' ছবিটি দেখেছিলেন। আর সেই উপলক্ষে যে আলোচনা হয়েছিল তা থেকে কবির মানসলোকের একটা অনাবিষ্কৃত দিক যেন আমাদের কাছে খুলে যায়। আইজেনস্টাইন সে সময় দেশের বাইরে ছিলেন। তবে তাঁর পত্নী পেরা অত্তাশেভা সেদিন উপস্থিত ছিলেন ও দোভাষীর কাজ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সাংবাদিকদের কাছে তিনি ঐ ঘটনাটি সম্পর্কে এক চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়েছেন। ছবিটি দেখতে দেখতে, বিশেষ করে নাবিকদের বিদ্রোহের দৃশ্য এবং সমুদ্রের দিকে যাওয়া সিঁড়ির ধাপগুলিতে নিরীহ মানুষের উপর গুলিবর্ষণের সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্যটি দেখতে দেখতে কবি উত্তেজনায় বারবার হাত মুঠো করছিলেন আবার মুঠো খুলছিলেন।

ছবিটি দেখার শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনাকালে তিনি বলেছিলেন তাঁর মনেও একটি চলচ্চিত্রের ধারণা রয়েছে : ছবির পর্দায় মানবজাতির ইতিহাস। এর প্রথম দৃশ্যটির একটি ছকও রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছিলেন : একটি পর্বত, বিশ্বের চূড়ার মতই সমুচ্চ। সেই শীর্ষ ছাড়িয়ে দীপ্যমান একটি বিশাল তারা। পর্বত শিখরে উপবিষ্ট একজন সন্ন্যাসী। এটুকু বলেই কবি আবার যেন ধ্যানে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। অত্তাশেভা বলেন, উপস্থিত সকলে শ্বাস বন্ধ করে বাকীটুকু শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু কবি বিস্তারিত আর কিছু বলেন নি। আমাদের দুর্ভাগ্য, এটা আইডিয়াই থেকে গেল, চলচ্চিত্রায়ণ হয় নি।

কবি তাঁর সফরকালে নানা বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আর যা তিনি দেখেছিলেন তাকেই স্বদেশের তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার সমস্যার নিরসনের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার বিবেচনা করেছিলেন। ভকসের সভাপতি এবং মস্কো ভ্রমণে কবির সঙ্গী অধ্যাপক ফিওদোর পেত্রভ পরবর্তীকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তায় একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করেন, যেটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ : "একবার যখন আমরা দার্শনিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছি, তখন আলোচনা মোড় ঘুরে রুশ শারীর-বিজ্ঞানী ইভান পাভলভের বিষয়ে চলে গেল। রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন, একে শিশু-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে কাজে লাগানো যায় কিনা, আর কীভাবেই বা একে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের মনে একটা স্থায়ী রূপ নিয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনরূপ অবকাশ নেই। তাই দেখি, 'সভ্যতার সংকট' নামে পরিচিত অশীতিবর্ষপূর্তি-উৎসবের অভিভাষণে, যেটিকে ন্যায্যতই বলা চলে কবির Last Testament, তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন : "আর, দেখেছি রাশিয়ার মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের, আরোগ্যবিস্তারের, কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়। সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতি বিচার করে নি, বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার

বই বইয়ের ঠিকানা

করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ষা এবং আনন্দ অনুভব করেছি।"

১৯৪১, ২২ জুন নাৎসী দস্যুবাহিনী যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে সেসময় কবি গুরুতর অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। মৃত্যুশয্যায় শায়িত থেকেও তিনি নিদারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে সোভিয়েত রণাঙ্গণের অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতেন এবং শেষ পর্যন্ত দানবের সঙ্গে সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন জয়ী হবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করতেন—এ তথ্য অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের রচনা থেকে আমরা পেয়েছি। সেই একই সময়ে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অসুস্থ অবস্থাতেও রবীন্দ্রনাথ যে এই সংগঠনের প্রথম পৃষ্ঠপোষক হতে রাজী হয়েছিলেন, আমাদের গোটা আলোচনার প্রেক্ষাপটে এ তথ্যটিও স্মর্তব্য।

এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মস্কোর বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ' সংকলন-গ্রন্থটির সাহায্য নিয়েছি। পুনরুক্তি বিধায় এবং এই গ্রন্থের কলেবরের দিকে লক্ষ্য রেখে 'রাশিয়ার চিঠি'-র সামান্য কিছু অংশ বাদ দিয়ে পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে।

লেখকের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এস্টেটের ট্রাস্টি দপ্তর এই সংকলন-গ্রন্থে মস্কোয় থাকাকালে কবির বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের রিপোর্ট এবং 'রাশিয়ার চিঠি'-র অংশবিশেষ অন্তর্ভুক্ত করবার অনুমতি দিয়েছেন বলে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া, বিশ্ব-ভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক অম্লান দত্ত, বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থন-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীরণজিত রায় এবং রবীন্দ্র ভবন উন্নয়ন সমিতির সচিব শ্রীমতী মানসী দাশগুপ্তার কাছ থেকে যে-সহযোগিতা পেয়েছি সেজন্যে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সুযোগে বিশ্ব-ভারতীর প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং বিশিষ্ট সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক য়েভগেনি চেলিশেভকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই সংকলন-গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রকাশে অন্য যেসব বন্ধু ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই।

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ শৈলেন চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের 'এ জন্মের তীর্থদর্শন'

সত্যেন্দ্রনাথ রায়
প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক, বিশ্ব-ভারতী

"…রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।"১

১.

অক্টোবর বিপ্লবের তের বছর পরে ১৯৩০ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'এ জন্মের তীর্থদর্শন'-এর অভিলাষে সোভিয়েট সরকারের আমন্ত্রণে মস্কো এসে উপস্থিত হলেন। মস্কো, তথা রাশিয়া ছেড়ে প্রস্থান করলেন ঠিক দু'সপ্তাহ পরে ২৫শে সেপ্টেম্বর রাত্রে। আসার পরদিনই সোভিয়েট লেখকদের সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি ঘোষণা করলেন—

"আমি এসেছি শিখতে, জানতে, কেমন করে আপনারা নিজেদের মতো করে এক বিরাট সমস্যা, লোকশিক্ষার বিশ্বসমস্যার সমাধান করছেন।"২

ঘোষণাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু শেখার বা জানার পক্ষে দু'সপ্তাহ কতটুকু সময়?

রাশিয়ার ইতিহাসের যে কালপর্ব বা যে সময়টিতে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়েছিলেন, সেই সময়টিই বা রবীন্দ্রনাথের শেখা ও জানার পক্ষে কতখানি উপযোগী ছিল? সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কারণেই তো রাশিয়া তীর্থ হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কাছে—বিপ্লবের তের বছরের মধ্যে তার ফল কতখানি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে পারে রাশিয়ার মতো বিরাট, বহুসমস্যাজর্জরিত এবং অনেক দিক থেকে পশ্চাৎপদ দেশে?

এই তের বছরে অনেক যুগান্তকারী পরিবর্তন রাশিয়ায় ঘটেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-ও মানতে হবে যে, এই তের বছর শুধু মাপে ছোট তা-ই নয়, ঘটনা এবং সম্ভাবনার দিক থেকেও সময়টা বড়ো অস্থির। এই সময়ে নিজেকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে সারাক্ষণই ভিতরে বাইরে লড়াই চালাতে হয়েছে

র—২

বই বইয়ের ঠিকানা

সোভিয়েট সরকারকে। সেই পতন-অভ্যুদয়বন্ধুর পথে একটানা অগ্রগতি অথবা চমকপ্রদ সাফল্য কোনোটাই হয়তো সম্ভবপর ছিল না। মনে রাখতে হবে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (অক্টোবর ১৯২৮ থেকে অক্টোবর ১৯৩৩), যাকে বলা হয়েছে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিস্থাপনা, তার দু'বছরও তখন পার হয় নি। অল্পকাল আগে যৌথকৃষির সূচনা হয়েছে, এবং সেই বাবদে বড়ো রকমের ভুলভ্রান্তি তখনো প্রচুর ঘটছে। অন্তত একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের পরে যদি রবীন্দ্রনাথ যেতেন, তাহলে সোভিয়েটের চেষ্টা এবং লক্ষ্য দুই-ই তাঁর কাছে খানিকটা স্পষ্ট হতে পারত, সোভিয়েটের সাধ এবং সিদ্ধি দুয়েরই খানিকটা তিনি বিচার করতে পারতেন।

এ সম্বন্ধে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন—

"মনে রেখো, এখানে যে বিপ্লবে জারের শাসন লয় পেলে সেটা ঘটেছে ১৯১৭ খৃস্টাব্দে। অর্থাৎ তের বছর পার হল মাত্র। ইতিমধ্যে ঘরে বাইরে এদের প্রচন্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়ে চলতে হয়েছে। এরা একা, অত্যন্ত ভাঙাচোরা রাষ্ট্রব্যবস্থার বোঝা নিয়ে। পথ পূর্বতন দুঃশাসনের প্রভূত আবর্জনায় দুর্গম।"৩

আরো একটা কথা আছে। রাশিয়া বিরাট এক মহাদেশের মতো ইওরোপ ও এশিয়ার অনেকখানি জুড়ে বিস্তৃত। তার মধ্যে অনেক রকমের মানুষ, অনেক জাতি অনেক ধর্ম অনেক বৈচিত্র্য অনেক অনৈক্য। তার মধ্যে জীবনযাত্রার অনেক ভিন্নতা, সভ্যতার অনেক ভেদ, সাংস্কৃতিক মানের অনেক তারতম্য। তারই বা রবীন্দ্রনাথ কতটুকু দেখতে পেয়েছেন। এত ভিন্নতায় কতটা ঐক্য সম্ভব, কতটা একাকার সঙ্গত, তারই বা তিনি কতটুকু বিচারের অবকাশ পেয়েছেন?

রবীন্দ্রনাথ গিয়েছেন অসময়ে, থেকেছেন মাত্র দু'সপ্তাহ এবং দেখেছেন মাত্র মস্কো।

কেবল রাজধানীকে দেখলে একটা বিরাট দেশের কতটুকু দেখা হয়? মাত্র একটি দিন (১৯ সেপ্টেম্বর) তিনি মস্কোর একটু বাইরে খুব কাছের একটি বাগানবাড়িতে (ল. ম. কারাখানের বাগানবাড়ি) সারা দিন কাটিয়েছিলেন—বাকি সবটাই নিছক মস্কো।

মস্কোতে অবশ্য কর্মসূচি ছিল তাঁর ঠাসা—সভা, অভিনন্দন, সাক্ষাৎকার, থিয়েটার, লোকসংগীত, লোকনৃত্য, ব্যালে, চলচ্চিত্র, লেখকদের সঙ্গে আলোচনা, পাইওনিয়ারদের সঙ্গে গল্পসল্প, লোকশিক্ষা দপ্তরে বক্তৃতা, যৌথ-খামারের চাষিদের সঙ্গে আলাপচারী, নিজের ছবির প্রদর্শনী—মস্কোতে তিনি দেখেছেন অনেক, শুনেছেন অনেক, বলেছেনও অনেক। কিন্তু, আবার বলি, সবই মহানগরীতে সীমাবদ্ধ। এবং এই অভিজ্ঞতার সবটাই পূর্ব-নির্ধারিত সরকারি পরিকল্পনাতে বাঁধা।

মানতেই হবে, বার্ধক্য, অসুস্থতা, সময়াভাব—যে কারণেই হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে রাশিয়া দেখেছেন, সে রকম দেখার বিস্তৃতি বা গভীরতা কখনোই বেশি হতে পারে না।

তাই যদি হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া-ভ্রমণের মূল্যই বা কী আর তার 'রাশিয়ার চিঠি'-র সাক্ষ্য হিসেবেই বা দাম কতটুকু?

অনেকখানি। কিন্তু নিছক সাক্ষ্য হিসেবে নয়। এ হিসেবটা আলাদা।

২.

রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া-ভ্রমণের বছর ছয়েক পরে রবীন্দ্রনাথেরই মতো সোভিয়েট-কর্তৃক আহূত হয়ে বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে জীদ্‌ রাশিয়া-ভ্রমণে গিয়েছিলেন। যাত্রাকালে জীদের মন সোভিয়েট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের থেকেও বেশি অনুকূল ছিল। দশ বছর আগে থেকেই, অর্থাৎ তাঁর কঙ্গো-ভ্রমণের কাল থেকেই জীদের মন তীব্রভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, ঔপনিবেশিক শোষণের বিরোধী হয়ে উঠেছিল। তীর্থদর্শন কথাটা তিনিও অনায়াসেই বলতে পারতেন। কিন্তু রাশিয়া থেকে ফিরে এসে জীদ্‌ তাঁর বইয়ে (Return from USSR) সোভিয়েট সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করলেন তাকে মোটেই অনুকূল বলা চলে না। ক্ষেত্রবিশেষে তা তীব্রভাবে প্রতিকূল। নানা কারণে রাশিয়া সম্পর্কে জীদের অভিমতকে সেদিন অনেকেই শ্রদ্ধেয় বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হল এই যে, জীদের অভিমত স্বল্প অভিজ্ঞতার উপরে গড়া, তার অনেকটাই জীদের নিজের মনের আঁচে তাতানো, তা সাবজেকটিভ সিদ্ধান্ত। এই কারণেই জীদের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য নয়।

তা যদি হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তকেই বা আমরা সাবজেকটিভ কেন বলব না? জীদ্‌ তো তবু রাশিয়ায় কাটিয়ে এসেছেন দশ সপ্তাহ, রবীন্দ্রনাথের অবস্থান মাত্র দু'সপ্তাহের। 'Return from USSR'-কে যদি নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য না করি, তাহলে 'রাশিয়ার চিঠি'-কেই বা নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করব কোন্‌ যুক্তিতে?

আপত্তিটা আপাতদৃষ্টিতে যতটা জোরালো বলে মনে হয়, আসলে ঠিক তত জোরালো নয়। কারণ দুজন লেখকের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে, দুটি বইয়ের চরিত্রও সম্পূর্ণ পৃথক।

প্রথম কথা, 'রাশিয়ার চিঠি' সাক্ষ্য নয়, ব্যক্তিগত জবানবন্দী। রবীন্দ্রনাথের ওই চিঠিগুলিতে অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য বা নতুন পরিসংখ্যান এমন কিছু নেই, তাঁর নতুন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে-তোলা নতুন সিদ্ধান্তও বিশেষ নেই। যা আছে তা প্রধানত নিজের ভালোলাগা মন্দলাগার ইতিবৃত্ত। এমন বস্তু যার পক্ষে সাবজেকটিভ হওয়াই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। 'রাশিয়ার চিঠি' যত না সোভিয়েটের পরিচয়, তার থেকে ঢের বেশি রবীন্দ্রনাথের মনের পরিচয়, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার পরিচয়, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের পরিচয়। 'রাশিয়ার চিঠি' যত না তথ্যগত সাক্ষ্য, তার থেকে ঢের বেশি একটি অসামান্য মানুষের অসামান্য প্রগতিশীলতার স্বাক্ষর।

বই বইয়ের ঠিকানা

সাক্ষ্যই যদি বলি, তাহলে কিসের সাক্ষ্য 'রাশিয়ার চিঠি' ?

সাক্ষ্য একটি আশ্চর্য উত্তরণের। অথবা বলা ভালো, সাক্ষ্য একটি আশ্চর্য উত্তরণ-চেষ্টার।

কোন্ উত্তরণ ? কোন্ সীমানা পার হয়ে কোথায় যেতে চাইছেন রবীন্দ্রনাথ ?

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ উদারনৈতিক মানবতাবাদী, একজন শান্তিকামী শান্তিবাদী মানবপ্রেমিক, যিনি বিশ্বাস করেন, মানুষের কোনো পতনই চূড়ান্ত নয়—শান্তির পথে, মহৎ মানুষের ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের আদর্শের টানে পতিত মানুষের আত্মসংশোধন ঘটতে পারে এবং ঘটতে বাধ্য, তার জন্য রক্তাক্ত বিপ্লব অনাবশ্যক। এ-ও আমরা জানি, একজন শান্তিকামী ভাববাদী অধ্যাত্মবাদী এবং মোটামুটিভাবে ঈশ্বরভক্ত মানুষের পক্ষে, ঊনবিংশ শতকীয় লিবারাল হিউম্যানিজমে দীক্ষিত একজন বৃদ্ধের পক্ষে তাঁর অভ্যস্ত চিন্তার সীমানাকে পার হয়ে যাওয়া কত কঠিন। রবীন্দ্রনাথ নিজের দীর্ঘকাল পোষিত বিশ্বাসকে একেবারে পার হয়ে চলে গিয়েছেন এমন বললে অতি-সরলীকরণ ঘটবে। তেমন যদি করতেন, তাহলে তাঁর সেই উত্তরণে আমাদের সংশয় থাকত। তা তিনি করেন নি। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন দুই প্রান্তে দুই পা রেখে—এক প্রান্তে লিবারালিজমে, শান্তিবাদ, অধ্যাত্মবাদ এবং শুচিশুভ্র প্রেম আর অন্য প্রান্তে গণমুক্তি, সাম্য, শিক্ষা, স্বাচ্ছল্য, স্বাভাবিক আনন্দময় জীবন—এবং বিপ্লব। এই যে দোটানা, এটা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ভয়ংকর সত্য। একথা বলব না যে, রাশিয়া-ভ্রমণে এই দোটানা তাঁর সম্পূর্ণ কেটে গিয়েছে। কিন্তু শান্তির ললিত বাণী যে অনেক সময়ই ব্যর্থ পরিহাস, দেখতে পাচ্ছি, এই বোধটা তাঁর তখন থেকেই মনে পাকা হয়ে বসতে শুরু করেছে।

'রাশিয়ার চিঠি'-তে দেখতে পাই ললিত এবং ব্যথিত লিবারালিজমের করুণ রঙিন পথ থেকে সরে এসে বিপরীত দিকে একটা পদক্ষেপ।

মুখ্য, ললিত এবং ব্যথিত লিবারালিজমের করুণ রঙিন পথের থেকে ঈষৎ সরে এসে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপের স্বাক্ষর পাই 'রাশিয়ার চিঠি'-তে। উত্তরণ-মুখী। সেই পদক্ষেপই বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আসল লক্ষ্যস্থল। কিন্তু আপাতত আমরা আবার জীদের সঙ্গে তুলনার প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাই। কেননা এই তুলনার মধ্যে দিয়েই আমরা বুঝতে পারব যে, আসলে এ তুলনা দুজন বুদ্ধিজীবীর মধ্যে ঘটছেই না। এ হল একজন বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে অপর একজন এমন মানুষের তুলনা যিনি নিছক বুদ্ধিজীবী নন—এই বিশেষ প্রসঙ্গে যাঁর চিন্তা ও কর্মকে একেবারেই পৃথক করা যায় না, প্রধানত কর্মের টানেই যিনি রাশিয়া এসেছেন। এই কর্মের টানের কথাটা স্মরণ রাখলেই আমরা বুঝতে পারব, কেন শেষ পর্যন্ত একটা উত্তরণমুখী পদক্ষেপ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

৩.

বিষয়টার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মনে মনে অত্যন্ত বেশি জড়িত। যে মন নিয়ে আঁদ্রে জীদ্ বলতে পেরেছিলেন, রাশিয়ার আনাজ-তরকারি উচ্চমানের নয়, অথবা রাশিয়ার বিয়ারে তাঁর মন ভরে নি, তেমন মন এবং তেমন অবকাশ রবীন্দ্রনাথের ছিল না।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়াকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন তাঁর নিজের দেশের সীমাহীন দারিদ্র্য, অনাহার ও অস্বাস্থ্যের প্রেক্ষাপটে, নিজের দেশের সর্বত্র-পরিব্যাপ্ত অশিক্ষা, অবুদ্ধি এবং অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে, নিজের দেশের শোষণ, পীড়ন এবং অসাম্যের প্রেক্ষাপটে। যতই কেন না সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হোন আঁদ্রে জীদ্, তিনি গিয়েছেন একটি সচ্ছল ধনতন্ত্রী দেশ থেকে, একটি উচ্চমানের পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রতিনিধি রূপে—গিয়েছেন অনেকখানি ফাঁপিয়ে-তোলা কল্পনা আর ইচ্ছা-পূরণের স্বপ্ন নিয়ে। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে একটু বেমিল ঘটলেই তাঁর পক্ষে আশাভঙ্গ স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গিয়েছেন সম্পূর্ণ অন্য রকম মন নিয়ে। কথাটা তাঁর মুখেই শোনা যাক।

"মস্কো থেকে যখন নিমন্ত্রণ এল তখনো বলশেভিকদের সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। তাদের সম্বন্ধে ক্রমাগতই উল্টো উল্টো কথা শুনেছি। আমার মনে তাদের বিরুদ্ধে একটা খটকা ছিল।"[৪]

'রাশিয়ার চিঠি'র অন্য অংশ থেকে আর একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"...রাশিয়ায় গিয়ে বেশি কিছু দেখতে পাব এ রকম আশা করা অন্যায় হত।... আমাদের দুঃখী-দেশে-লালিত অতি-দুর্বল আশা নিয়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। গিয়ে যা দেখলুম তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি।"[৫]

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার শিক্ষাবিস্তার, অনুন্নত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ইত্যাদি অনেক বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে শ্রদ্ধা যেমন জেগে উঠেছিল, তেমনি খটকা, আপত্তি, ভয়ও তাঁর মনে প্রচুর ছিল। রাশিয়াতে এসে বড়ো কোনো আশাভঙ্গের কারণ রবীন্দ্রনাথের ঘটে নি। যত অল্প সময়ই তিনি রাশিয়াতে থাকুন, মস্কোতে যত অল্প পরিসরের মধ্যেই তিনি বিচরণ করুন, ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা তাঁকে সেই অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিল, যার বলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চাওয়া এবং পাওয়াকে তিনি অনেক ভিতরের থেকে বুঝতে পেরেছিলেন।

শুধু দেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা নয়, রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবোত্তর রাশিয়াকে দেখেছেন তাঁর নিজের সব থেকে জরুরি কাজের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়ে, জীবনের সব থেকে বড়ো সাধনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে—দর্শকের দৃষ্টিতে নয়, কেতাবী দৃষ্টিতে নয়, নিছক তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিতে নয়, খাঁটি কর্মীর দৃষ্টিতে, কাজের মাঝখান থেকে, জাতীয় জীবনের বাঁচা-মরার সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

আবার রবীন্দ্রবাক্য উদ্ধৃত করি। কথাটি সাদা। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তার তাৎপর্য দূর-প্রসারী।

বই বইয়ের ঠিকানা

"আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে। আমাদের কর্মীরা যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা করে যেতে পারত তা হলে ভারী উপকার হত।"৬

পশ্চিমী সভ্যতার কোনো-একজন সজাগ, বুদ্ধিমান এবং মোটামুটি প্রগতিশীল প্রতিনিধির পক্ষে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বগত বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব হলেও হতে পারে। কিন্তু তা হবে কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন তত্ত্বের বিচার। রবীন্দ্রনাথের বিচার সে রকম নয়। নয় বলেই সোভিয়েটের প্রয়াসকে তিনি—টুকরো টুকরো করে নয়—সমগ্রভাবে দেখার দৃষ্টি পেয়েছেন।

এ দেখা দোটানায় দোলায়িত, সিদ্ধান্ত-ভীরু, ঘরেও-নহে পারেও-নহে তটস্থের দেখা নয়। একটা চূড়ান্ত মীমাংসার দিকে পদক্ষেপ করতেই হবে রবীন্দ্রনাথকে, কেননা কর্মীর দেখার মধ্যেই কাজের তাগিদ নিহিত।

৪.

এইবারে আমরা আমাদের বিষয়ের কেন্দ্রের কাছে এসে পেঁছিতে পারলাম।

যে দোটানার কথা আগেই বলা হয়েছে, আমরা জানি, তার একদিকের টানে মুগ্ধতা, অন্যদিকের টানে প্রশ্ন, সন্দেহ, ভয় ; তার একদিকের টানে সমর্থন, আর-একদিকের টানে আপত্তি। এইবারে প্রশ্নগুলোকে, রবীন্দ্রনাথের আপত্তির ক্ষেত্রগুলোকে যেমন একটু তলিয়ে দেখা দরকার, তেমনি রবীন্দ্রনাথের সমর্থনের হেতুগুলিকেও একটু তলিয়ে বুঝে দেখতে হবে। তার পরে রবীন্দ্রনাথের উত্তরণমুখী পদক্ষেপের প্রসঙ্গ। সেইটেই আমাদের আলোচনার উপসংহার।

প্রথমে মুগ্ধতার দিকটি—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সমর্থনের হেতুগুলিকে একটু হিসেব করে দেখা যাক।

সব থেকে প্রথমেই আসবে রাশিয়ার অকল্পনীয় শিক্ষাবিস্তারের কথা। শুধু রাশিয়া নয়, রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, যে-কোনো দেশের জাতীয় উন্নয়নের পক্ষে শিক্ষা সকলের আগে এবং শিক্ষা সকলের থেকে বড়ো। 'রাশিয়ার চিঠি'তে রাশিয়ার শিক্ষাবিস্তার প্রসঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন—

"আমাদের সকল সমস্যার সব চেয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত—ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়।"৭

ওই বইয়ের অন্য চিঠিতে লিখেছেন—

"আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যও এদের সমান চেষ্টা।"৮

রাশিয়া পৌঁছবার পর দিনই (১২ই সেপ্টেম্বর) সোভিয়েট লেখকদের সংযুক্ত ফেডারেশনের সম্বর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আপনাদের পথ ও লক্ষ্যের সমালোচনা আমি করতে চাই নে। একটি জিনিস আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে, আপনারা সবার প্রতি শিক্ষার অমূল্য অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। এর ফলে মানবমনের যত অবরুদ্ধ ঐশ্বর্য আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাচ্ছে, আর এটা এতই বড়ো জিনিস যে তাতে গর্ব বোধ করার আপনারা অধিকারী।"৯

সাম্যের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার কথাটা আলাদা করে হয়তো বলাই নিষ্প্রয়োজন। 'রাশিয়ার চিঠি'-র পত্রের ক্রমভঙ্গ করে, ২০ তারিখের চিঠি প্রথমে নিয়ে এসেছেন তিনি এই কথা দিয়ে বই শুরু করবার উদ্দেশ্যে। তাই থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কথাগুলোর গুরুত্ব বোঝা যাবে।

"রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।

"চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন ; তাদের মানুষ হবার সময় নেই ; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে, কম পরে, কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে ; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান।... তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

"আমি অনেক দিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোনো উপায় নেই।... অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে, এ কথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে।...

"...রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা-সমাধান করার চেষ্টা চলছে।"১০

ধনবৈষম্য লাঘবের কথায় বলেছেন—

"এখানে এসে যেটা সব চেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এ দেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে।"১১

মস্কোতে ট্রেড ইউনিয়ন ভবনের জলসায় (২৪ সেপ্টেম্বর) রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা, সাম্য ও গণমুক্তির আদর্শের কথাটি একেবারে ঘোষণা-বাক্যের মতো করে উচ্চারণ করেছেন—

"আমি স্বপ্ন দেখি সেই দিনটির যেদিন আর্যসভ্যতার ঐ প্রাচীন ভূমির [ভারতবর্ষের] সব মানুষ শিক্ষা ও সাম্যের মহাশীর্বাদ লাভ করবেন। আমার

বই বইয়ের ঠিকানা

বহুদিনের স্বপ্ন, যুগে যুগে ধরে শৃঙ্খলিত গণমানসমুক্তির স্বপ্নের বাস্তবরূপ দেখতে আমায় যাঁরা সাহায্য করলেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।"১২

রবীন্দ্রনাথ আর একটা বিষয়ের উপর খুব জোর দিয়েছেন। সে হল রাশিয়ার বিভিন্ন এলাকার পশ্চাদ্‌পদ জাতিসমূহের উন্নয়ন। শুধু সামাজিক বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ফসলগুলির—চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নৃত্য, থিয়েটার, সংগীত, সাহিত্য ইত্যাদির সম্ভোগের সুযোগ দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তার জন্য সোভিয়েট সরকারের সর্বাত্মক প্রয়াস রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে।

সোভিয়েট সরকার যে পল্লীকে অবহেলা করে নি, বিজ্ঞানের সমস্ত দান যে দূরতম পল্লীতে গিয়ে পৌঁছচ্ছে, টেক্‌নলজির পরিপূর্ণ সহায়তা যে গ্রামের কৃষির কাজে লাগছে, এ অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের কাছে যেমন নতুন, তেমনি তৃপ্তিদায়ক। অত্যন্ত সপ্রশংস কণ্ঠে এ বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন—

"এরা তিনটে জিনিস নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে—শিক্ষা কৃষি এবং যন্ত্র। এই তিন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত অন্ন এবং কর্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা করছে।"১৩

মুগ্ধতার আরো একটা বড়ো কারণ হল এদের সাহস, এদের তেজ, এদের অমিত যৌবনশক্তি।

"এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্বপ্রথমেই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস। সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থি-মজ্জায় মনে প্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে···। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে—ভয় ভাবনা সংশয় কিছুই মনে নেই।··· অন্য দেশের তুলনায় এদের অর্থের জোর অতি সামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর দুর্ধর্ষ।"১৪

সহজেই বোঝা যায়, 'বলাকা'-র তারুণ্যের কবির কাছে এই বাঁধ-ভাঙা দুঃসাহস চিরকালই সম্মান পাবে।

৩.

আপত্তির দিকগুলিও কম জোরালো নয়।

প্রথম আপত্তি শিক্ষাবিধি নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, রাশিয়ার শিক্ষাবিধি ছাঁচে ঢালা। রাশিয়ার শিক্ষাবিস্তার প্রয়াসের প্রশংসা করতে গিয়েই এ বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন—

"এর মধ্যে যে গলদ কিছুই নেই, তা বলি নে—গুরুতর গলদ আছে। সে জন্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে, শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে—কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না—সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ

হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।"১৫

দ্বিতীয় আপত্তি ব্যক্তিস্বাধীনতাকে নিয়ে। এই আপত্তিটা উল্টো দিক থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে ডিক্‌টেটারশিপের বিরুদ্ধে আপত্তিতে। এখানে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ আপোষহীন। এ আপত্তি কেবল রবীন্দ্রনাথের বা কেবল লিবারাল হিউম্যানিস্টের নয়, এ আপত্তি আরো অনেকের। এখানে এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক।

তৃতীয় আপত্তি প্রধানত তত্ত্বগত। এঁরা বলছেন, সকলের আগে সমাজ-বিপ্লব। যত-কিছু কল্যাণকর্ম সব তার পরে। শিক্ষাও তাই: আগে বিপ্লব, তারপরে শিক্ষা-বিস্তার। এঁরা মনে করেন, সমাজব্যবস্থার বদল না ঘটলে শিক্ষার ক্ষেত্র কেন, কোনো ক্ষেত্রেই বড়ো বদল সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ তা মনে করেন না। তিনি মনে করেন, ওটা হল ঘোড়ার আগে গাড়ি বসাবার দুশ্চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষাবিস্তার সর্বাগ্রে। শিক্ষিত না হলে, জনসাধারণের বুদ্ধি, বোধ এবং আত্মবিশ্বাস জাগ্রত না হলে, সেই জনসাধারণ সব সময় স্বার্থ-সাধনীদের হাতিয়ার হবে, তারা যা করবে তাতে জনকল্যাণ হবে না। অন্ধ অশিক্ষিত মূঢ় মানুষদের নিয়ে যে বিপ্লব, তা কখনোই বাঞ্ছিত বিপ্লব হবে না।

রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ আপত্তিও তত্ত্বগত, এবং আরো গোড়া-ঘেঁষা। সে হল বিপ্লবকে নিয়ে, আলংকারিক অর্থে বিপ্লব নয়, সত্যিকারের রক্তাক্ত বিপ্লবকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বরাবরই মনে করেন, পশুত্বকে পার হয়ে যাওয়াতেই মানুষের মনুষ্যত্ব। তিনি মনে করেন, শক্তির বা প্রতাপের পথ, যাকে বলা যায় হিংসার পথ, সে হল মনুষ্যত্ববিরোধী পথ। এ পথে পা দিলে হিংসার অমোঘ নীতিকে মানুষকে অবধারিতভাবে মনুষ্যত্বভ্রষ্ট হতে হয়। রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ আসলে পশুত্বের পথ, বর্বরতার পথ, মানুষের মানবতা-অর্জনের সাধনায় অগ্রগামিতার পথ নয়, পিছু-হটার পথ। এ পথে কখনোই মানবমুক্তি সাধিত হতে পারে না। আশু একটা ফললাভ হয় বটে, সে ফল স্থায়ী নয়, কল্যাণকর নয়। তার অকল্যাণটাই দীর্ঘস্থায়ী।

তাহলে মানবমুক্তির পথ কী? পথের কথাটা রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট করে আমাদের বলেন নি। পথের অনেকখানিই যে শিক্ষাবিস্তার তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সব সময়, সব ক্ষেত্রে শিক্ষাবিস্তারই যথেষ্ট নয়। 'মুক্তধারা'-র অভিজিৎ শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী হয় নি, 'রক্তকরবী'-র নন্দিনীও শিক্ষাবিস্তারের পথ বেছে নেয় নি।

তাহলে কি মানবমুক্তির পথ বীরের আত্মোৎসর্গের পথ, সাধকের আত্ম-ত্যাগের পথ? হয়তো রবীন্দ্রনাথ তাই বলতে চান। তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যে—কবিতায় নাটকে আভাসে-ইশারায় রূপকে প্রতীকে হয়তো রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলতে চেয়েছেন। হয়তো তাঁর মতে মানবমুক্তির পথ 'মুক্তধারা'-র অভিজিতের পথ, হয়তো সে পথ 'রক্তকরবী'র নন্দিনীর পথ, হয়তো সে পথ 'শিশুতীর্থে'র

বই বইয়ের ঠিকানা

তন্ত্র সাধক—নিহত অধিনেতার পথ। যে পথই হোক, তা রক্তাক্ত বিপ্লবের ভয়ংকর পথ নয়।

খটকা লাগে নন্দিনীকে নিয়ে। নন্দিনীর পথ কি বিপ্লবের পথ নয়? সেই বিপ্লবে কি রক্তপাত ঘটবে না? বিষয়টাকে রবীন্দ্রনাথ একটু ঝাপ্‌সাই রেখে দিয়েছেন। দানবের সাথে সংগ্রামের জন্য যারা ঘরে ঘরে প্রস্তুত হচ্ছে, মাঠে বন্দরে প্রস্তুত হচ্ছে, তাদের রবীন্দ্রনাথ ডাক দিয়েছেন কোন্ সংগ্রামে নামাবার জন্য?

মনে হয়, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকে একটু নতুন করেই ভেবেছেন, হয়তো পুরোপুরি মনস্থির করতে পারেন নি।

তাহলেও সাধারণভাবে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ হিংসার বিরোধী। সাধারণভাবে তিনি মনে করেন, উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন, তার জন্য খারাপ পন্থা কখনোই গ্রহণ করা যায় না। করলে, সেই পন্থার পাপ উদ্দেশ্যে গিয়ে অর্শায়। তাতে মহৎ উদ্দেশ্য অলক্ষ্যে অসৎ উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের মতে end কখনো means-কে পাপমুক্ত করতে পারে না, বরং উল্টে দোষযুক্ত means-এর টানে উক্ত আদর্শেরই ভরাডুবি ঘটে। 'চার অধ্যায়'র সন্ত্রাসবাদীদের এই ভরাডুবিই ঘটেছিল।

End এবং means-এর এই তর্ক বহুকালের। এ তর্ক বহুকালেরই অমীমাংসিত তর্ক।

শুধু এইটেই যে অমীমাংসিত তা নয়, রবীন্দ্রনাথের সবগুলি আপত্তিই অল্পবিস্তর অমীমাংসিত আপত্তি, অন্তত রবীন্দ্রনাথের নিজের কাছে—এবং সমস্ত লিবারাল হিউম্যানিস্টের কাছেই।

৬.

কেউ কেউ মনে করেন, রাশিয়া সম্পর্কে যে মুগ্ধতা রাশিয়া-ভ্রমণের কালে রবীন্দ্রনাথের ছিল, পরে—বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তা কেটে গিয়েছিল। অন্য পক্ষে, কারো কারো ধারণা এই যে, রাশিয়া সম্পর্কে খটকা আগে যদি বা কিছু থেকে থাকে, রাশিয়া-দর্শনের পরে তা সম্পূর্ণ কেটে গিয়েছিল। দুটি ধারণাই ভুল।

প্রশ্ন আরো দু-একটি নতুন জেগে উঠতে পারে, কিন্তু যে শ্রদ্ধার মূল জীবনদর্শনের গভীরে—রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যের সঙ্গে যা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সে শ্রদ্ধা মোটেই সহজে চিড় খাবার মতো নয়। অন্য দিকে যে খটকা রবীন্দ্রনাথের বহুকালের বিশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত, তা-ই কি সহজে কেটে যেতে পারে?

রবীন্দ্রনাথের সব থেকে বড়ো খটকা যাকে নিয়ে, বিপ্লব, হিংসার পথ, প্রতাপের পথ, তাকে নিয়ে প্রশ্ন রবীন্দ্রসাহিত্যে সর্বত্র-পরিব্যাপ্ত। এই খটকাকে

বুঝতে হলে প্রেম ও প্রতাপের দ্বন্দ্ব নিয়ে, যন্ত্র ও যান্ত্রিকতাকে নিয়ে, মানবতা-ভ্রষ্ট মানুষের ট্র্যাজেডিকে নিয়ে এই উদার মানবতাবাদী সারাজীবন যেভাবে ভেবে এসেছেন, যে ভাবনা রূপ নিয়েছে তাঁর 'বিসর্জন', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'চার অধ্যায়' প্রমুখ নাটকে উপন্যাসে, তাকে ভালো করে বুঝতে হবে। ঠিক তেমনি, যেখানে রবীন্দ্রনাথের মৌল সমর্থন, সেই সাম্য ও মানবমুক্তির আদর্শকে যদি বুঝতে হয়, তাহলে তাকাতে হবে রবীন্দ্রনাথের দেশভাবনার দিকে, রবীন্দ্রনাথের কর্মসাধনার দিকে। রবীন্দ্রনাথের সমর্থনের গভীরতাকে অনুধাবন করতে হলে তলিয়ে দেখতে হবে কেন বঙ্গভঙ্গের কালে স্বদেশী আন্দোলন থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন, এবং তারপরে শিলাইদহ-অঞ্চলে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করে, বয়স্কশিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে, ব্রতীবালকদল তৈরি করে তিনি কী করতে চেয়েছিলেন পূর্ব বাংলার অঞ্চলবিশেষকে কেন্দ্র করে। আরো বুঝে দেখতে হবে কেন রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেন নি, ওই আন্দোলনের পিঠে-পিঠে কেন তাঁর শ্রীনিকেতন-প্রয়াস শুরু হল এবং শ্রীনিকেতনে তিনি কী করতে চেয়েছিলেন, কী করেছেন।

কেন যে তাঁর মনে সমর্থনের শক্তিই অপেক্ষাকৃত জোরালো তা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে সমস্ত ব্যাপারটাকে তাঁর সারা জীবনের কর্মসাধনার প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। রাশিয়া থেকে ফেরার চার বছর পরের এক চিঠিতে (১৫ নভেম্বর ১৯৩৪) অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি লিখেছেন—

"...শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ।"[১৬]

৭.

তাহলে সব মিলিয়ে কী আমরা দেখলাম—সমর্থন, না আপত্তি, না তটস্থ অবস্থা?

না-গ্রহণ না-বর্জন নীতিতে সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখে তটস্থ হয়ে বসে থাকা কর্মীর পক্ষে সম্ভব নয়। নিছক কবি হয়তো তা পারেন, নিছক বুদ্ধি-বিশ্বাসীও হয়তো তা পারেন, কিন্তু কর্মীকে কাজের প্রয়োজনেই বাছাই করে নিতে হয়—জীবনের প্রয়োজনেই কাজে নামতে হয়। রবীন্দ্রনাথের উত্তরণ তাঁর কাজের টানে উত্তরণ। আংশিক হতে পারে, অসম্পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু তার একটা স্পষ্ট রূপ আছে।

মাত্র দুটি উদ্ধৃতি দিয়েই আমাদের বক্তব্য শেষ করব। সমর্থন যে কত প্রবল তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে প্রথম উদ্ধৃতিটিতে। মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে, ১৯৩৬ সালে অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে (২৮ জুলাই) তিনি লিখেছেন—

"সোভিয়েট রাশিয়ার নাম করা এদেশে অপরাধবিশেষ। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে না করেও থাকতে পারিনে। বিশাল রাজ্যের অন্নের সংস্থান, শিক্ষার

বই বইয়ের ঠিকানা

ব্যবস্থা, রোগ নিবারণ কী অসাধারণ উদ্যম নৈপুণ্য ও যত্নের সঙ্গে সেখানে নির্বাহ করা হচ্ছে তার বিচার করে মনে শ্রদ্ধামিশ্রিত ঈর্ষা না হয়ে থাকতে পারে না। তার প্রধান কারণ সোভিয়েট রাশিয়া একটি অখণ্ড সজীব কলেবর।"১৭

আপত্তি যে স্তিমিত হয়ে এসেছে তার নিদর্শন পাই বিপ্লব সম্পর্কিত চিন্তায়। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি তাই নিয়ে। এটিও অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি (৭ই মার্চ ১৯৩৫) থেকে তোলা।—

"সভ্যতার এই ভিত্তিবদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে।··· নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখি নি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব—এ বিপ্লব অনেকদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান।··· সর্বমানবের তরফে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন এ কথা মনে আপনি আসে যে, নব্য-রাশিয়া মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করচে যেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা মনে আপনিই জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক।"১৮

উল্লেখপঞ্জী

১. রাশিয়ার চিঠি—৩, র/১০/৬৭৯
[সংকেত : র = রবীন্দ্ররচনাবলী, প. ব. সংস্করণ, পরবর্তী সংখ্যা খণ্ড-সূচক, শেষ সংখ্যা পৃষ্ঠা-সূচক]
২. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবার্ষিকী, নথিপত্রের সংকলন, বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো, অনুবাদ-শঙ্খময় ঘোষ, পৃ-২০
৩. রাশিয়ার চিঠি—৪, র/১০/৬৮৩
৪. রাশিয়ার চিঠি—৩, র/১০/৬৮০
৫. তদেব—৮, র/১০/৭০৪
৬. তদেব—১, র/১০/৬৭৬
৭. তদেব
৮. তদেব—২, র/১০/৭০৭
৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ, পৃ-২৫
১০. রাশিয়ার চিঠি—১, র/১০/৬৭৫-৭৬
১১. তদেব—২, র/১০/৬৭৮
১২. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ, পৃ-৬৯
১৩. রাশিয়ার চিঠি—৫, র/১০/৬৯৩
১৪. তদেব—৩, র/১০/৬৭৯
১৫. তদেব—১, র/১০/৬৭৬
১৬. চিঠিপত্র—১১, পত্রসংখ্যা-৭০, পৃ-১২২
১৭. তদেব, পত্রসংখ্যা—৮৯, পৃ-১৯৬
১৮. তদেব, পত্রসংখ্যা—৭৪, পৃ-১৪৫-১৪৬

সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্র-চর্চা

অধ্যাপক য়েভগেনি চেলিশেভ

রাশিয়া রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করল তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির একবছর পরে। ১৯১৪ সালে 'গীতাঞ্জলি'র রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হলে সঙ্গে সঙ্গেই তা রুশ-পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'গীতাঞ্জলি'র পরে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার অনুবাদও প্রকাশিত হলো। প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়ায় রবীন্দ্র-রচনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তা আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে উঠল। বেশ কিছু সাহিত্যিক এতে অংশ নিলেন, যদিও একান্ত ভিন্ন মতাদর্শ এবং নন্দনতাত্ত্বিক অবস্থান থেকে। তাঁরা প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথকে নিজেদের আত্মার আত্মীয় করে নিয়ে, যাঁর যাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়ন এবং ব্যাখ্যা করলেন, করলেন এক সম্পূর্ণ বিকৃত আলোকে। কবিকে বিশেষিত করা হলো মিস্টিক, প্রতীকীবাদী, অধ্যাত্ম-বাদী, ইত্যাদি অভিধায়। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের এই ভিন্ন ভিন্ন এবং নিতান্ত একপেশে মূল্যায়নে সারবস্তু তেমন ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে গবেষণা যত ব্যাপক এবং গভীর হলো, ততই এইসব অসত্য, উদ্দেশ্যপ্রবণ এবং একপেশে মূল্যায়নের অসারতা প্রকট হলো।

যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় সমুন্নত মানবিকতা, সুমহান শান্তি এবং প্রগাঢ় প্রজ্ঞার সন্ধান পেয়েছেন, খুঁজে পেয়েছেন মহানুভবতা এবং মানুষের, মানুষে মানুষে মৈত্রী ও প্রেমের আদর্শ—রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিই শেষ পর্যন্ত টিঁকে থেকেছে। মানবজাতির উদ্দেশে কবির বাণী, খুব সম্ভব, এই : জীবনের অন্তঃসার, বেঁচে থাকার আনন্দ আর বৈর ও নৃশংসতার অসারতার উপরেই নির্ভর করে মানবজাতির অস্তিত্ব। 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদক

বই বইয়ের ঠিকানা

কবি ভি. লেবেদেভ ঐ কালের কবিতাকে বলেছেন, 'আধ্যাত্মিক জীবনানন্দের সুমহান স্তবগান'। রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্যতম অনুবাদক কবি ও সাংবাদিক ই. শুখলোভস্কি লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ "মহাবিশ্বের ধ্যানে অনুপ্রাণিত জীবন, প্রেম এবং আনন্দের সংগীতকার।" সমালোচক ভ. ক্রানিখফেল্ড লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ প্রতীকীবাদীদের ধ্যানধারণা, এর অলীক প্রতারণা ধ্বংস করে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

রুশভাষায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের জীবনীর প্রচ্ছদ

তিনি এমন এক-আনন্দময় জীবনের সংগীতকার, প্রেমই যার অন্তঃসার এবং দীপ্তি।

রাশিয়ার প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতের জাতীয় কবি। তাঁরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিকর্মের তুলনা করেছিলেন। যেমন, লেখক ভ. ভারদভ বলেছেন, "তিনি প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সন্তান,—উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সংস্কৃতির যেমন বায়রন, রাশিয়ান সংস্কৃতির যেমন পুশকিন।"

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা পাঠের মাধ্যমে রাশিয়ার পাঠকরা রবীন্দ্রনাথকে আরো পূর্ণরূপে জানার সুযোগ পেলেন। ১৮৯০-র দশকে রচিত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিই ভারতের বহুজাতিক সাহিত্যে জটিল বাস্তবতার ভিত্তি রচনা করেছিল—এ তথ্য আজ সাধারণভাবে সুপরিজ্ঞাত। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের

গল্পের প্রথম অনুবাদক আ. ই. এবং আ. ফ. স্যুখংস্কির মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি মানুষের দৈনন্দিন অস্তিত্বের অনবদ্য, প্রাণবান এবং জীবনসত্যের চিত্ররাজি।" এবং আরো বলেছেন, "বাস্তবতায়, ব্যাপকতায় এবং মানবাত্মার রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের ছোট ছোট গল্পগুলি মহামতি তলস্তয়ের গল্পের সঙ্গে তুলনীয়।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়ায় রবীন্দ্র-গবেষণা শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয় অনুসন্ধানের একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ পথ ধরে। ১৯১৫ সালে 'সোভরেমেনিক' পত্রিকায় অ. ভেনগেরেভা-র রচিত প্রবন্ধে এই পথের প্রথম আভাস পাওয়া গিয়েছিল।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের পরে রবীন্দ্র-গবেষণার এবং আমাদের দেশে রবীন্দ্রসাহিত্য জনপ্রিয় করার প্রকৃতি বদলে গেল। ভারতের জাতীয় আত্ম-চেতনার জাগরণের আলোকে এবং মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে জানা শুরু হলো। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানবিকতার ধারণা সম্পর্কে সোভিয়েত সাহিত্য-গবেষক আ. ভরোনস্কি-র একটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমাদের শেখায়, "দুঃখ-যন্ত্রণার মুহূর্তেও জীবনকে ভালোবাসতে।" বুর্জোয়া সমাজের অন্যায়ের যে সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ করেছেন, তার উল্লেখ করে ভরোনস্কি বলেছেন, এর ফলে শেষ পর্যন্ত "প্রতিবাদকারী এবং নব-প্রবর্তকের" আসনে তাঁর উত্তরণ ঘটেছে। বিশ্ব সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার সত্যকার বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির বিষয়ে উল্লেখযোগ্য দান লেনিনের সহযোদ্ধা সুপরিচিত রাজনৈতিক পুরুষ এবং সাহিত্যিক আনাতোলি লুনাচারস্কির। মহাত্মা

রুশভাষায় অনূদিত "রাশিয়ার চিঠি" প্রচ্ছদ

বই বইয়ের ঠিকানা

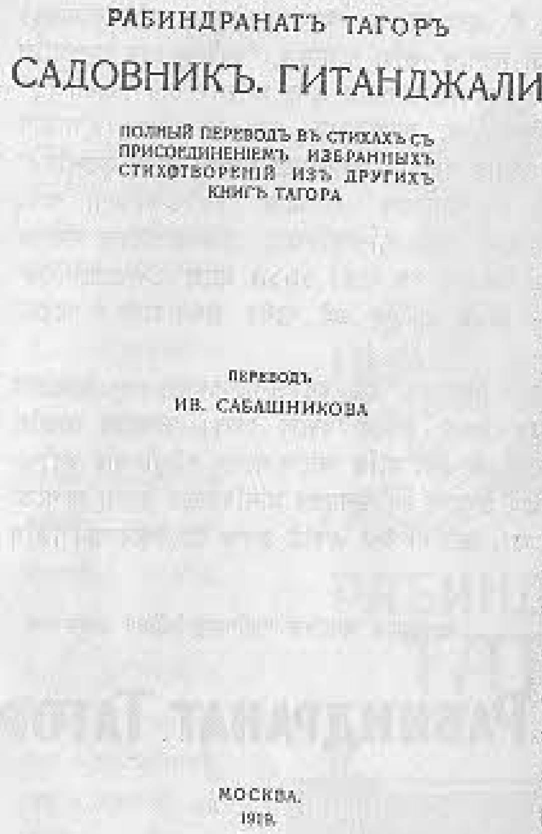
РАБИНДРАНАТЪ ТАГОРЪ

САДОВНИКЪ. ГИТАНДЖАЛИ

ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОДЪ ВЪ СТИХАХЪ СЪ ПРИСОЕДИНЕНІЕМЪ ИЗБРАННЫХЪ СТИХОТВОРЕНІЙ ИЗЪ ДРУГИХЪ КНИГЪ ТАГОРА

ПЕРЕВОДЪ
ИВ. САБАШНИКОВА

МОСКВА.
1919.

রুশভাষায় প্রকাশিত "গীতাঞ্জলি" ও "দা গার্ডেনার" পুস্তকের প্রচ্ছদ

পাশ্বীর উদ্দেশে নিবেদিত 'ভারতীয় তলস্তয়' প্রবন্ধে লুনাচারস্কি লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম ···এত বর্ণাঢ্য, এত সূক্ষ্ম আবেগমণ্ডিত এবং প্রকৃত মহৎভাবে পরিপূর্ণ যে, তা এখন মানব সংস্কৃতির অন্যতম সম্পদ।" পঞ্চাশ বছর আগের এই উক্তি আজও সমান তাৎপর্যবাহী। ১৯১৯ সালে লুনাচারস্কি দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন, 'ভেস্তনিক জ্নানিয়ে' (জ্ঞানের অগ্রদূত) এবং 'প্লামিয়া' (অগ্নিশিখা)। ঐ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের অনূদিত কবিতার সঙ্গে ক. ত্রোয়ানোভস্কি-র 'ভারতের তলস্তয়' এবং আ. কাইগোরোদভ-এর 'আর. টেগোর' নামে দুটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। ত্রোয়ানোভস্কি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের যে স্বাতন্ত্র্য তা এর মনুষ্যত্ব, মানবিক এবং মানুষ এই উভয় অর্থে, "কারণ মানবজাতির সত্তায় তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। এরই মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিকতার উপাদান।"

রবীন্দ্র-রচনায় লোক-চরিত্র এবং সমৃদ্ধ নাগরিক উপাদান প্রসঙ্গে আ. কাইগোরোদভ লিখেছেন, "চিন্তার স্বাধীনতা, দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রতিটি হিন্দুর হৃদয়ে জীবন্ত এবং ভারতের জাতীয় কবি এই মনোভাবের অংশীদার না হয়ে পারেন না।"

প্রথম দিকে যে-সব সোভিয়েত গবেষক রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁরা হামেশাই রবীন্দ্রনাথ ও তলস্তয়ের তুলনা করেছেন। যেমন, ত্রোয়ানোভস্কি-র পর ভ. তান-বোগোরাজ বিস্তৃত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মের পর্যালোচনা করেছেন। এঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের এবং ইয়াসনায়া

পলিয়ানা-য় তলস্তয়ের কার্যকলাপের তুলনা করেছেন। তান-বোগোরাজ রাশিয়ায় প্রথম রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। ঐ আলোচনায় তিনি নারী-চরিত্র উদ্ঘাটনে রবীন্দ্রনাথের সুদক্ষতার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্র-গবেষণার প্রসারে ম. তুবিয়ানস্কি-র দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত আকাদেমিশিয়ান ফ. ই. স্চেরবাৎস্কি ছিলেন এঁর শিক্ষক। বাংলা থেকে রবীন্দ্র-রচনার অনুবাদ আমাদের দেশে তিনিই প্রথম করেন। ইনি কখনো ভারতে যান নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনূদিত গ্রন্থের অসংখ্য ভূমিকা এবং মন্তব্যে ইনি তাঁর বিষয়ে এবং ভারতে প্রকাশিত রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯২৪ সালে মস্কোয় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি'র ভূমিকায় তুবিয়ানস্কি ভারতের দার্শনিক এবং সামাজিক চিন্তার প্রগতিশীল বিকাশের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার সঙ্গে বৈষ্ণব কবিতা তথা ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিষয়ে তিনিই প্রথম এ-দেশের পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি তিনি রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' এবং 'গোরা' উপন্যাস নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনা করেন; আমরা যতদূর জানি, ভারতের বাইরে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনা নিয়ে এ-আলোচনাই প্রথম

"গোরা" উপন্যাসের রুশ সংস্করণের প্রচ্ছদ

বই বইয়ের ঠিকানা

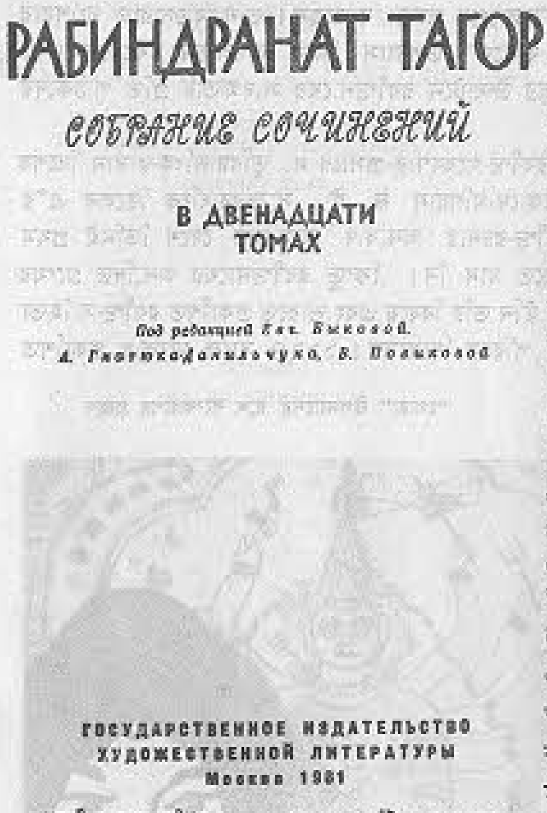
РАБИНДРАНАТ ТАГОР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

Под редакцией Евг. Быковой,
А. Гнатюк-Данильчук, В. Новиковой

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1961

"রবীন্দ্র রচনাবলী"র রুশ সংস্করণের একটি খণ্ডের প্রচ্ছদ

গবেষণামূলক বিশ্লেষণ। সোভিয়েত রবীন্দ্র গবেষণায় তাঁর অপর গুরুত্বপূর্ণ দান পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে-সব প্রচলিত ধারণা রয়েছে তার বিচার-বিশ্লেষণমূলক মূল্যায়ন। তাঁর মতো আর যাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে তুবিয়ানস্কি লিখেছেন যে, এঁদের মধ্যে অল্পসংখ্যক গবেষকই, "বিকৃত এবং ভুল উপস্থাপনার লতাতন্তু পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সত্যকার এবং প্রকৃত মানবিক অন্তঃসার স্পর্শ করতে পেরেছেন।" ভারতের এই মহান কবির সৃষ্টিকে ভুল বোঝার অথবা ইচ্ছাকৃত বিকৃতিসাধনের কারণ সম্পর্কেও তুবিয়ানস্কি চিন্তা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ইওরোপ যে রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধি করতে পারে না তার প্রধান কারণ, ইওরোপে আধ্যাত্মিক প্রবণতা-আরোপিত ভারতীয় সংস্কৃতির মিথ্যা চিত্র।"

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়নে তাঁর ঐতিহাসিক সফরের পর, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশ ও তার মানুষ সম্পর্কে হার্দ্য মনোভাব বজায় রেখেছিলেন। সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায় তাঁর ভাষণ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন, ১৯৩৭ সালের ২২ মার্চ 'ইজভেস্তিয়া' প্রজাতান্ত্রিক স্পেনের সমর্থনে লেখা রবীন্দ্রনাথের খোলা-চিঠি প্রকাশ করেছিল। ১৯৩০-র দশকে খ্যাতনামা সোভিয়েত পণ্ডিত আকাদেমিশিয়ান স. ফ. ওলদেনবার্গ এবং আ. স. বারান্নিকভ, এবং অধ্যাপক প. গ. রিতার রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল লেখা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের ৮০তম জন্মদিন উপলক্ষে, ১৯৪১ সালের মে মাসে 'ইন্তারন্যাশনালায়া লিতারেতুরা' পত্রিকার 'মহান ভারতীয় লেখক' শীর্ষক প্রবন্ধে সুপরিচিত সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদ ন. স. গোলদ্দেবার্গ লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথ "ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতীক।"

ঔপনিবেশিক অধীনতা থেকে ভারতের মুক্তির পর ভারতের জনগণের জীবন, তাঁদের সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের দেশে নতুন করে আগ্রহের সঞ্চার হলো; বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে, যাঁর প্রতিভা এবং বৈভব আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের সকল দিক আলোকোজ্জ্বল করে রেখেছিল।

রেইসনার এবং গোলদ্দেবার্গের কাজের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণার এক নতুন পর্বের সূচনা হলো। রেইসনার রবীন্দ্রনাথকে আখ্যাত করলেন "আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের মহত্তম ব্যক্তিত্ব হিসেবে", কবি-রূপে যিনি "জীবনকে গ্রহণ করেছিলেন তার পরিপূর্ণ সামগ্রিকতায়, প্রকৃতিকে যিনি উপলব্ধি করেছিলেন গভীরভাবে এবং মানুষের সত্যকার সৌন্দর্য সম্পর্কে যাঁর ছিল সূক্ষ্মতম অনুভূতি।" মহান কবির সৃষ্টির সমস্ত মানবিক লক্ষণের উল্লেখ করে তিনি বলছেন, "মানবিকতায় আপ্লুত রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা ভারত-প্রেম উদ্বোধিত করে, যে প্রেম জাত-পাত বা ধর্মীয় সংকীর্ণতা বা উৎকট স্বদেশপ্রেমের প্রতিবন্ধকতায় অনুরঞ্জিত ছিল না।" 'গোরা' আলোচনা প্রসঙ্গে গোলদ্দেবার্গ প্রথম বললেন এই উপন্যাসে ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।

কবির জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনে সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্র-গবেষণা আর এক-ধাপ এগিয়ে গেল। এই দিনটি সোভিয়েত ইউনিয়নে মহা সমারোহে

"রবীন্দ্র রচনাবলী"র রুশ সংস্করণের আরেকটি খণ্ডের প্রচ্ছদ

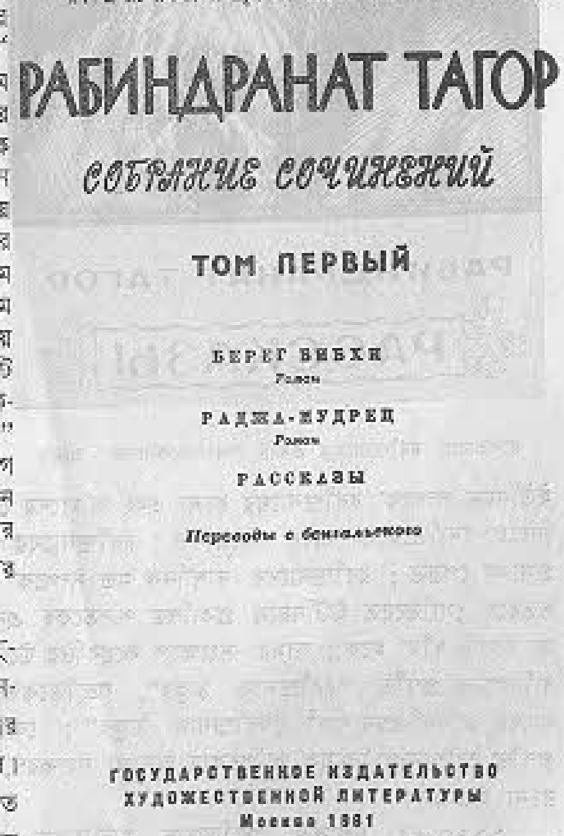
РАБИНДРАНАТ ТАГОР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

БЕРЕГ БИБХИ
Роман

РАДЖА-МУДРЕЦ
Роман

РАССКАЗЫ

Переводы с бенгальского

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1961

বই বইয়ের ঠিকানা

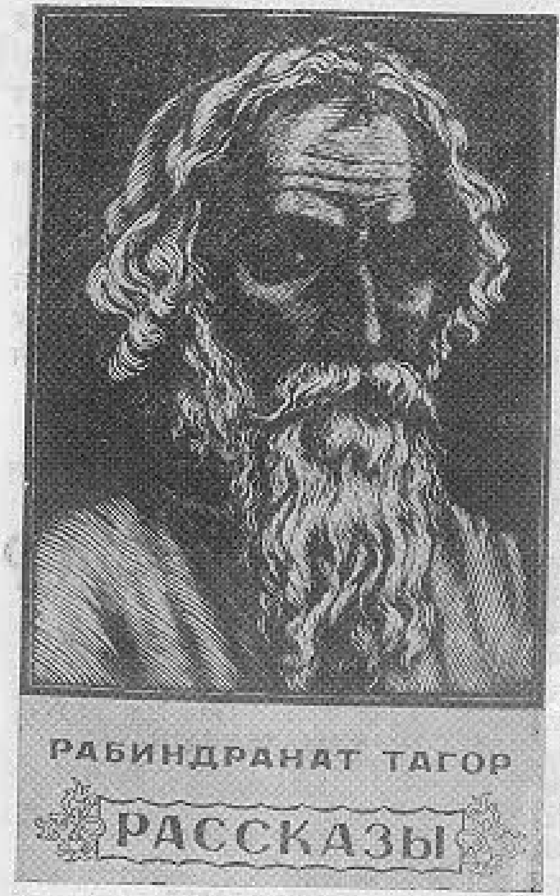

রুশভাষায় রবীন্দ্রনাথের একটি "গল্পসংকলনের" প্রচ্ছদ

পালিত হলো। রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং তাঁর বিশ্ববীক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে সোভিয়েত ও ভারতীয় লেখকদের রচনার একটি সংকলন প্রকাশ করল প্রাচ্য গবেষণা ইন্সিটিউট। ভারতীয় লেখকদের মধ্যে ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে প্রভৃতি। যে-সব সোভিয়েত রবীন্দ্র-গবেষক এই সংকলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন : রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে গ্নাতিয়ুক-দানিলচুক ; রবীন্দ্র-রচনায় ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতিফলন বিষয়ে তোভ্স্তিখ এবং চিচেরোভ ; রবীন্দ্রনাথের ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তা সম্পর্কে বীকোভা ; সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং আমাদের দেশে রবীন্দ্ররচনার সমাদর বিষয়ে নোভিকোভা এবং গামায়ুনভ ; রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে পেত্রভ ; রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মত সম্পর্কে লিতম্যান। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত পুস্তকের একটি তালিকামাত্র করলেও তা যথেষ্ট দীর্ঘ হবে ; আমরা সংক্ষেপে কয়েকটির উল্লেখ করছি। গ্নাতিয়ুক-দানিলচুক প্রণীত "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর", স্তভিয়েভস্কায়া সংকলিত রবীন্দ্রনাথের জীবনী-রচনাপঞ্জী "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" ; বোরোভিক এবং চেলিশেভ প্রণীত রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক পুস্তিকার অসংখ্য সংস্করণ, অসংখ্য অনুবাদ, প্রবন্ধ, রচনা ইত্যাদি।

১৯৬০-এর দশকেও সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল ঐতিহ্যের গবেষণা অব্যাহত ছিল। সোভিয়েত প্রাচ্যচর্চায় বিশেষজ্ঞ-গবেষণার প্রসারের ফলে রবীন্দ্রসাহিত্যের তত্ত্বগত অনুসন্ধান বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে বেশকিছু গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হলো, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল ঐতিহ্যের বিশ্লেষণ করা হলো। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি প্রক্রিয়া নিয়ে অনুসন্ধান এবং তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ করলেন ইভবুলিস এবং চেলিশেভ। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে স্ত্রোসালিনা আনুপূর্বিক অনুসন্ধান করলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এবং নানা প্রবন্ধে। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়নের উপরে একটি সফল গবেষণা পরিচালনা করেন কোমারভ—গবেষণার ফল নিয়ে ইতিমধ্যেই তাঁর বেশকিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্র-গবেষণার ভূগোল প্রসারিত হলো এবং মস্কো ও লেনিনগ্রাদের সীমানার বাইরে তা ছড়িয়ে পড়ল। লাতভিয়ার রাজধানী রিগা-য় ইভবুলিস প্রখ্যাত লাতভিয়ান রবীন্দ্র-গবেষক ইগুলে-র ঐতিহ্য অনুসরণ করে রবীন্দ্র-গবেষণার কাজ করে যেতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ইগুলে নানা নিবন্ধ লিখেছিলেন ১৯৩০-এর দশকে। ১৯৭৮ সালে লাতভিয়ান ভাষায় প্রকাশিত হলো ইভবুলিস রচিত গ্রন্থ "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"। এখন তিনি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে দ্বিতীয় গ্রন্থ নিয়ে কাজ করছেন। ১৯৮১ সালে গ্রন্থটি রুশভাষায় প্রকাশিত হবে।

রবীন্দ্রসাহিত্য অধ্যয়নে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিকাশে মস্কোর স্টেট খুদোঝেস্তভেনায়া লিতেরাতুরা পাবলিশার্স প্রকাশিত ৮ খণ্ডের (১৯৫৫ - ১৯৫৭)

রুশভাষায় প্রকাশিত "নির্বাচিত গল্পসংকলন"

বই বইয়ের ঠিকানা

এবং ১২ খণ্ডের (১৯৬১-১৯৬৫) নির্বাচিত রচনাবলীর দান অনেকখানি। বর্তমানে ঐ একই প্রকাশন সংস্থা ১৯৮১-১৯৮২ সালে ৪ খণ্ডে রবীন্দ্ররচনার এক সংস্করণ প্রকাশের কাজে ব্যাপৃত। এই সংস্করণ প্রস্তুতির কাজে খ্যাতনামা সোভিয়েত রবীন্দ্র-গবেষকগণ সাহায্য করছেন।

সম্প্রতি সোভিয়েত রবীন্দ্র-গবেষকগণ কবির জীবন ও কর্ম বিষয়ে ২ খণ্ডের সহস্রাধিক পৃষ্ঠার একটি সংকলন গ্রন্থ রচনার কাজ শেষ করেছেন। গ্রন্থের অধ্যায়গুলি এইরকম : রবীন্দ্রজীবনী এবং সর্জনশীল জীবন (পুনোতিয়ুক্-দানিলচুক) ; তাঁর সাহিত্যকর্ম (ইভ্বুলিস এবং স্রোসালিনা) ; শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর দান (মরোজোভা এবং তিউলিয়ায়েভ); তাঁর নাট্যকর্ম (কোতোভস্কায়া) ; তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত মতামত (সুচকভ) ; তাঁর নান্দনিক দৃষ্টি-ভঙ্গি (চেলিশেভ) ; তাঁর দার্শনিক মতামত (লিতম্যান); তাঁর বিশ্ববীক্ষা (কোমারভ); সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশে রবীন্দ্রনাথ ; রবীন্দ্রনাথের বিশ্বব্যাপী তাৎপর্য।

রুশভাষায় রবীন্দ্রনাথের "নাটকের সংকলন"

রবীন্দ্রনাথের ১২০তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে গ্রন্থটি ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হবে।

এই গ্রন্থ, রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী কর্মধারা, তাঁর সাহিত্যকর্ম, যার সঙ্গে ভারতের সামাজিক - অর্থ-নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ, ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধযুক্ত—তার সামগ্রিক বিশ্লেষণ।

সোভিয়েত গবেষকদের মূল লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মের উদ্ঘাটন, তাঁর সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রকৃতি-নিরূপণ, রবীন্দ্রসাহিত্যে লৌকিক ভাবধারার অনুসন্ধান, তাঁর নান্দনিক এবং দার্শনিক মতামতের স্বরূপ-বিচার, তাঁর সৃষ্টিকর্ম এবং দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহ্য ও নবপ্রবর্তনের প্রশ্নালোচনা, এই অনন্য কবি, গদ্যকার, নাট্যকার, শিল্পী এবং সংগীতরচয়িতার অসাধারণ দক্ষতার রহস্য আবিষ্কার, বর্তমান ভারতে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিকাশ অনুসরণ এবং এই মহান ভারতীয় লেখকের সৃষ্টিকর্ম যে বিশ্বসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা দেখানো।

সারা বিশ্বে রবীন্দ্র-গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে যে অভিসন্ধি-মূলক মূল্যায়ন সবচেয়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত এই গ্রন্থে তার কয়েকটি সম্পর্কে আমরা সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেছি।

এই গ্রন্থ সংকলনে আমরা বিশ্বের রবীন্দ্র-অধ্যয়নের সবচেয়ে সফল গবেষণার উপর নির্ভর করেছি। স্বাভাবিকভাবেই, প্রথম ও প্রধানত নির্ভর করেছি ভারতীয় গবেষকদের গবেষণার উপর—যাঁদের সঙ্গে আমরা বহু বছরের ফলপ্রসূ বৈজ্ঞানিক যোগাযোগে আবদ্ধ। সোভিয়েত রবীন্দ্র-গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়াত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের দান অসামান্য। রবীন্দ্রনাথের সর্জনশীল উত্তরাধিকার নিয়ে গবেষণারত বহু ভারতীয় গবেষক-দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে আমরা কাজ করছি। সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী সংহত করার পক্ষে এমন অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁদের সাহায্য এবং পরামর্শ ছাড়া সাফল্যলাভ করা আদৌ সম্ভব নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত ইউনিয়নে সবচেয়ে সুপরিচিত এবং জনপ্রিয় ভারতীয় লেখক। সোভিয়েত সরকারের আমলে তাঁর রচনা ১৬৩ বার প্রকাশিত হয়েছে, ২৩টি জাতীয় ভাষায় যার মুদ্রণসংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। প্রাচ্যের আর কোনো লেখকের রচনা সোভিয়েত ইউনিয়নে এত ব্যাপকভাবে মুদ্রিত হয় নি।

এদেশে রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে কাজ চলছে প্রায় সাত দশক ধরে। একদল অনুবাদক যাচ্ছেন, আসছেন আর এক নতুন দল, তাঁদের সকলেরই আত্যন্তিক চেষ্টা একটাই, ভারতের এই মহান সন্তানের উদ্দীপক রচনার সঙ্গে সোভিয়েত পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া,—যথাসম্ভব যত্নে, যতখানি পরিপূর্ণভাবে সম্ভব।

রাশিয়ার অনুবাদকরা রবীন্দ্রনাথের যে কাব্যগ্রন্থটি প্রথম অনুবাদ করেন, তা 'গীতাঞ্জলি'—এর জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। অনুবাদ করেন ন. খার্ভাকিনা, ১৯১৪ সালে। পরে আর একজন কবি-অনুবাদক ভ. লেবেদেভও 'গীতাঞ্জলি'-র অনুবাদ করেছিলেন। তিনি এই অমর কাব্যকর্মকে আখ্যাত করেছিলেন "আধ্যাত্মিক জীবনানন্দের সুমহান স্তবগান" হিসেবে।

বই বইয়ের ঠিকানা

১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে রুশ ভাষায় অনূদিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি', 'দ গার্ডেনার', 'দ ক্রিসেন্ট মুন', 'ডাকঘর', 'রাজা', 'চিত্রা' এবং 'সাধনা'। বিখ্যাত সোভিয়েত লেখক কনস্তান্তিন পাউস্তোভস্কির মতে, ঐ সময় রাশিয়ায় "...রবীন্দ্রনাথই ছিলেন জনগণের মনের চালক। সমস্ত অনুবাদই করা হয়েছিল ইংরেজি থেকে, তার অনেকগুলোই খুব উঁচু মানের, বিশেষ করে খ্যাতনামা লেখক ইভান বুনিনের ভাইপো ন. পুশেশনিকভ-এর অনুবাদ, যার মূল্য এখনো এতটুকু কমে নি।"

অক্টোবর বিপ্লবের পর রবীন্দ্ররচনার অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ দ্রুতলয়ে শুরু হলো। গৃহযুদ্ধ চলছিল, নানা বাধার মুখোমুখি হচ্ছিল নতুন সোভিয়েত সরকার। ই. বুনিন সম্পাদিত এবং ন. পুশেশনিকভ অনূদিত 'গীতাঞ্জলি'-র চতুর্থ সংস্করণ মস্কোয় প্রকাশিত হলো ১৯১৮ সালে।

বাংলা থেকে রবীন্দ্ররচনা প্রথম রুশভাষায় অনুবাদ করলেন খ্যাতনামা ভারততত্ত্ববিদ আকাদেমিশিয়ান ফ. শ্চেরবাৎস্কি-র ছাত্র ম. তুবিয়ানস্কি। তাঁকেই বলা হয় সোভিয়েত রবীন্দ্র-গবেষণার স্থাপয়িতা। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্প-সংকলনের অনুবাদের সংগে সংগে তুবিয়ানস্কি রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় কবিতার অনবদ্য রসের সংগে রুশ পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজও চালাতে লাগলেন। ১৯২৫ সালে 'ভোস্তক' (পূর্ব) পত্রিকায় তুবিয়ানস্কিকৃত 'গীতাঞ্জলি'-র ১৩টি কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ঐ সময়টা নতুন সোভিয়েত অনুবাদ ঘরানার উদ্ভবের যুগ। জোর বিতর্ক চলতো, বিশেষ করে কাব্যিক অনুবাদের সমস্যা নিয়ে। ঐ সময়েই বিখ্যাত সোভিয়েত কবি ভ্যালেরি ব্রাইয়ুসভ বলেছিলেন, একভাষা থেকে অন্যভাষায় কবিকর্ম অনুবাদ অসম্ভব। অসম্ভব মূলের অনন্য জাতীয় মর্ম যথাযথ রাখা, আবার "এটা করার সমস্ত আশা জলাঞ্জলি দেওয়াও অসম্ভব"। এই প্রসংগে রবীন্দ্রকবিতার অনুবাদসূত্রে তুবিয়ানস্কি-র অর্জিত অভিজ্ঞতার তত্ত্বগত ও বাস্তব মূল্যও অনুধাবনযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন: "দুটি ভাষার পদবিন্যাসে এবং সামগ্রিক মর্মে এত পার্থক্য যে যথাযথ অনুবাদ সত্যিই খুব কঠিন, (অন্য অনেক প্রাচ্য ভাষা সম্পর্কেও এটা প্রযোজ্য) তদুপরি, বাংলা থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করার আদৌ কোনো ঐতিহ্যও নেই।" রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদের আদর্শ, মূল বাংলা কবিতার সংগে মানানসই করে রুশভাষায় সেই কবিতার ছন্দ ও ফর্ম-এর ব্যবহার সম্পর্কে তুবিয়ানস্কি তখন যা বলেছিলেন, আজও তা সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করতেন, "...মূলের ছন্দ এবং গঠন রেখে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ করা সম্ভব,... অনুরূপ সমার্থ শব্দ ব্যবহার করে বাংলা এবং রুশ মৌল মাত্রাসমতা রক্ষা করাও সম্ভব, কিন্তু বর্তমান অনুবাদক মনে করেন এ-কাজ তার সাধ্যের বাইরে এবং আশা করছেন অন্য কেউ এ-কাজ সম্পন্ন করবেন।" অন্যভাবে বলা যায়, ভাষা এবং বিষয় ভালো করে জানাই যথেষ্ট নয়: অনুবাদকের পদ্যরচনার দক্ষতা

থাকা চাই। আমাদের দেশের কবিদের মধ্যে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদের ভার নিয়েছেন তাঁরা অনেকদিন ধরেই এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে চলেছেন।

সবচেয়ে সাফল্যের সংগে এই কর্তব্য যাঁরা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বোরিস পাস্তেরনাক এবং আনা আখমাতোভা, যাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা খুব আপন মনে হয়েছে, অনুভব করেছেন বিশ্ব-উপলব্ধির কাব্যিক মানসিকতার সাধর্ম্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতার তাঁরা যে কাব্যসুষমামণ্ডিত অনুবাদ করেছেন, এখনো পর্যন্ত সেগুলোই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। সে অনুবাদ আক্ষরিক নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতার মর্মকে তাঁরা উদ্ঘাটন করেছেন।

প্রসংগের বাইরে, একটা কথা এখানে উল্লেখ করছি। রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' অনুবাদ করার সময় অনুবাদকরা যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন, আমাকে তার মোকাবিলা করতে হয়েছিল। গানটি ভারতের জাতীয় সংগীত। (১৯৭০ সালে 'ইন্ডিয়া' পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল) রুশভাষায় এই গানটি অনুবাদ করার সময়, অন্যান্য ইওরোপীয় ভাষায় এর যে অনুবাদ হয়েছিল তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হয়েছিল, বিশেষ করে ১৯১৯ সালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরেজি অনুবাদ এবং প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ হ. গ্লাজেনাপ-এর জার্মান অনুবাদ। মূলের কাব্যিক ফর্ম যতদূর সম্ভব বজায় রেখে, এর অনুবাদ আক্ষরিক হওয়া চাই।

রুশভাষায় গানটি যদি গাইতে হয় তাহলে মূল থেকে সরে না গেলে এ-গানের অনুবাদ করা যায় না। এর সুললিত ছন্দ, প্রগাঢ় ভাবব্যঞ্জনাময় অত্যধিক তৎসম শব্দের ব্যবহার রুশভাষায় অনুবাদ করতে গেলে পংক্তিগুলো দীর্ঘ হয়ে যেতে বাধ্য, তাতে গানটি আবৃত্তি করা চলতে পারে, গাওয়া চলে না। আমাদের অনুবাদকদের কি ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তা বোঝাবার জন্য এই বিশেষ উদাহরণটি দিলাম।

ঔপনিবেশিক নির্ভরতা থেকে ভারতের মুক্তির পর এবং আমাদের দুটি দেশের মধ্যে মৈত্রী ও সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক স্থাপনের পর সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষত রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ খুব বেড়ে যায়। রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করে সোভিয়েত পাঠকরা ভারতকে ভালোভাবে জানতে পারে, ভারতের মানুষ সম্পর্কে তাদের ভালোবাসা জাগ্রত হয়। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে স্টেট খুদোঝেস্তভেনায়া লিতারেতুরা পাবলিশার্স আট খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত রচনাবলী বাংলা থেকে অনুবাদ করে প্রকাশ করে। এর মধ্যে আছে 'রাশিয়ার চিঠি', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি। এগুলো এর আগে রুশভাষায় অনূদিত হয় নি। এ-ছাড়া ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'চোখের বালি', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' এবং 'নৌকাডুবি' উপন্যাস, কবিতা সংগ্রহ, ছোট গল্প এবং নাটকের আলাদা সংস্করণও অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এইসব সংস্করণ প্রকাশ করতে বাংলা

বই বইয়ের ঠিকানা

ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ভ. রীকোভা, আ. গ্নোতিয়ক-দানিলচুক, ভ. নোভিকোভা প্রমুখের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ঐ একই প্রকাশন সংস্থা ১২ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত রচনাবলী প্রকাশ করে। আগের চেয়ে এই সংস্করণ অনেক বেশি সম্পূর্ণ, বিস্তৃত এবং উন্নত। এর মধ্যে রয়েছে বাংলা থেকে প্রথম অনূদিত উপন্যাস 'দুই বোন', 'মালঞ্চ', 'রাজর্ষি', নাটক 'চণ্ডালিকা', 'তাসের দেশ', 'কালের যাত্রা', 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'চিরকুমার সভা', রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া কবিতা, প্রবন্ধ। এই অনুবাদকর্মে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন, গ. আর্লোভ্রয়েভা, ভ. রীকোভা, আ. গ্নোতিয়ক-দানিলচুক, ম. কার্ফিতনা, ব. কারপুশকিন, এ. কোমারভ, ভ. নোভিকোভা, স. স্মিরনোভা, ই. তোভস্তিখ, স. তুর্সিয়িন, ন. চেভাকিনা, গ. শেসতোপালোভা এবং অন্যান্যরা।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ সোভিয়েত জনগণের মনে প্রভূত উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

বর্তমানে, রবীন্দ্রনাথের ১২০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে খুদোঝেস্তভেনায়া প্রকাশন সংস্থা চার খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত যে রচনাবলী প্রকাশের কাজ করছে তাতে মুখ্য রচনা সবই থাকবে। অনুবাদে আরো উৎকর্ষ-সাধনের চেষ্টা চলছে। যুক্ত হবে নতুন টীকা ও মুখবন্ধ। রুশ ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য ভাষায় অনূদিত পৃথক সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তুতিও চলছে।

মস্কোয় রবীন্দ্রনাথ

১১—২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

বই বইয়ের ঠিকানা

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্সের প্রথম চিঠি

মস্কো, ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬

বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের সারা ইউনিয়ন সমিতি ভারতবর্ষের মহাকবি ও সাহিত্যিককে সৌভ্রাত্রীয় অভিনন্দন জানাচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাই ইওরোপ ও এশিয়ার সংস্কৃতির মধ্যে তাঁরা সংযোগ স্বরূপ, অনেকদিন আগে থেকেই গভীর আন্তরিকতায় তাঁরা আপনার সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পরিচয় রেখে আসছেন।

আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ পাঠক আপনার কলমে যে সব চরিত্র জীবন পেয়েছে তাদের ভাবনাচিন্তা অনুভূতি ও কাজ নিজেদের অন্তরে অনুভব করেছেন, এখনও করেন। আপনার সঙ্গে সোভিয়েত জনগণের বহুকাল আগেই এমন এক অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে, যা কেবল সত্যকার এক মহান শিল্পীর বাণীই সম্ভব করে তুলতে পারে।

বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের সারা ইউনিয়ন সমিতি খবর পেল আপনি এখন ইওরোপ ভ্রমণরত। সমিতির দৃঢ়বিশ্বাস, আপনাকে যদি আমাদের দেশ ভ্রমণ, আমাদের জীবন, আমাদের সংগ্রাম ও কাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে তোলার আমন্ত্রণ জানায় তাহলে সে আমন্ত্রণে আমাদের সোভিয়েত জনগণের মনের ভাবই ফুটে উঠবে। নতুন রাশিয়া, যাকে আমরা আর রাশিয়া বলে অভিহিত করি না কারণ এখন সে বহু জাতির স্বাধীন সংঘ, সেই নতুন রাশিয়া শুধু যে জারের আমলের পুরনো রাশিয়ার তুলনাতেই অনেক পৃথক তা নয়, সব পুঁজিবাদী রাষ্ট্র থেকেই সে একান্ত ভিন্ন।

নতুন রাশিয়া মনে করে এখন পর্যন্ত সেই একমাত্র দেশ যেখানে সাহসের সঙ্গে এমন এক নতুন সমাজ গড়ার আয়োজন চলেছে, যে সমাজে সবাই সুখে থাকতে পারে, কেউই দুঃখ নয়।

বই বইয়ের ঠিকানা

আমাদের আদর্শ অর্জন এখনো অনেক দূরের কথা কিন্তু তবু এই পথে প্রথম এবং সবচেয়ে কঠিন পদক্ষেপ আমরা ইতিমধ্যেই করেছি। এরমধ্যেই কিছু ফল আমরা পেয়েছি। অবিশ্বাস্য কাঠিন্যের মধ্যে দিয়ে আমরা যে শুধু নতুন অর্থনীতি ও নতুন রাজনীতিই গড়ে তুলছি তাই নয় সেই সঙ্গে গড়ে তুলছি নতুন সংস্কৃতি, নতুন সাহিত্য।

আমাদের আশা এই গঠনকার্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় গ্রহণে আপনি আগ্রহ বোধ করবেন।

আমাদের আশা, সোভিয়েত ইউনিয়নে যে নতুন জীবনের স্রোত বয়ে চলেছে, যার মধ্যে নিহিত রয়েছে মানব জাতির শ্রেষ্ঠ আশা, তার প্রবল উৎস স্বচক্ষে দেখে যেতে আপনি ইচ্ছুক।

বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের সারা ইউনিয়ন সমিতি মনে করে আমাদের দেশ ভ্রমণের এই আমন্ত্রণ আপনি গ্রহণ করবেন।

একান্তই আপনার

সভাপতির পক্ষে ই. মাইস্কি

পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ও সাধারণ সম্পাদক

ই. কারিনেৎস

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্সের দ্বিতীয় চিঠি

৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৮

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

আপনি আমাদের অতিথি হয়ে আসবেন বলে দুবছর ধরে আমরা অপেক্ষা করে আছি, এখনো এই আশা রাখি আপনার স্বাস্থ্য আপনাকে এই যাত্রার সুযোগ দিলে পরই আমরা আপনাকে এদেশে অভ্যর্থনা জানাতে পারব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে শিল্পী ও ভারতের সমাজকর্মী হিসেবে আপনি আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে গভীর আগ্রহ অনুভব করবেন।

আমাদের দুটি দেশের মধ্যে বিরাট ব্যবধান, দু'দেশের সমাজ-কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ দুর্লভ, তাই আপনার সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ আমাদের দুই জাতির ঘনিষ্ঠ সংযোগের পথে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করবে। আমাদের দেশে সর্বদাই আপনার প্রতিভা-মুগ্ধের সংখ্যা অনেক। আপনার একেকটি রচনা বহুবার প্রকাশিত হয়েছে আর এমনভাবে পুরোপুরিই বিক্রী হয়ে গেছে যে এখন আপনার জন্য একটি পুরো সেট সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখছি তা পাওয়া সম্ভব নয়। বহু প্রচেষ্টার পর যে বইগুলি (রুশ অনুবাদে) সংগ্রহ করতে পেরেছি কেবল সেগুলিই আপনাকে পাঠাব। আপনার প্রতি আমাদের অনুরোধ অনুগ্রহ করে এগুলিকে আর সেই সঙ্গে আপনার কাছে প্রেরিতব্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহিত্য ও শিল্প-সংক্রান্ত বইগুলিকে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে স্থান দেবেন। বইগুলি আপনার প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ জাগিয়েছে জানতে পারলে আনন্দিত হব, আপনার আকাঙ্ক্ষিত বইয়ের তালিকা যদি পাই তাহলে তা আনন্দের সঙ্গেই সম্পূর্ণ রূপে পাঠাব।

বিশ্বভারতীর জন্য আমরা কিছু বৈজ্ঞানিক আর টেকনিক্যাল বই সংগ্রহ করেছিলাম, কিন্তু আমাদের কতিপয় ভারতীয় বন্ধু জানিয়েছেন যে এগুলির বিষয়বস্তু আপনার প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য-সূচির উপযুক্ত নয়। যে বইগুলি পাঠাচ্ছি সে বিষয়ে আপনি কী ভাবেন তা জানতে পারলে খুবই ভাল হয়।

আমাদের উভয়ের বন্ধু সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন যে আপনি তাঁর কাছে একটি চিঠিতে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অধ্যাপক বিনিময়ের উল্লেখ করেছেন। আমাদের দুটি দেশের সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতার প্রথম কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে আপনার এই উক্তিটিকে আমরা অন্তরের সঙ্গে অভিনন্দন জানাই। প্রত্যক্ষভাবে এটাকে কী করে কার্যকরী করার কথা আপনি ভাবছেন তা আপনার কাছ থেকে জানতে পারলে বাধিত হব।

আশা করি আপনি শারীরিক কুশলে আছেন, নববর্ষ উপলক্ষে শুভকামনা জানাই।

আন্তরিক অভিনন্দন সহ, সভাপতি

বই বইয়ের ঠিকানা

মস্কোয় রবীন্দ্রনাথের থাকাকালের কার্যসূচী

১১ই সেপ্টেম্বর। রবীন্দ্রনাথ মস্কো পেঁছিন। তাঁর সংগে ছিলেন : তাঁর নাতি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেক্রেটারী ই. আরিয়াম এবং অমিয় চক্রবর্তী, চিকিৎসক হ্যারি টিম্বার্স এবং বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইনের কন্যা মার্গারিটা আইনস্টাইন। বেলোরুশ-বল্টিক রেলস্টেশনে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান ভক্‌স ও রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েত লেখকদের যুক্ত সংঘের প্রতিনিধিরা।

রবীন্দ্রনাথ মস্কোর গ্র্যান্ড হোটেলে ওঠেন।

১২ই সেপ্টেম্বর। দিনের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেক্রেটারীদের নিয়ে ভক্‌সের সভাপতি অধ্যাপক ফ. ন. পেত্রভের কাছে যান ও তাঁর সংগে আলাপ করেন।

সন্ধ্যাবেলা রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েত লেখকদের যুক্ত সংঘের ক্লাবে মস্কোর লেখক, সাহিত্যবিদ এবং রাজধানীর বিজ্ঞান-শিক্ষাকর্মীদের প্রতিনিধিদলের সংগে রবীন্দ্রনাথের আলাপ হয়। সে আলাপে কবি নিকলাই আসেয়েভ, ভেরা ইনবের, লেখক ফ. গ্লাদকভ, ন. ওগনেভ প্রমুখ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তৃতা দেন ভক্‌সের সভাপতি অধ্যাপক ফ. ন. পেত্রভ, লেখক ন. স্মিরিয়ার, ২য় রাষ্ট্রীয় মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আ. প. পিনকেভিচ, ললিতকলার রাষ্ট্রীয় আকাদমীর সভাপতি অধ্যাপক প. স. কগান। তাঁর জবাবে রবীন্দ্রনাথও বক্তৃতা দেন। সভার শেষাংশে ছিল জলসা। তাতে যোগ দেন বলশই থিয়েটারের শিল্পীরা, প্রাচ্যের গান ও নাচের দল—তাঁরা দাগেস্তানের লোকসংগীত ও লোকনৃত্য পরিবেশন করেন।

১৩ই সেপ্টেম্বর। ভক্‌সের সভাপতি অধ্যাপক ফ. ন. পেত্রভ রবীন্দ্রনাথের কাছে যান। তাঁদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়।

দিনের বেলা রবীন্দ্রনাথ ছাত্র ও অধ্যাপকদের প্রতিনিধিদের সংগে দেখা করেন।

সেদিনই তিনি রাষ্ট্রীয় ত্রেতিয়াকভ গ্যালারীর ডিরেক্টর ম. প. ক্রিস্তি, কলাবিদ অধ্যাপক আ. আ. সিদোরভ (চারুকলার মিউজিয়ম), বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিনিধি, নারকমপ্রস'এর (লোকশিক্ষা দপ্তর) মিউজিয়ম সংক্রান্ত বিভাগের অধ্যক্ষ আ. আ. ভালতের, ভক্‌সের প্রদর্শনী বিভাগের অধ্যক্ষ ইয়েশুকভের সংগে দেখা করেন। তাঁদের তিনি তাঁর আঁকা ছবি আর স্কেচ দেখান। রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করা সাব্যস্ত হয়।

সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ২য় মস্কো আর্ট থিয়েটারে 'প্রথম পিটার' নাটকটি দেখেন। নাটক আরম্ভের আগে রবীন্দ্রনাথের সংগে থিয়েটারের পরিচালক ব. গ. আলেক্সান্দ্রভ ও অভিনেতাবৃন্দ—স. ভ. গিয়াৎসিনতোভা, স. গ. বির্মান এবং ব. আ. পদগর্ণির আলাপ হয়। নাটকের পর রবীন্দ্রনাথ থিয়েটারে বিশিষ্ট অতিথিদের খাতায় কিছু লেখেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেক্রেটারীদের নিয়ে আ. এ. কির্গিনার নামাঙ্কিত প্রথম পাইওনিয়র কমিউনে যান। সেখানে তিনি সারা সন্ধ্যা কাটান এবং বিশিষ্ট অতিথিদের খাতায় কিছু লেখেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর। রবীন্দ্রনাথের সংগে সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র দপ্তরের গণকমিসারের সহকারী ল. ম. কারাখানের আলাপ হয়।

সন্ধ্যায় চলচ্চিত্রকর্মীদের সংঘ রবীন্দ্রনাথের সংগে চলচ্চিত্রকর্মীদের আলাপের ব্যবস্থা করে। কবিকে 'ব্যাটেলশিপ পতেমকিন' আর 'পুরাতন ও নতুন' ছবি দুটির অংশবিশেষ দেখান হয়। দুটি ছবিই বিখ্যাত সোভিয়েত চলচ্চিত্রকার স. ম. আইজেনস্টাইনের তোলা। দুটি ছবিই রবীন্দ্রনাথের খুবই ভাল লাগে।

তারপর রবীন্দ্রনাথ ও সোভিয়েত চলচ্চিত্রকর্মীদের মধ্যে আলোচনা হয়। তাতে রবীন্দ্রনাথ রচিত সিনারিও নিয়ে চলচ্চিত্র তোলার কথাও ওঠে। উপস্থিত সকলে তাঁর রচিত সিনারিওতে অত্যন্ত আগ্রহ অনুভব করেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর। বেলা তিনটেয় রবীন্দ্রনাথ কেন্দ্রীয় কৃষিভবনে যান। ভবনে যে পৃথক ও যৌথখামার চাষীরা বাস করছিলেন তাঁদের সংগে আলাপ করেন। এই আলাপে প্রায় দেড়শ লোক যোগ দেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর (আনুমানিক তারিখ)। রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত সোভিয়েত শিক্ষাবিদ স. ত. শাৎস্কির সংগে দেখা করেন। শাৎস্কি শিশুদের শ্রমশিক্ষাদানের আদর্শ কিন্ডারগার্টেন ও ইস্কুল ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা।

১৭ই সেপ্টেম্বর। বেলা তিনটেয় নতুন পশ্চিমী শিল্পকলার মিউজিয়মে রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। প্রথম ভাষণ দেন ভক্‌সের সভাপতি অধ্যাপক ফ. ন. পেত্রভ। লোকশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেন অধ্যাপক ব. ইয়ে. ইয়োভিনগোফ। রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে বলেন অধ্যাপক আ. আ. সিদোরভ।

সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ মস্কো আর্ট থিয়েটারে লেভ তলস্তয়ের 'রেজারেকশন' উপন্যাস অবলম্বনে মঞ্চস্থ নাটকটি দেখেন। সেখানে অন্যতম প্রবীণা অভিনেত্রী ও চেখভের পত্নী ও. ল. ক্নিপ্পের-চেখভার সংগে রবীন্দ্রনাথের আলাপ হয়।

১৮ই সেপ্টেম্বর। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর নাতি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সেক্রেটারী পররাষ্ট্র দপ্তরের গণকমিসারের সহকারী ল. ম. কারাখানের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হন।

১৯শে সেপ্টেম্বর। রবীন্দ্রনাথ মস্কোর কাছেই ল. ম. কারাখানের বাড়িতে সারাদিন কাটান।

বই বইয়ের ঠিকানা

২০শে সেপ্টেম্বর। রবীন্দ্রনাথ ল. ম. কারাখানের বাড়ি থেকে ফিরে মস্কোর একদল প্রাচ্যতত্ত্ববিদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক ল. স. ভেল্‌ত্‌মান, ব. শোর, আরো অনেকে।

সন্ধ্যায় বলশই থিয়েটারে 'বায়াদেরকা' ব্যালে দেখেন এবং থিয়েটারের পরিচালক ইয়ে. ক. মালিনোভস্কায়ার সঙ্গে আলাপ করেন।

২১শে সেপ্টেম্বর। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন সুরকার অ. অ. বর্খমান যিনি রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় সুর সংযোজন করেছেন। সুরকার কবিকে রবীন্দ্রনাথের কথায় তাঁর সুর দেওয়া সংগীতের স্বরলিপি উপহার দেন।

২২শে সেপ্টেম্বর। সকালে বিখ্যাত সোভিয়েত চিকিৎসক অধ্যাপক ভ. ভ. জেলেনিন রবীন্দ্রনাথের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে দেখেন। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বেশি পরিশ্রম করছেন। চিকিৎসক কবিকে বেশিক্ষণ খোলা হাওয়ায় থাকার পরামর্শ দেন। দিনের বেলা রবীন্দ্রনাথ মস্কো শহর ঘুরে দেখেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জিপসী পত্রিকা 'নেভো দ্রম'এর (নতুন পথ) সহকারী সম্পাদক ও অন্যান্য কর্মীরা সাক্ষাৎ করেন। রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহ কৌতূহলের সঙ্গে জিপসীদের ভাষা, সংস্কৃতি ও তাঁদের উদ্ভবের বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন।

২৪শে সেপ্টেম্বর। সন্ধ্যা ৭টায় কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ভবনের কলম্‌স হলে রবীন্দ্রনাথের সম্মানে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা দেন ভক্‌সের সভাপতি ফ. ন. পেত্রভ। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতা পড়েন কবি প. শেংগেলি। প্রবল হাততালির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে কিছু বলেন। সান্ধ্যানুষ্ঠানের শেষে জলসা হয়। এই জলসায় সোভিয়েত সুরকারদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বনে সংগীত পরিবেশন করা হয়। এই জলসায় অংশগ্রহণ করেন বলশই থিয়েটারের একক গায়ক ই. স. কজলোভস্কি, বলশই থিয়েটারের একক নৃত্যশিল্পী ও নাচের দল। পিয়াৎনিৎস্কি নামের দলটি লোকসংগীত পরিবেশন করে। রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতা 'নববর্ষা' আর 'প্রণয় প্রশ্ন' বাংলা ভাষায় আবৃত্তি করেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কবি প. শেংগেলি। তাঁরা ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ 'সয়ুজকিনোর' চলচ্চিত্র কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন। চলচ্চিত্রের জন্য তাঁর সিনারিওর বিষয়ে আরও কথাবার্তা বলেন।

রবীন্দ্রনাথ 'ইজ্‌ভেস্তিয়া' পত্রিকার সংবাদদাতার সঙ্গে আলাপে সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধে তাঁর মত প্রকাশ করেন।

রাত ৯টা ১৫ মিনিটে রবীন্দ্রনাথ মস্কো ত্যাগ করেন। বিদায় জানানোর জন্য সমবেত হন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এবং ভক্‌সের সভাপতি অধ্যাপক ফ. ন. পেত্রভ।

রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েত লেখকদের সংযুক্ত ফেডারেশনের রবীন্দ্র-সংবর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার স্টেনো-রিপোর্ট

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

আপনাদের দেশে ও আজকের এই সান্ধ্যানুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনারা আমার যে সম্মান দিলেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। এই অনুষ্ঠানে সাহিত্য এবং অন্যান্য অমর সৃষ্টিকর্মে রত মহা মনীষীদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ আমার হল।

দুর্ভাগ্যক্রমে আপনাদের ভাষা আমার অজানা, আর যে ভাষায় আমি এখন বলছি সে ভাষা আপনাদেরও নয় আমারও নয়। তাই আমি সংক্ষেপেই শেষ করব, দীর্ঘ ভাষণে আপনাদের উৎপীড়িত করব না। আমি এসেছি শিখতে, জানতে, কেমন করে আপনারা নিজেদের মতো করে এক বিরাট সমস্যা, লোক-শিক্ষার বিশ্বসমস্যার সমাধান করেছেন।

আজ আমরা দেখছি, সভ্যতা মানুষকে তার স্বাভাবিক মানবপ্রকৃতি থেকে অনেক দূরে টেনে নিয়ে গেছে। এই সভ্যতা যে কৃত্রিম জীবন গড়ে তুলেছে, তা থেকে জন্ম নিচ্ছে যতকিছু পীড়া, তজ্জনিত দুর্ভোগ আর দাস বুদ্ধি। আমি জানিনে, সভ্যতাকে এই রোগমুক্ত করতে গিয়ে আপনারা আরেক চরম সীমায় গিয়ে পড়েছেন কিনা, মানবপ্রকৃতির ওপরেই জবরদস্তি করছেন কিনা সে বিষয়ে আমি এখনো নিশ্চিত নই। আজকে কারো পক্ষে আপনাদের বিচার করা সম্ভব নয়। ইতিহাস তার সত্য প্রমাণে দীর্ঘ সময় নেয়। আপনাদের পথ ও লক্ষ্যের সমালোচনা আমি করতে চাইনে। একটি জিনিস আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে, আপনারা সবার প্রতি শিক্ষার অমূল্য অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। এর ফলে মানবমনে যত অবরুদ্ধ ঐশ্বর্য আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাচ্ছে, আর এটা এতই বড়ো জিনিস যে তাতে গর্ববোধ করার আপনারা অধিকারী।

ব্যক্তিগতভাবে আমিও আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজের মতো করে কাজ করে চলেছি, শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মত হল তাকে জীবনের সঙ্গে যোগ রাখতে হবে ; তাকে জীবনের অংশ হতে হবে। যথার্থ শিক্ষা লাভ করা যায় যথার্থ জীবনধারণের ফলেই, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয় যা সভ্য জগতের ইস্কুল কলেজে প্রায়ই ঘটে—সে যেন এক খাঁচা, তার ভিতরে শিশুদের যত কৃত্রিম পথ্য যোগান হয়। যথার্থ জীবনের মধ্যে দিয়েই আমরা প্রকৃত শিক্ষা পেতে পারি।

এই ধারণাটাকে আমি আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। এখানে এসে দেখছি আপনাদের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে আমার আদর্শের খুবই মিল

বই বইয়ের ঠিকানা

রয়েছে ; দেখছি মানুষ এখানে জীবনের পূর্ণতায় বেঁচে আছে, তার মধ্যে দিয়ে তাদের মন শুধু বিচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক ডাটা বা তথ্য নয়, শিক্ষার পূর্ণতাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে উঠছে।

তাদের বুদ্ধিকে আপনারা উদ্বুদ্ধ করছেন সৃষ্টির কাজে, যা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধন। এর জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ আমারও স্বপ্ন তাই। কিন্তু একার পক্ষে আমার প্রতিষ্ঠানে এই আদর্শকে যথোপযুক্তভাবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি। আপনাদের দেশে আপনারা তাকে যথার্থ রূপ দিতে পেরেছেন, প্রয়োজনীয় গতিবেগ ও উৎসাহ দিয়ে তাকে বাস্তবে পরিণত করেছেন। আমার ধারণা, মানবজাতির প্রতি আপনাদের দেশের এটি একটি অক্ষয় উপহার—লোকশিক্ষার এই আদর্শ।

কেবল কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যেই এই স্বল্প কয়টি কথা। আপনাদের নানা প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষাকর্ম চলেছে তার কিছু ভাল করে দেখার অপেক্ষায় রয়েছি। দুঃখের কথা আমার হাতে সময় খুবই কম। আরেকটি কথাও আমি ভুলতে পারিনে, প্রতিদিনই সে বিষয়ে আমায় সচেতন হতে হয়—যৌবনকে অনেক আগেই বিদায় দিয়েছি, এই কাজ করার মতো বল আমার আর নেই, এতে বিপুল উদ্যোগ ও মনের সজীবতার প্রয়োজন। তবু আমার বিশ্বাস এমন কিছু দেখে যাব যার স্মৃতি আমি আমার দেশে নিয়ে যেতে পারব, আমার কাজে যা সহায় হবে। আপনারা আমায় এটুকু অর্জনের সুযোগ দিয়েছেন বলে আপনাদের অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

লেখকদের রবীন্দ্র-সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতা করছেন অধ্যাপক প. স. কগান

সোভিয়েত চলচ্চিত্র কর্মীদের সঙ্গে আলাপরত রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভক্‌সের সভাপতি ফিওদর নিকোলায়েভিচ পেত্রভের আলাপের স্টেনো-রিপোর্ট

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন যা বলবেন তা সবই প্রকাশিত হবে কিনা।

পেত্রভ : কেবল অনুমতি পেলেই।

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে সামান্য কারণেও তাঁকে অসুবিধায় পড়তে হতে পারে, তাঁর প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও তা ভাল হবে না।

পেত্রভ : ব্যক্তিগতভাবে আপনার আর আপনার প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হতে পারে এমন কোন কিছুই আমরা করব না। আমাদের কাছেও আপনার কাজের এতই মূল্য যে তার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তা সবই আমরা করব। আপনার অনুমতি ছাড়া কিছুই প্রকাশ করা হবে না।

রবীন্দ্রনাথ : আজকের দিনে একটা কথা মনে রাখতে হবে। ভারতবর্ষ

বই বইয়ের ঠিকানা

এখন বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে চলেছে। সেখানে গভর্নমেণ্ট আর জনগণের মধ্যে চলেছে সংগ্রাম। এই পরিবেশে সন্দিগ্ধ গভর্নমেণ্ট অতি সতর্ক। অত্যন্ত নির্দোষ ঘটনা, যার সঙ্গে রাজনীতির কোনই যোগ নেই, তাও প্রচার বলে ধরা হয়, মনে হয় বুঝি লুকিয়ে চুরিয়ে বিপ্লবের সহায়তা করা হচ্ছে। আমাদের এই অবস্থায় কোনরকম বিপদের ঝুঁকি নেওয়া চলে না। আমেরিকা আর ইংলণ্ডের অবস্থা একেবারেই অন্য : তারা স্বতন্ত্র, তারা স্বাধীন। ভারতবর্ষ এখন এমন পরিবেশে রয়েছে যে আমরা যদি এমন কিছু করি যার সঙ্গে আপনাদের দেশের স্বল্পতম সম্পর্কও আছে তবে তার অর্থ অত্যন্ত বিকৃত করা হবে। ওরা বলবে, এ হল বিপ্লবের ভাবধারা, প্রচারের কাজ চালানর আড়াল মাত্র, মুখোশ। আপনারা তো জানেনই আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এই সন্দেহ যাঁদের উপর পড়েছে ইংরেজ গভর্নমেণ্টের হাতে তাঁদের কী সইতে হয়েছে। তাঁরা জেলখানায় বন্দী হয়ে রয়েছেন।

আমার এদেশে আসাটা আমার পক্ষে খুবই সাহসের কাজ। কিন্তু এপথে বেশিদূর যাওয়াটা উচিত হবে না। আমার জীবনের একটিমাত্র লক্ষ্য হল—শিক্ষার আলোক বিস্তার। আমি পোলিটিশিয়ান নই। আমি বিশ্বাস করি, সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটলে, জনগণের মনে চেতনার বিকাশ ঘটলে, আজকের অনেক দুঃখকষ্টই আপনা থেকে দূর হবে। অজ্ঞতা আজ দুর্ভিক্ষের সঙ্গে দেশবাসীর লড়াইয়ে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, অজ্ঞতাই নিজের শক্তিতে তার বিশ্বাস হরণ করছে। শিক্ষা তাকে নতুন শক্তি দেবে। দেবে নতুন শিক্ষা, বিকাশ ঘটাবে

রবীন্দ্রনাথ ও ভকসের সভাপতি ড. ন পেত্রভের মধ্যে আলোচনা

মনের স্বাধীনতার। আর সবকিছু থেকেই আমি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। সব বাদ দিয়ে এই কর্তব্যই আমি গ্রহণ করেছি। আমার প্রতিষ্ঠানকে আমি সতর্কতার সঙ্গেই এ রকমের সব আন্দোলন থেকে মুক্ত রাখি। আমাদের চাষী সাধারণকে অজ্ঞতার হাত থেকে মুক্তি দেওয়া—এই হল আমার মূল লক্ষ্য।

আমি নিজে মনে করি, আমাদের মঙ্গল ঘটবে আমাদেরই হাতে, আমাদেরই সচেতনতার ফলে, বাইরের প্রভাবে নয়। আমার জীবনের মূল লক্ষ্য হল—প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার। শুধু মনীষা নয়, ব্যক্তিত্বের সর্বতোমুখী বিকাশ, মানুষের সক্রিয়তার বিকাশ। সেই কারণেই আমি সারা জীবন একটি নির্দিষ্ট পথে চলেছি। গভর্নমেণ্টের সঙ্গে বিরোধহীন সহযোগিতার দিকে গিয়েছি, যতটুকু সাহায্য তা দিতে পেরেছে নিয়েছি। জোর দিয়েই জানাই, আমার লক্ষ্য হল—সাধারণ জনের শিক্ষার কাজ যেন ব্যাহত না হয়, তাদের মানসিক শক্তির মুক্তিসাধনে যেন বাধা না পড়ে। আমি বিশ্বাস করি, এই লক্ষ্য অর্জিত হলেই তারা মুক্তি ও অন্যান্য সবকিছু কল্যাণ লাভ করবে।

পেত্রভ : (আপনার) প্রতিষ্ঠান আর আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যোগস্থাপনের প্রস্তাব আমি যখন জানাই তখন মানুষের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলার সাধারণ শিক্ষাকার্যে পারস্পরিক সহায়তা ও তথ্য বিনিময়ের কথা আমি বলতে চেয়েছি। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের লক্ষ্য সাধনের উপায়, মূল আদর্শ সম্পূর্ণই এক। আমি তাই অনুভব করি। মানব ব্যক্তিত্বের বিকাশের পরিবেশ ও অর্থনীতিক অবস্থার সমস্যা সমাধানে পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা একসঙ্গেই সব শিক্ষাদর্শের শেষ লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছি—তা হল ব্যক্তির সুষম দৈহিক ও মানসিক বিকাশ। এই কাজে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রদ অনেক কিছুই পেতে পারি। ভারতবর্ষের অবস্থা যদি এমনই হয় যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপনার প্রতিষ্ঠানের যোগসাধন এখন অনুচিত, তাহলে আমরা দুঃখের সঙ্গে অন্য ব্যবস্থা, অন্য অনুকূল পরিবেশের অপেক্ষায় থাকব, যখন আপনার প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আমাদের সংঘের সঙ্গে স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হবে। আমাদের সমিতি নানা বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপনের কাজে এমন কিছুতেই হাত দেয় না যা অন্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলির পক্ষে করা সম্ভব। আমাদের সংগঠন সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক। কিন্তু যদি আমাদের সমিতির সঙ্গে এই জাতের সম্পর্ককেও সন্দিগ্ধ গভর্নমেণ্ট কমিউনিজম প্রচারের উদ্দেশ্যে গঠিত বলে মনে করে, তবে অবশ্যই আপাতত রীতিমত সম্পর্ক স্থাপন মুলতুবি রাখা ভাল। বেশ বুঝতে পারি আপনার আমাদের দেশে আসার সব রকম, এমন কি অন্যায় ব্যাখ্যা হতে পারে। এই গভীর সাংস্কৃতিক তাৎপর্যপূর্ণ সফর, আমাদের পক্ষে যা অত্যন্ত আনন্দের, যদি রবীন্দ্রনাথ আর যে সাংস্কৃতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিনি পরিচালক ও যার সঙ্গে তিনি যুক্ত তার পক্ষে কোন অপ্রীতিকর কিছুর কারণ হয়, তাহলে আমি নিজে অত্যন্ত দুঃখ পাব। মনে হয়, যে দেশে সবরকম স্বাধীন চিন্তা অবদমিত

বই বইয়ের ঠিকানা

সেখানে, যিনি নিজের মতো করে ভাবতে চান, দেখতে চান, প্রচলিত বাঁধা বুলি মেনে নেন না, তাঁকে দোষী করার কারণ ঠিক খুঁজে বের করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ : আপনাদের কর্মসূচী আমার জানা নেই। কিন্তু আমাদের শ্রমজীবীদের জন্য একটি কাজ করতে পারেন—আপনাদের সাফল্যের কথা, যে সাধারণজন সব দেশেই পীড়িত পরিত্যক্ত আপনাদের দেশে তাদের মঙ্গল কী করা হয়েছে—অনেক কিছুই হয়েছে—সে কথা আমাদের ভাষায় লেখা। আপনাদের শিক্ষাবিকাশের ব্যাপক তথ্যের বিস্তার আমাদের শ্রমজীবীদের পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক হবে।

পেত্রভ : এই প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখব কিন্তু এ জাতীয় রচনা প্রকাশে কতদূর সফল হব জানি না। আমাদের পত্রিকায় শিক্ষা ও শিক্ষা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভাগ আছে,কিন্তু সে পত্রিকা কেবল ইংরেজী, ফরাসী আর জার্মান ভাষায় বেরোয়। আমার বিশ্বাস, এ ক্ষেত্রে বাংলার কথাই বলতে চান। বাংলায় তা প্রকাশ আমাদের পক্ষে অবশ্যই খুব কঠিন। কিন্তু আমাদের ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা যদি কারো উপকারে লাগে তাহলে যে ঠিকানা দেওয়া হবে সেখানেই আমরা তা সাগ্রহে পাঠিয়ে দেব।

রবীন্দ্রনাথ : আমেরিকায় সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষার বিকাশ সম্বন্ধে একটি বই পড়ি—একজন আমেরিকান মহিলার লেখা। এই বইটিতেই প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয় পাই। বইটি আমার মনে গভীর ছাপ ফেলে। তারপর থেকেই আপনাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছি। এই বইটি আমায় অনুপ্রাণিত করে। দেখতে পাই, আপনাদের দেশে যা করা হচ্ছে তার সংগে আমার জীবনের স্বপ্নের অনেক মিল রয়েছে। হয়ত আরো অনেক বই আছে, তাতে আপনাদের গঠন কাজের নানা দিকের কথা বলা হয়েছে—অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষার বিকাশ। সে সব বই পেতে আমি খুবই উৎসুক, যদি পাওয়া যায় তাহলে খুবই কৃতজ্ঞ থাকব। আপনাদের যদি সে জাতীয় বই না থাকে তাহলে ইওরোপ আমেরিকায় তাদের খোঁজ করব। এ সব বই পাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সবসময় যেমন ঘটে, তারা কিছুতেই আমার কাছে ধরা দেয় নি ; সোভিয়েত প্রিন্সিপ্‌ল সম্বন্ধে কিছু নিশ্চয়ই কোথাও আছে, সেই কারণেই তারা ভারতে পৌঁছয় না। আপনাদের ইংরেজী বইপত্র আমার পক্ষে খুবই কৌতূহলকর হবে। এখানে এসে আমি যা কিছু দেখেছি শুনেছি, অনুভব করেছি সে বিষয়ে একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা তবে হবে। ভারতীয় জনসাধারণকে আপনাদের সাফল্যের কথা জানানর জন্য আমি কিছু করতে চাই।

পেত্রভ : প্রয়োজনীয় বইপত্র সংগ্রহ করতে পারব বলেই আশা করি। যেমন ইংরেজীতে USSR in Construction, আমাদের পত্রিকার পুরো সেট, অধ্যাপক পিনকেভিচের ইংরেজী লেখাও আছে, তারপর নারকমপ্রসেও (লোকশিক্ষা দপ্তর) কিছু ইংরেজী বই আছে। সোভিয়েত গঠনকার্য, অর্থনীতি,

সমাজবিদ্যা আর অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক বইপত্র আছে। সম্ভব মতো সব সংগ্রহ করার চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথ : নানারকম পুতুল আর অন্যান্য হাতের কাজ যা ছোটদেরই করা আমি নিয়ে যেতে চাই।

পেত্রভ : আমাদের খেলার মিউজিয়ম আছে। সেখানে এমন সব খেলনা আছে যার থেকে ছোটদের পক্ষে জীবনের নানা মুহূর্তে, জীবনের ধরন ও টেকনিকের পরিচয় গ্রহণ সম্ভব হয়। সেই সংগে ছোটদের করা খেলনাও আছে। এই মিউজিয়মে খেলার সময় নানা আলোক ও রঙের উত্তেজনায় ছোটদের মনে কী রকমের প্রতিক্রিয়া তা নিয়ে গবেষণা করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ : আপনাদের কাছে যদি ভাস্কর্য, চিত্রশিল্পের পরিচয়সূচক কিছু থাকে, আমি তা সাগ্রহে সংগে করে নিয়ে যাব আর তার জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব।

পেত্রভ : এসবই আমরা সংগ্রহ করব। সেই সংগে ফোটো যাতে শিক্ষা-ব্যবস্থার নানা সময়ের ছবি পাওয়া যাবে, বইপত্র, চিত্র, আর ছোটদের সৃষ্টির সংগ্রহ, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচয়সূচক নানা সংগ্রহ।

আমার আরেকটি প্রশ্ন আছে। শুনলাম আপনি একটি বক্তৃতা দিতে ইচ্ছুক। তার ব্যবস্থা করার জন্য কী বিষয়ে বলবেন, বক্তৃতার মর্মগ্রহণে সক্ষম কী রকমের শ্রোতা হলে ভাল হয়, আর কখন তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে—তা জানতে উৎসুক।

রবীন্দ্রনাথ : বক্তৃতা আমার ভাল লাগে না। আমি ভাবছিলাম অল্প সময়ের মধ্যে নিজের কিছু রচনা পড়ব। আপনাদের ভাষা তো আমি জানি নে, তাই বক্তৃতা দিতে হলে তার অনুবাদ প্রয়োজন। তাতে মনোনিবেশের উপর খুবই ভার চাপান হবে, আর অনুবাদও কখনোই যথেষ্ট ভাল হয় না। তাই আমি বক্তৃতা দিতে চাইনে। তবে লোকে আমায় দেখতে চান, আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চান বলে নিজের লেখা কিছু পড়তে চাই।

পেত্রভ : সে তো চমৎকার হবে। তারিখটা ঠিক করা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ : সে আপনারা যেমন চান। আমার কিছু লেখা রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। খুব ভাল হয় যদি আবৃত্তি করতে পারেন এমন কাউকে দিয়ে কিছু অনুবাদ পড়ান যায়, আমি বাংলায় আর ইংরেজী জানেন যাঁরা তাঁদের জন্য ইংরেজীতে পড়ব।

পেত্রভ : আমার মতে আপনার রচনা রুশ আর বাংলাতে পড়াটাই যথেষ্ট। তৃতীয় ইংরেজী ভাষাটা হবে বর্জিত, কারণ তাতে ছন্দ পাওয়া যাবে না আর ইংরেজীনবীসের সংখ্যাও কম—তাছাড়া তাঁরাও তো রুশ জানেন।

রবীন্দ্রনাথ : আমি ৩০—৪০ মিনিট পড়ব, তাই বাকি সময় অন্য কিছু দিয়ে ভরিয়ে দিলে ভাল হবে—আবৃত্তি বা সংগীত।

পেত্রভ : সেই ব্যবস্থাই করব।

বই বইয়ের ঠিকানা

মস্কোর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপের স্টেনো-রিপোর্ট*

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

রবীন্দ্রনাথ : আপনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ দিয়েছেন, তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

আপনাদের সঙ্গে ঠিক কী ভাবে আলাপ করব জানিনে। অনুবাদের মাধ্যমে বেশি কিছু বলা যায় না—অনুবাদ ক্রিয়ায় অনেক কিছু হারিয়ে যায়। তাই প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে কথা বলার উৎসাহ বোধ করছিনে। সেই কারণেই আপনাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা আমার পক্ষে কঠিন, আপনাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, যে সমাজে আপনারা কাজ করছেন, জীবনধারণ করছেন তার বিষয়ে আপনাদের এখনো কোন অভিযোগ আছে কিনা তা জানা দুষ্কর। কিন্তু এসব হল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, অনুবাদের সাহায্যে তার জবাব মেলা সম্ভব নয়।

তাই আমি বরঞ্চ আপনাদেরই কয়েকটি সহজ সরল প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকব যার উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব। আমার কাজ বা ভারতবর্ষ সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ে আপনারা যদি কোন কৌতূহল অনুভব করেন তাহলে আমি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

মারিয়া স্টেইনহাউস : আপনাকে প্রশ্ন করার আগে আমি মস্কোর বৈজ্ঞানিক কর্মীদের তরফ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলতে চাই, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আপনার সর্বজনবিদিত নাম আমাদের দেশেও পরিচিত, আমরা জেনেছি আপনি আমাদের ইস্কুল আর শিক্ষা-ব্যবস্থার কাজে কৌতূহলী। আমাদের কমরেডরা আপনাকে সানন্দে আমাদের কাজের পরিচয় দেবেন।

শুনেছি গতকাল আপনি ভারতবর্ষে আপনার শিক্ষামূলক কাজের কথা বলেছেন। আপনার ইস্কুলে জীবনের সঙ্গে পাঠের মিল কী ভাবে ঘটান হয়েছে, পরিপার্শ্বের সবার সঙ্গে কী ভাবে আপনি কাজ করেন তা বললে ভালো হয়।

রবীন্দ্রনাথ : জবাব দিচ্ছি কিন্তু আমি অল্প করে বলে যাব, আমার বন্ধু তা অনুবাদ করবেন, কারণ একসঙ্গে অনেকটা বলে গেলে ওঁর মনে না-ও থাকতে পারে আর আপনাদের কাছেও কী বলছি তা বোঝার আগে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করাটা ক্লান্তিকর ঠেকবে। তাই অল্প অল্প করে বলব।

আপনাদের একটি কথা জানা উচিত—আমি স্বভাবতই কবি। সেই ছোটো-বেলা থেকেই আমার একমাত্র কাজ ছিল আমার ভাবকে পদ্যে প্রকাশ করা,

আমার স্বপ্নকে কবিতায় রূপ দেওয়া। এটাই যে আমার প্রকৃত কাজ তাতে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। ভাব প্রকাশের ক্ষমতা যে আমার আছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

আপনারা তাই জিজ্ঞেস করতে পারেন—আমার প্রকৃতি যে কাজের অনুপযুক্ত সে কাজ আমায় নিতে হল কেন?

ছোটবেলায় আর পাঁচজনের মতো আমাকেও ইস্কুলে পাঠান হয়। ইস্কুলে ছাত্রজীবনের সূচনায় কী দুর্বিপাক ঘটেছিল তা হয়ত আপনারা কেউ কেউ আমার জীবন-স্মৃতির অনুবাদ পড়ে জেনেছেন। সে এক অত্যন্ত শোচনীয় জীবন, আমার পক্ষে তা একেবারে অসহনীয়। কেন যে পীড়া বোধ করছি তার কারণ বিশ্লেষণের ক্ষমতা সে সময় আমার ছিল না। যখন বড় হলুম তখন পরিষ্কার বুঝতে পারলুম বাবা মা আমায় যে ইস্কুলে পাঠিয়েছিলেন সেখানে বাধ্য হয়ে ক্লাসে বসে থাকতে অত্যন্ত মর্মান্তিক কষ্ট কেন পেতেম।

স্বভাবতই আমি ভালবাসি জীবনকে, ভালবাসি প্রকৃতি আর যেখানে আমার আপনজনেরা রয়েছেন সেই পরিবেশটিকে। এই যে স্বাভাবিক পরিবেশটির সঙ্গে আমার অন্তরের নিবিড় যোগ সেখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমায় পাঠান হল নির্বাসনে—ইস্কুলের ক্লাস ঘরে, সেখানকার সাদা ন্যাড়া দেয়ালগুলোর মরা চাউনি প্রতিদিন আমায় ভয় দেখাত। আমার মনে হয় ঐ দেয়ালগুলোর মাঝখানে গিয়ে পড়াটা স্বাভাবিক নয়। এ হল জীবন থেকে ছিঁড়ে নেওয়া একটা টুকরো। এই কারণেই অত্যন্ত কষ্ট পেতেম। কারণ আমায় নিজের জগৎ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেখানে পাঠানো হত সে এক মৃত, অকরুণ সংগতিহীন অসহ্য একঘেয়ে পরিবেশ।

এই নিষ্প্রাণ ছকবাঁধা পরিবেশে কোন শিশুমন কখনো কিছু গ্রহণ করতে পারে না। আর শিক্ষকরা সজীব গ্রামোফোনের মতো প্রতিদিন একই পড়া অত্যন্ত নীরসভাবে আওড়ে যেতেন। আমার মন আমার শিক্ষকের কাছ থেকে কোন কিছুই নিতে চাইত না। আমার সামনে যা কিছু ধরা হত সে সবই আমি গভীর বিতৃষ্ণার সঙ্গে ফিরিয়ে দিতেম। কোন কোন শিক্ষক আবার একেবারেই সহানুভূতিহীন। তাঁরা ছোট ছেলের সংবেদনশীল মনটি মোটেই বুঝতেন না, নিজেদের অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে চাইতেন ছাত্রদেরই। এই সব নির্বোধ শিক্ষকেরা জানতেন না কী ভাবে পড়াতে হয়, কী করে শেখাতে হয় একটি সজীব মনকে। নিজেদের ব্যর্থতার জন্য তাঁরা ভুক্তভোগীদেরই শাস্তি দিতেন। ইস্কুল জীবনের বছরগুলিতে আমি এইভাবে কষ্ট পেয়েছি।

তের বছর বয়সে আমি ইস্কুল যাওয়া বন্ধ করি। বড়দের হাজার চাপ সত্ত্বেও আমি ইস্কুলে পড়তে যাই নি।

তারপর থেকে আমি নিজে নিজেই শিক্ষা লাভ করেছি, সে প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত রয়েছে। আমি যা কিছু শিখেছি সে সবই ক্লাসের বাইরে। অল্প বয়সেই ইস্কুলে মাস্টারের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি—এঘটনাকে আমি নিজের জীবনের একটি সৌভাগ্য বলে মনে করি। পরবর্তী জীবনে যা কিছু করেছি, যদি

বই বইয়ের ঠিকানা

কোন বিশেষ স্বকীয়তা দেখিয়ে থাকি তবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার কারণ হল, কোন শিষ্ট শিক্ষার জাঁতাকলে আমি পিষ্ট হই নি—সাধারণত সব ভাল ছেলে, ভাল ছাত্রকে যা মেনে নিতে হয়।

এই ভাবেই চলেছে। নামলেম নিজের কাজে। গঙ্গার কাছে এক নির্জন জায়গায় আশ্রম নিলেম, জীবনের একটি বড় অংশ কাটল বজরায়, কবিতা গল্প নাটক লিখে, স্বপ্ন দেখে।

ক্রমে ক্রমে দেশের লোকের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছি। তখন দেশের চারিদিক থেকে নানা জনের অনুরোধ আসতে লাগল লেখার জন্য, অন্য রকম সাহায্যের জন্য। আমি কিন্তু সেই নির্জনেই অধিকাংশ সময় কাটালেম। সাহিত্য চর্চায় জীবনের বিচ্ছিন্নতা থেকে বেরিয়ে মানুষের মধ্যে এসে তাঁদের জীবনের ভাগ নেওয়া, তাঁদের সহায়তা করার ডাক কী করে কোথা থেকে এল তা বলা মুশকিল।

আমাদের শিশুদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সাহসও আমার কী করে হল, সেও আমার কাছে একটা বিস্ময়, কারণ এবিষয়ে আমার কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু নিজের উপর বিশ্বাস ছিল। আমি জানতেম শিশুদের প্রতি গভীর দরদ আমার আছে, তাদের মনটাকে যে আমি জানি সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত ছিলেম। মনে হল, যমদূতী যে শিক্ষকেরা—তাঁদের প্রয়োজনীয় তালিম আছে—এই মোহয় ভুগতেন, তাঁদের চেয়ে শিশুদের আমি বেশি সাহায্য করতে পারব।

বেছে নিলেম একটি সুন্দর জায়গা। সহুরে জীবনের ছোঁয়া থেকে বহু দূরে কারণ আমি নিজে ছোটবেলায় মানুষ হয়েছিলেম ঐ সহরে, ভারতবর্ষের হৃদয় কলকাতায়, আর সারাক্ষণ মন কেমন করেছে কোন এক দূর দেশের জন্য যেখানে আমার হৃদয়, আমার মন প্রকৃত মুক্তি পেতে পারে। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা আমার ছিল না কিন্তু তবু সারাক্ষণ আমার মন চেয়েছে ঐ দেয়ালের বেষ্টনী, ঐ বিরাট বিপুল, পাষাণ হৃদয় বিমাতা কলকাতাকে ছেড়ে কোথাও চলে যেতে। আমি অনুভব করেছিলেম, মন প্রকৃতি মায়ের স্পর্শের জন্য তৃষিত, তাই এমন একটি জায়গা বেছে নিই আকাশ যেখানে অবাধে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এইখানেই মন নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে স্বপ্ন রচতে পারে, নানা ঋতু তাদের যত রং রস সৌন্দর্য ও আবেগ নিয়ে মানুষের সত্তার একেবারে অন্দরমহলে পৌঁছতে পারে।

সেইখানে কয়েকটি শিশুকে জুটিয়ে তাদের পড়াতে থাকি। আমি ছিলেম তাদের সঙ্গী। তাদের গান শুনিয়েছি। রচনা করেছি সঙ্গীত অপেরা, নাটক, সেই নাটকে তারা অভিনয় করেছে। আমাদের মহাকাব্যগুলি পড়ে শুনিয়েছি তাদের। এইভাবেই সুরু হয় এই ইস্কুল। তখন ছাত্র ছিল কেবল পাঁচ-ছটি।

কবির ওপর লোকের ভরসা ছিল না, শিশুদের মানুষ করে সনাতন

রীতিতে তাদের ঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়ার কাজে আমার দক্ষতায় সন্দেহ করার অধিকার তাঁদের ছিল বৈকি। তাই আরম্ভে খুব কম ছাত্রই পাই।

সব খুঁটিনাটির বর্ণনা নিয়ে দীর্ঘ ভাষণের কোন প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে, আমার আদর্শ ছিল এই—শিক্ষাকে জীবনের অঙ্গ হতে হবে, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এক নির্বস্তুক কিছুতে পরিণত হওয়া তার উচিত নয়। তাই শিশুদের আমার কাছে এনে তাদের সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ দিলেম। তাদের ইচ্ছামত সবকিছু করারই স্বাধীনতা ছিল। যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা তাদের দিয়েছিলেম। সব সময় চেষ্টা করেছি তাদের সব কাজে এমন কিছু তুলে ধরতে যা তাদের কাছে চিত্তাকর্ষক।

চেষ্টা করেছি তাদের মনে সবকিছু সম্বন্ধেই ঔৎসুক্য জাগাতে—প্রকৃতির সৌন্দর্যে, আশপাশের গ্রামে, অভিনয়ের মাধ্যমে সাহিত্যে, সংগীতে। প্রকৃতির রাজ্যের সবকিছু দিয়ে শুধু ক্লাসের পড়া দিয়ে নয়, পর্যবেক্ষণ ও সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে।

আমি যখন নাটক লিখতেম কতদূর লেখা হল, কীভাবে নাটকটা এগোচ্ছে, সে বিষয়ে গভীর ঔৎসুক্য জাগত তাদের। নাটকের মহড়ার সময় তারা বার বার নাটক পড়ত, তাই তারা ব্যাকরণ পাঠ আর ক্লাসের পড়ার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান পেত। এই ছিল আমার পদ্ধতি। শিশুদের মন আমি জানতেম। তাদের সচেতন মনের চেয়ে অবচেতন মনই বেশি সক্রিয়। তাই সবচেয়ে বড়ো কথা হল তাদের নানা রকমের কাজকর্মে টেনে আনা যা তাদের মনকে নাড়া দিয়ে ক্রমশ তাদের মনে চারপাশের জগতের প্রতি ঔৎসুক্য জাগাবে।

শুধু গানের ক্লাস নয়, সন্ধ্যায় গানের আসরও বসত। যে ছেলের গানের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল না, তারাও কৌতূহলবশত ঘরের বাইরে থেকে আমাদের গান শুনত। ক্রমে তারা এসে বসত ঘরের ভেতর, সংগীতের রুচি গড়ে উঠত তাদের। আমাদের দেশের কয়েকজন খুবই বড় শিল্পী আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা কাজ করতেন আর ছেলেরা দেখত তাঁদের কাজ কেমনভাবে এগোচ্ছে।

সবচেয়ে বড়ো কথা একটা পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছিল। এই গড়ে তোলাটা পাঠ্যক্রম গড়ে তোলা নয়, এমন একটা কিছু গড়ে তোলা যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে—অর্থাৎ পরিবেশ। তাতে অনেক সময় লেগেছে। প্রথমে সে কাজ সহজ ছিল। তখন অল্প কটি ছাত্র, আমিই তাদের প্রায় একমাত্র সঙ্গী ও শিক্ষক। সে ছিল সত্যিকার সত্যযুগ। সে প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ যারা পেয়েছিল তাদের সঙ্গে এখনো আমার যোগ আছে। সে সব দিনের কথা তারা কী ভালোবাসা কী আগ্রহের সঙ্গেই না স্মরণ করে। কিন্তু ক্রমে ছাত্র বাড়ল, সেই সঙ্গে আমার শিক্ষাদর্শ অনুযায়ী ইস্কুল চালাবার খরচাও। তখন একাজ খুবই কঠিন হল। প্রথমত, আমাদের দেশের এই একটা ঐতিহ্য ছিল যে আগত শিক্ষার্থীর শিক্ষার দায়িত্ব গুরুর, গুরু গৃহে তারা বিনামূল্যে থাকবে,

বই বইয়ের ঠিকানা

খাবে, বিদ্যালাভ করবে। কারণ গুরুরাই স্বেচ্ছায় তাঁদের এ দায়িত্ব মেনে নিয়েছিলেন। জ্ঞানলাভের সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন সমাজের কাছ থেকে তাই সমাজের কাছে নিজ শিষ্যদের সহায়তা করার দায় ছিল তাঁদের আর তার জন্য কোনরকম বেতন বা প্রতিদান নেওয়া চলত না।

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের এই রীতি চলে আসছে। আমিও এই পথেই শুরু করি। প্রথমে মাইনে আর থাকা খাওয়ার খরচ লাগত না, আমিই আমার দীন সম্বল থেকে তাদের খরচা মেটাতেম। কিন্তু বোঝাই যায় এ যুগের জীবনে এভাবে চলা সম্ভব নয় কারণ অন্য শিক্ষক রাখতে হলে তাঁদের মাইনে দিতে হবে, অন্য খরচও আছে। আমার পক্ষে তা মেটান অসম্ভব হয়ে উঠল। ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়াটা যে শিক্ষকেরই দায়িত্ব, তাতে লেনদেন আর দোকানদারি, টাকা দিয়ে জিনিস কিনছি এইভাবের কিছু থাকবে না—এই আদর্শ আর বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হল না। সে আদর্শকে বাধ্য হয়েই বিসর্জন দিতে হল আর আমার বিদ্যালয় ক্রমেই একটি সাধারণ ইস্কুলে হয়ে উঠল।

কেবল চেষ্টা করলেম এই ইস্কুলে এমন কিছু যেন থাকে যা চলতি ইস্কুলে পাওয়া যাবে না। শিক্ষকরা ছাত্রদের সঙ্গে একই জীবনযাপন করতেন। গড়ে উঠল একটা গোষ্ঠিজীবন, খেলাধুলোয় উৎসবে সর্ব ক্ষেত্রেই শিক্ষক ছাত্ররা মিলে মিশে যোগ দিতেন। খাঁচার মতো নয়, যেখানে বাইরে থেকে খাবার জোগান হয় পাখিকে, বরং বলা উচিত একটা নীড়ের মতো। ছাত্ররা নিজেরাও তাকে গড়ে তুলল তাদের জীবনযাত্রা, ভালোবাসা, প্রতিদিনের কাজ, তাদের খেলাধুলো প্রভৃতি যা কিছু এই বিদ্যালয়কে গড়ে তুলতে পারে তা দিয়ে। প্রতিষ্ঠানের এইটেই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

আমার বিশ্বাস এই জিনিসটি এখনো বহু পরিমাণে বজায় আছে। কাজটা কঠিন। কারণ যাঁদের নিয়ে আমায় কাজ করতে হয় তাঁরা ভিন্নভাবে মানুষ হয়েছেন, ছোটবেলায় তাঁরা আমার মতো ইস্কুল পালিয়ে খেলে বেড়াবার সুযোগ পান নি। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের নিজেদের বিশেষ ধারণা আছে আর তা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়া কঠিন। কাজেই যাঁরা আমায় সাহায্য করতে এসেছেন বিদ্যালয়ে তাঁদের মারফত কিছু কিছু অন্য ভাবধারা প্রবেশ করেছে। প্রথম প্রথম আমায় শিক্ষকদের সঙ্গেই যুঝতে হয়, অন্য ইস্কুলের মতো ছাত্রদের সঙ্গে নয়। ছাত্ররা যখন নিজেদের দোষে নয়, শিক্ষকদের দোষেই শাস্তি পেত আমি তখন ছাত্রদের পক্ষ নিতেম। আমায় কড়া হাতে অটল হয়ে সব সময় ছাত্রদের পক্ষ নিতে হত, শিক্ষকরা তাতে অসন্তুষ্ট হতেন। মনে পড়ে একদিন এক নতুন শিক্ষক এসে দেখেন কয়েকটি ছেলে গাছে উঠে পড়া করছে, তাঁর ধারণা হল এটা অবশ্যই ছেলেদের ডিসিপ্লিনের ব্যত্যয়। ছেলেদের উপর তিনি এতই রেগে গেলেন যে ইস্কুল মাস্টারের হাত থেকে ছেলেদের রক্ষা করতে হল আমায়। তাঁকে বললেম, এই ছেলেরা যখন আপনার বয়সে পৌঁছবে তখন

গাছে চড়ে পড়া করার মহাসুযোগ তারা আর পাবে না। তারা তখন অনেক ভব্যসভ্য হয়ে প্রকৃতি মায়ের কোল থেকে দূরে সরে যাবে।

এই হল ব্যাপার, আদর্শটা এখনো আছে যদিও ঘটনাচক্র ও যুগধর্মে জীবনের সঙ্গে তার কিছু বিচ্ছেদ ঘটেছে। তবু আমার ধারণা একটি পরিবেশ গড়ে উঠেছে আর তা এখনো বজায় রয়েছে। বিদ্যালয় এখন বড় হয়েছে। ছাত্র সংখ্যা প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে, অবশ্য সেটা যে সবসময় ভাল তা নয়। কিন্তু উপায় নেই।

পরে আরেকটি দিক দেখা দিয়েছে, মেয়েদের সংখ্যা বেশ বেড়েছে। আমাদের ওখানে এখন প্রায় ষাটটি মেয়ে আর সত্তরটি ছেলে পড়ে। এই কো-এডুকেশনের ব্যবস্থাটি ভারতবর্ষের পক্ষে একেবারে নতুন ব্যাপার। কিন্তু তা নিখুঁৎ-ভাবেই কাজ করছে। অভিযোগের কোন কারণ আমাদের ঘটে নি। প্রায়ই তারা একসঙ্গে বেড়াতে যায়। ছেলেরা কাঠ কেটে জল তুলে মেয়েদের সাহায্য করে। মেয়েরা ছেলেদের রেঁধেবেড়ে খাওয়ায়। বেশ কয়েকদিন ধরে তারা একসঙ্গে বেড়ায়। এটিই একটি বিরাট শিক্ষা।

আরেকটি জিনিসও আমি প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। আমি সবসময় চেষ্টা করি দেশের বাইরে থেকেও—ইওরোপ থেকে পণ্ডিতদের নিয়ে গিয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করার। এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকেও তা করতে পারলে ভাল হত। বিদ্যালয়ের পরিবেশের এটিও একটি অংশ। এই বিদেশী অতিথি-দের সঙ্গে আমাদের ছেলেমেয়েদের ব্যবহার খুবই সহজ স্বাভাবিক। আমার আদর্শ হল—মনের সর্বপ্রকার মুক্তি। আমাদের ছেলেবেলাকার শিক্ষার ফলে আমরা স্বদেশ, স্বজাতি, আমাদের মহাপুরুষ আর ইতিহাস আর কুসংস্কারকে এক ধরনের বেড়া দিয়ে বেঁধে রেখেছি। বড় হয়েও তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়, এমনকি আমাদের ইস্কুল পাঠ্যবইগুলোতেও তার সোৎসাহ চর্চা চলে আর সে কাজ করেন এমন সব ব্যক্তি যাঁরা অন্য দেশকে ছোট করে ছেলেদের মনে নিজেদের কীর্তিতে গর্ব জাগাতে চান। এর ফলে আসলে জাতীয়তার নাম কতগুলো কুসংস্কারকেই আঁকড়ে ধরা হয়। বিদেশী-দের ডেকে এনে আমার ছেলেদের মনে আমাদের অতিথিদের প্রতি প্রীতি জাগাতে চেয়েছি, মনে হয় তাতে সফলও হয়েছি।

অন্যান্য ধরনের কাজও আছে। আমাদের পাশের গ্রামগুলিতে আদি-বাসীদের বাস। তারা আমাদের সাহায্যের প্রত্যাশী। আমরা কয়েকটি সান্ধ্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করেছি, আমাদের ছাত্ররা সেখানে চাষীদের পড়ায়। তারপর আমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে গ্রামসেবার ব্যবস্থাও আছে। ছেলেরা তার ফলে গ্রামজীবনকে জানতে পারে। কৃষি ও স্বাস্থ্যরক্ষার আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয়ে গ্রামবাসীদের কীভাবে সাহায্য করা যায় তা তারা শেখে। আমার মতে প্রকৃত শিক্ষা হল শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, পূর্ণ জীবনযাপন।

আমাদের ছাত্রদের একটি জিনিস কেবল দিতে পারি নি তা হল গভীর

বই বইয়ের ঠিকানা

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। তার কারণ বিপুল খরচ, আমাদের দরিদ্র দেশে তার সংস্থান খুবই কঠিন। আমি এখনো তার ব্যবস্থা করতে পারি নি। আমাদের ছাত্ররা আর আমি এই আশাই পোষণ করি যে, একদিন এ ত্রুটি দূর করা সম্ভব হবে। এই কথাই সব সময় ভাবছি। আমার অর্থাভাব ও দৈন্য সত্ত্বেও কিছু কাজ করতে পেরেছি। আমাদের বিদ্যালয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বলবেন গ্রামাঞ্চলে আমরা কী সাহায্য দিতে পেরেছি। কিন্তু গ্রামসেবাই নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্যেই ছেলেদের পড়াশুনা ও কাজের সঠিক সমন্বয় প্রয়োজন কারণ গ্রামের কোলেই আমাদের জীবনযাত্রা। তার প্রাপ্য যদি তাকে না দিতে পারি, তবে আমরা নিজেদেরই মারব। সভ্যতা সেটাই করছে। গ্রামকে তার প্রাণরস থেকে বঞ্চিত করছে, তার সবকিছু শুষে নিয়ে চালান দিচ্ছে সোহাগের শহরে।

এই বিশ্বাসবশেই আমার ছাত্রদের আমি এই গ্রামের কাজে টেনে এনেছি। এই কাজ শুরু করেছি কারণ আমার ছাত্রদের পক্ষে গ্রামকে ঠিকভাবে সাহায্য করতে শেখাটা প্রয়োজন। আমার ইস্কুলকে আমি যে আদর্শ মনে রেখে গড়তে চেয়েছি তা সংক্ষেপে এই।

দোভাষী : একজন আপনার কাছ থেকে ভারতীয় নারীর অবস্থা জানতে চান। তাঁর অনুরোধ এদেশের নারীদের সঙ্গে ভারতীয় নারীদের অবস্থার তুলনা যেন আপনি করেন।

রবীন্দ্রনাথ : এটা খুবই বড়ো প্রশ্ন।

প্রশ্ন : আপনার ছাত্ররা সমাজের কোন অবস্থা থেকে এসেছে? চাষী-মজুর প্রভৃতি ঘরের শিশুরা আছে কি?

রবীন্দ্রনাথ : আমাদের ওখানে কোন বাধা নেই। পাশের গ্রামগুলোতে যে আদিবাসীরা থাকে তাদের মধ্যে থেকে কিছু ছাত্র নেবার চেষ্টা একবার করেছিলেম। কিন্তু আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে তাদের রাখা খুবই কঠিন। ছাত্ররা যে আপত্তি করে তা নয়। বরং ঐ ছেলেদের পেয়ে তাদের খুব আনন্দই হয়েছিল। কিন্তু তারা (আদিবাসী ছেলেরা) কোন শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত নয়, হয়ত ছোটবেলায় আমি যেমন ছিলেম ওরাও ঠিক সেরকমেরই। পড়াশুনা দেখলেই তারা পালাতে চায়। আমার ওখানে যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা পেলেও তা তাদের পছন্দ হয় নি।

কিন্তু পাশের যে গ্রামে আমরা কাজ করছি সেখানে গ্রামবাসীদের জন্য একটি বিশেষ ইস্কুল খোলা হয়েছে। এই তফাৎটা কেন করলেম, এ প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন। উচ্চশ্রেণীর লোকেদের জন্য যে ইস্কুল গ্রামের ছেলে-মেয়েদের কেন সেখানে পড়তে দিলেম না? তার কারণ অপেক্ষাকৃত ধনী ঘর থেকে যারা আসে তারা সবাই জীবিকানির্বাহের জন্য পরীক্ষা পাশ করে ডিগ্রী নিতে উৎসুক। তাই তাদের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন হাতের কাজ এমন কি সংগীত আর শিল্পকলায় তারা সময় নষ্ট করতে চায় না। তারা চায় পড়া মুখস্থ করে কোন রকমে পাশ করে বেরিয়ে যেতে। আমাকে এ

ব্যাপার কিছুটা মেনে নিতে হয়েছে, তা না হলে আমার ইস্কুলে একটি ছাত্রও থাকত না। এর একটি কারণ হল, আমাদের দেশ অত্যন্ত দরিদ্র, তাই স্বভাবতই ছেলেরা বড় হয়ে জীবিকা অর্জন করে পরিবারের ভরণপোষণ করতে চাইবে। তাদের পরীক্ষা পাশের সুযোগ দিতেই হবে। সেই কারণেই আমি আরেকটি ইস্কুল খুলি। সেটি গ্রামের যাদের সরকারী বা সওদাগরী অফিসে চাকরীর উচ্চাশা নেই তাদের জন্য। এই অপর ইস্কুলটিতে পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্য যা কিছু আমি একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি তা প্রবর্তনের চেষ্টা করছি। অনতিকাল পরেই এই গ্রামের ইস্কুলটিই সত্যিকার আদর্শ বিদ্যালয় হয়ে উঠবে, অন্যটি তখন পাবে অবহেলা।

প্রশ্ন : সাহিত্য সংগঠনের এক প্রতিনিধি জানতে চান ভারতীয় সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ধারা কী কী। তরুণ শ্রমিকরা ভারতীয় সাহিত্যে কী অংশ নেয়? শ্রমিকদের মধ্যে থেকে কোন সাহিত্যিক জন্মেছেন কি? শ্রমিকদের সাহিত্যের অনুশীলন দেবার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান ভারতে আছে কি?

রবীন্দ্রনাথ : শ্রমজীবীদের সাহায্য করা, তাদের সৃষ্টি শক্তির উৎসারণের জন্য কোন সংগঠিত প্রচেষ্টাই আমাদের দেশে নেই। নানা সান্ধ্য বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। কিন্তু সে কেবল তাদের লেখাপড়া আর সামান্য কয়টি বিষয় শেখানর জন্য। এর চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের ইস্কুল বিশেষ আছে বলে দাবি করা যায় না। কেবল প্রাথমিক শিক্ষাই তারা সেখানে পায়। একটি যুক্তি হল এতে কোন কাজ হবে না, ওরকম বিদ্যালয় খুললে কোন ছাত্র পাওয়া যাবে না। উৎসাহ দিয়ে তাদের আমরা এইসব ইস্কুলে কেবল লিখতে পড়তে শেখার জন্য টেনে আনতে পারি। তারা ভাবে এইটুকুই যথেষ্ট। তাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তিও কদাচিৎ পাওয়া যায় যার আকাঙ্ক্ষা হল উঁচু ক্লাসে পড়ে পরীক্ষা পাশ করে ডিগ্রী নেওয়া। কিন্তু তারা সংখ্যায় খুবই অল্প আর ইস্কুলে পড়ার সময়েই তারা তাদের মূল চরিত্র হারায়। পরীক্ষা পাশের পর তারা আর তাদের গ্রাম আর কাজের সঙ্গে যোগ রাখে না। তারা চায় শহরে এসে কোন রকমের একটা কাজ নিতে, যা তাদের মতে উঁচু জাতের।

চাষী আর শ্রমিকেরা যাতে তাদের কাজই শিক্ষিতের মতো সঠিকভাবে করতে পারে তেমন তালিম দেবার মতো কোন বিদ্যালয় তাই আমাদের বিশেষ নেই। তার একমাত্র ব্যতিক্রম বলা যায় আমাদের বিদ্যালয়ের পাশের গ্রামে যে ইস্কুলটি খুলেছি সেটি। সেখানে খাঁটি গ্রামবাসীরা শুধু কয়েকটা প্রাথমিক বিষয়ে উপর উপর শিক্ষা নয় সত্যিকার তালিম, প্রকৃত শিক্ষা পায়।

স্টেইনহাউস : আপনি হয়ত আমাদের শিক্ষামূলক কাজের বিষয়ে কিছু জানতে চান। কিংবা যদি ক্লান্ত হয়ে থাকেন তবে অন্য কোন সময়ে আমরা আবার আপনার সঙ্গে দেখা করব, হয়ত আপনি আমাদের ইস্কুলগুলো দেখার পর।

রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষাক্ষেত্রে আপনাদের কাজের কথা জানতে পারলে খুবই খুশি হব।

বই বইয়ের ঠিকানা

সোভিয়েত শিল্প সমালোচকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপের স্টেনো-রিপোর্ট

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

রবীন্দ্রনাথ : আমার প্রতি আপনাদের সংবর্ধনা আর প্রশংসাবাক্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। জাতিতে জাতিতে সংযোগের শ্রেষ্ঠ উপায় হল হৃদয় ও মনের যোগ—আমার দেশের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাতে আপনাদের দেশেরও অধিকার, আপনাদের শ্রেষ্ঠ যা তাতে অধিকার সারা মানব জাতির। তাই দান প্রতিদানের প্রকৃত ক্ষেত্র সংস্কৃতি। আমার সৃষ্টির এই নতুনতম প্রকাশের ফল আপনাদের আমি সানন্দেই দেখাব।

এ এসেছে একেবারেই হঠাৎ, কোন শিক্ষা বা প্রস্তুতি ছাড়াই। তাই মনে করি এর মনস্তাত্ত্বিক মূল্য আছে। অবশ্য ইওরোপের অন্যান্য দেশে, যাঁরা শিল্প ও শিল্প কীর্তি সম্বন্ধে খুবই সমালোচক তাঁরা আমায় আশ্বাস দিয়েছেন যে আমার ছবিতে নাকি শুধু মনস্তাত্ত্বিক আকর্ষণই নয় শিল্পের উচ্চতর আকর্ষণও আছে, তাঁরা আমায় শিল্পী বলে স্বীকার করেছেন, তার জন্য আমি খুবই গর্ববোধ করি।

রবীন্দ্রনাথকে সোভিয়েত শিল্পীর চিত্রোপহার

বই বইয়ের ঠিকানা

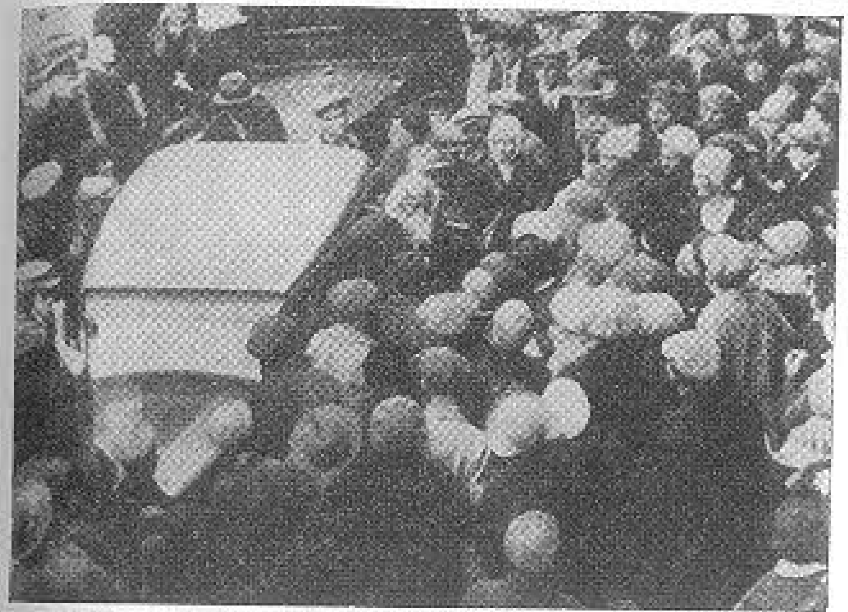

মস্কোতে রবীন্দ্র-চিত্র প্রদর্শনীতে কবির আগমন

আপনারা আমার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কী ভাবেন তা জানতে চাই, কারণ আপনাদের শিল্পসংক্রান্ত মতের আমি খুবই মূল্য দিই। আপনাদের কাছেও আমার ছবি দেখাতে চেয়েছি, কারণ ছবির ভিতর দিয়েই আমি আপনাদের মনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে সক্ষম হব। কথা দিয়ে তা হবে না, কারণ ভাষার বাধা রয়েছে। আমার ছবিরা আপনাদের সঙ্গে আলাপ করবে দোভাষীর সাহায্য ছাড়াই।

সমালোচক : এই ছবিটির আইডিয়াটা কী?

রবীন্দ্রনাথ : কোন আইডিয়াই নেই। এ একটি ছবি। আইডিয়া থাকে কথায়, জীবনে নয়।

সমালোচক : আপনার কাজে উল্লেখযোগ্য যৌবনের উদ্দীপনা। আর সেই জন্যই এরা এত কৌতূহলোদ্দীপক। যৌবনের উদ্দীপনা তার অভি-ব্যক্তির প্রকৃত মাধ্যম খুঁজে পেতে কোন বাধা অনুভব করে না আর আপনার ছবি তাদের নিজস্ব আঙ্গিক গড়ে তুলেছে। ছবিগুলি এতই চিত্তাকর্ষক যে আপনি পেশাদার শিল্পী হলেও তার আকর্ষণ কমত না। আপনি আগে কখনো ছবি এঁকেছেন?

রবীন্দ্রনাথ : কখনো না।

সমালোচক : আপনি প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। প্রতিটি নতুন ছবি মনে গভীরতর ছাপ ফেলে, দর্শকরা সবাই এ দেখে রোমাঞ্চিত। এই ছবিগুলি কখন এঁকেছিলেন তা জানতে খুবই উৎসুক।

রবীন্দ্রনাথ : এরা আগেকার। কয়েকটি পরে আঁকা, কয়েকটি আগে। এরা প্রধানত রেখা-প্রধান, রং এসেছে পরে।

সমালোচক : কয়েকটির সঙ্গে ডুবেলের ছবির খুবই মিল আছে, যাঁর ছবি আপনি হয়ত কখনো দেখেন নি?

রবীন্দ্রনাথ : কখনো দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

সমালোচক : আপনাকে দেখাতে পারলে খুবই খুসি হব।

অন্য সমালোচক : ভারি আনন্দ হত যদি আপনার ছবি আমরা পেতাম। তাহলে আমাদের শিল্পীর, রুশ শিল্পীর আঁকা বলে তা প্রদর্শিত করা যেত।

সমালোচক : আপনার ছবির কোন নাম আছে কি?

রবীন্দ্রনাথ : কোন নামই নেই। কোন নামের কথা ভাবতেই পারি নে। এদের কীভাবে বর্ণনা করব জানি নে।

সমালোচক : এটি কি আপনারই পর্ট্রেট?

রবীন্দ্রনাথ : হ্যাঁ, আমারই পর্ট্রেট। এত ছবি, আপনাদের ধৈর্যের উপর জুলুম করছি না তো?

সমালোচক : বাকি ছবি দেখতে পেলে খুবই আনন্দিত হব।

রবীন্দ্রনাথ : তাদের দূর থেকে দেখা যাবে না।

সমালোচক : এটি কি দান্তের পর্ট্রেট?

রবীন্দ্রনাথ : না, দান্তের পর্ট্রেট নয়। এটা এঁকেছি জাপান থেকে আসার পথে স্টীমারে। গত বছর আমার কলম তার নিজের ইচ্ছেয় চলেছিল, তার ফলে এই যে ছবিটি দেখছেন, এটি দেখা দেয়। রংটা পেয়েছি···ফুল থেকে।

সমালোচক : এটা কি কোন বিশেষ রং?

রবীন্দ্রনাথ : না, সাধারণ ঝর্ণাকলমের কালি।

সমালোচক : আর এই রং?

রবীন্দ্রনাথ : এটি কালো আর লাল কালিতে আঁকা। এগুলো আগেকার ছবি—এই যেগুলো কালো আর সাদায় আঁকা।

সমালোচক : তেল রঙে কিছু এঁকেছেন কি? না সবই কালিতে?

রবীন্দ্রনাথ : হ্যাঁ, তাই।

সমালোচক : (আগের দিন আঁকা একটি ছবির বিষয়ে) : এটা কি মস্কোর ইম্প্রেশন?

রবীন্দ্রনাথ : এটা কালই এঁকেছি। জানি না এর সঙ্গে মস্কোর কোন সম্পর্ক আছে কি না—কে জানে, হয়ত থাকতে পারে।

দোভাষী : আমাদের আপনি এত আনন্দ দিলেন—আমরা তার জন্য

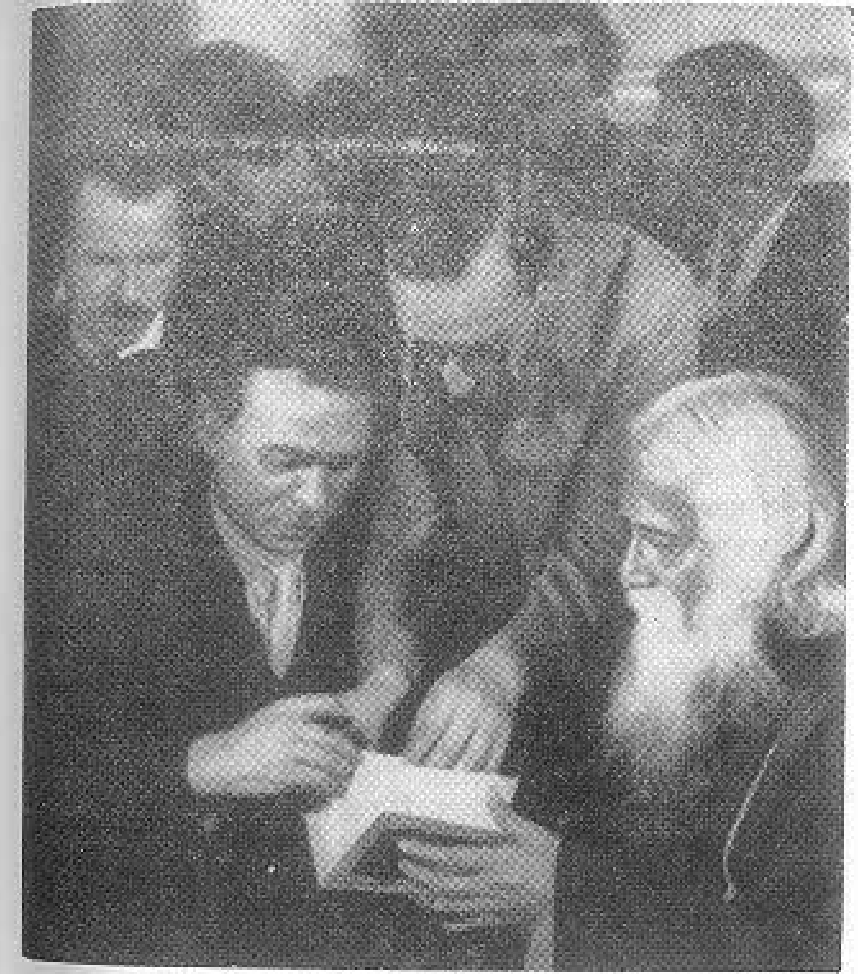

নিজের লেখা বইতে স্বাক্ষর করছেন রবীন্দ্রনাথ

আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। অধ্যাপক ক্রিস্ত (ত্রেতিয়াকভ আর্ট গ্যালারির ডিরেক্টর) বলছেন—আপনাকে তিনি বহুকাল থেকেই মহাকবি বলে জানেন, এখানে এসেছিলেন এক সৌখীন শিল্পোৎসাহীর কিছু কাজ দেখতে পাবেন এই ভেবে। কিন্তু যা দেখলেন তাতে তিনি বিস্ময়াভিভূত। এই যে ছবিগুলো দেখার সৌভাগ্য তাঁর হল তাদের বলিষ্ঠতায় তিনি আকৃষ্ট। আপনার ছবি যে সমগ্র শিল্প জগতের এক বিরাট ঘটনা সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তাঁর বিশ্বাস, আমরা সাংস্কৃতিক ও আর্থনীতিক-জীবনের সব নতুন বিকাশকেই বিরাট মূল্য দিই বলে আমাদের শিল্পীরা আপনার কাজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই উপকৃত হবেন।

বই বইয়ের ঠিকানা

রবীন্দ্রনাথ : আপনাদের প্রশংসায় আমি খুবই আনন্দিত। বিশেষ ভাল লাগছে আপনাদের দেশের দক্ষ সমালোচক আর শিল্পীরা একথা বলছেন জেনে। আমি আমার কাজকে প্রায় নিষ্প্রয়োজন বলেই মনে করতেম। একান্ত নবাগত বলে এখনো প্রশংসায় অভ্যস্ত হই নি। প্রশংসা শুনলে সব সময় ভারি খুশি হয়ে উঠি, কুণ্ঠিত লাগে কারণ নিজের কোন মাপকাঠি নেই—শিল্প অভিজ্ঞতার ব্যাপক পটভূমি যাঁদের আছে তাঁদের উপর ভরসা করে থাকি।

সত্যিই ভারি আনন্দ হল—আমার কাজ তারিফ করছেন দেখে খুবই খুশি হচ্ছি।

দোভাষী : আপনার ছবিতে আমাদের উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশে আমরা অত্যন্ত ব্যগ্র। কিন্তু আপনি নিশ্চয় এর মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাই আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাইব না। প্রদর্শনীর উদ্বোধনে ওঁরা সবাই যা ভাবছেন বলবেন। প্রদর্শনীর জন্য একটি বিশেষ ক্যাটালগ পেলে খুব বাধিত হতাম।

রবীন্দ্রনাথ : আমি তো ছবির কোন নাম দিই নি। যদি নাম দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন তবে আপনাদেরই সেই ত্রুটি পূরণ করতে বলব। আমার নিজের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

দোভাষী : ছবির নামের কোনই প্রয়োজন নেই। আমরা আপনার কাছ থেকে আপনার শিল্পের ব্যাখ্যা করে একটা ভূমিকা জাতের কিছু চাই।

রবীন্দ্রনাথ : তেমন একটা কিছু বোধ হয় করা আছে, ইংলণ্ডেই করেছিলেম।

দোভাষী : আমরা বিশেষভাবে এই দেশের জন্যই একটা চাই আপনার ভ্রমণের স্মৃতি হিসেবে।

রবীন্দ্রনাথ : বেশ, তা করব।

দোভাষী : আপনার ছবি (ম. প. ক্রিস্তির পক্ষে) অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। তিনি যা আশা করেছিলেন তাই দেখতে পেয়েছেন। প্রদর্শনীর জন্য ছবিগুলো কী ভাবে দেখান হবে তার একটা পারম্পর্য করে দিতে আপনাকে অনুরোধ করছেন।

রবীন্দ্রনাথ : আমার মনে হয় আপনি নিজে নানা ধরন বেছে নির্দিষ্ট করে সেই অনুসারে যদি সাজান তাহলেই ভাল হয়। এদের কালপর্যায় আমার মনে নেই। এই গুলো অন্যদের চেয়ে আগেকার—এটুকু আমি জানি। কিন্তু আঁকার তারিখ আমার ঠিক মনে নেই। তাই মনে হয় আঁকার সময় অনুসারে নয়, আপনি নিজে বেছে নানা ধরন অনুসারে যদি সাজান তবেই যাঁরা দেখতে আসবেন তাঁদের সুবিধা হবে।

দোভাষী : একথা শুনে (ম. প. ক্রিস্তি) আনন্দিত হয়েছেন। তিনিও এদের কালপর্যায় অনুযায়ী নয়, একমাত্র স্টাইল অনুযায়ীই সাজাতে চান।

রবীন্দ্রনাথ : আমার কাজ আমি করেছি। সাজাবার ভার এখন আপনাদের উপর।

দোভাষী : এখানে যাঁরা আছেন তাঁরা বলছেন অন্য শিল্পীরাও যদি আপনার মতো ভাবতেন তাহলে খুব ভাল হত। যে আনন্দ পেলাম তার জন্য আরেকবার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা বিদায় নেব।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আ. এ. কিংগিনার নামাংকিত প্রথম পাইওনিয়র কমিউনের পাইওনিয়রদের আলাপ

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

রবীন্দ্রনাথ : বন্ধুরা, তোমরা আমায় যে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালে তাতে আমি অভিভূত। তোমাদের এই হাসিখুসি, আশায় আনন্দে ভরা কাঁচা মুখ, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় ভরা, আমার মনে গভীর সাড়া জাগিয়েছে। জানলেম আমার রাশিয়া ভ্রমণ সার্থক। আমি এখানে এসেছি, তোমরা এখন যেসব বিরাট কাজ করছ শুধু দেখার জন্যই নয়। এসেছি সেই ভবিষ্যতের প্রত্যক্ষ পরিচয় নিতে, যা তোমরা বিপুল উৎসাহে গড়ে তুলছ সারা মানবজাতির জন্য। আমি যে দেশেই যাই, সে দেশের তরুণদের সঙ্গে ভাল করে পরিচিত হতে চাই। ভবিষ্যৎকে দেখবার, নতুন সভ্যতার ভিত্তিস্থাপনের বিরাট সুযোগ তো তাদেরই। তোমরা জান, আমি কবি। আমার কাজ হল সজীব আবেগ আর যৌবনদীপ্ত

পাইওনিয়রদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

বই বইয়ের ঠিকানা

আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অভিব্যক্তি দেওয়া। সেই কারণেই আমি তোমাদের সঙ্গে মিলে স্বপ্ন দেখছি ভবিষ্যতের।

তোমাদের আমি ভাল বুঝতে পারি আরো এই কারণে যে আমার জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে ছোটদের নিয়ে। বাংলা দেশে আমার একটি ইস্কুল আছে। সেখানে আমি শিশুদের সঙ্গেই থাকি। চেষ্টা করি একটি পূর্ণ জীবনের পরিবেশে তাদের মানুষ করার। আমি চাই সৃষ্টিশীল জীবনের বিকাশের সবরকম সম্ভাব্য সুযোগ তাদের দিতে। এ সম্ভাবনা শ্রেষ্ঠ উপায়ে কাজে লাগানর জন্য তাদের স্বাধীন উদ্যোগে আমি বিশ্বাস করি।

আমি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সেই স্বাধীনতা, যার মধ্যে পরিপূর্ণতায় প্রকাশ পায় মানুষের দুটি গভীর প্রেরণা—মানব প্রেম ও সমাজ সেবা। আমার ইস্কুলে শিশুদের আমি এই স্বাধীনতা দিয়েছি। আমার জানতে ইচ্ছে করে তোমরা, তরুণ পাইওনিয়ররা, কী ভাবে তোমাদের স্বাধীনতাকে তোমাদের সমাজের কল্যাণে লাগাচ্ছ, তোমাদের দেশে নতুন যুগের যে আদর্শকে তোমরা রূপ দিয়েছ তাকে তোমরা কী ভাবে অভিব্যক্তি দাও। আশা করি আজকের এই সন্ধ্যায় তোমাদের কাজকর্ম, জীবনযাত্রার ব্যাপক পরিচয় পাব।

আমায় যে অভ্যর্থনা তোমরা জানালে তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশ্বাস করো, আজ সন্ধ্যায় তোমদের মাঝখানে আমি সত্যিই অত্যান্ত আনন্দ পাচ্ছি।

শিশুরা তাঁকে ঘিরে বসেছিল। অধীর আগ্রহে তারা শুনতে চেয়েছিল ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের ইস্কুলের কথা, বলতে চাইছিল তাদের নিজেদের পাইওনিয়র কমিউনের বিষয়ে, যা তারা নিজেরাই চালায় আর যা নিয়ে তাদের অত্যান্ত গর্ব।

কবি তাঁর কথা শেষ করা মাত্র গুঞ্জন শোনা গেল। কয়েকটি ছাত্র তখুনি কবির প্রশ্নের জবাব দিতে চায়।

একটি ছেলে : আমরা কমিউনে বিশ্বাসী, আমরা কমিউনিস্ট। বুর্জোয়ারা চায় ব্যক্তিগত মুনাফা, আমরা চাই সবাই যেন সমান ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারে। এখানে, এই ইস্কুলে আমরা এই নীতিই মেনে চলতে চাই।

একটি মেয়ে : আমাদের স্বাধীনতা—আমাদেরই হাতে, বড়দের হাতে নেই, তাই আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা পরামর্শ করে ঠিক করি কোনটা আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল।

অন্য ছেলে : আমি বুঝিয়ে বলছি। আমরা, পাইওনিয়ররা, এই ইস্কুলে ছোট আকারে দেখাতে চাই কী ভাবে সারা দেশই, কয়েকজন শক্তিশালী বড়লোকের কর্তৃত্বে নয়, অধিবাসীদের নিজেদের মধ্যে বন্ধুর মতো পরামর্শের ভিতর দিয়েই বড় হতে পারে। আমাদের ভুলত্রুটিও হয়। যদি চাই তাহলে আমাদের চেয়ে যারা বড় তাদেরও সাহায্য পরামর্শ নিতে পারি। কিন্তু তার আগে আমরা সবকিছু নিজেরাই করতে চাই। দরকার হলে ছোট ছেলেমেয়েরা বড় ছেলেমেয়ে-

দের পরামর্শ নেয়, সেই বড়রা আবার যেতে পারে আরো যারা বড় তাদের কাছে, এইভাবেই চলে, যতক্ষণ না শিক্ষকদের কাছে গিয়ে পৌঁছই। আমাদের দেশ এই আদর্শ নিয়ে গঠিত। আমরা পাইওনিয়ররা এই পদ্ধতিকেই রূপ দিতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ : কেউ কোন অপরাধ করলে কী কর?

একটি মেয়ে : আমাদের এখানে কোন শাস্তি নেই কারণ আমরা নিজেরাই নিজেদের শাস্তি দিই। তাই তা শাস্তি না হয়ে হয় অন্য কিছু। কেউ তাতে আপত্তি করে না।

রবীন্দ্রনাথ : আর একটু বিস্তারিত করে বলো। ধরা যাক তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যায় করল, সে যাতে বুঝতে পারে যে সে অন্যায় করেছে, আর ভবিষ্যতে যাতে কখনো সেরকম কোন অপরাধ না করে, তার জন্য তোমরা কী কর? অপরাধীর বিচারের জন্য কোন বিশেষ সভা ডাক কী? নিজেদের মধ্যে থেকে তার জন্য কাউকে বিচারক নির্বাচন কর কি? অভিযুক্ত যদি অপরাধী প্রমাণ হয় তখন তাকে শাস্তি দেবার বিধি কী রকমের?

কয়েকজন ছাত্র এ প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য একসঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। প্রত্যেকেই তারা একের পর এক নিজেদের মত জানাবার সুযোগ পায়।

একটি মেয়ে : আমাদের কোন শাস্তি নেই। বিচারটাই শাস্তি। কাউকে অপরাধী করাই শাস্তি, তার চেয়ে শাস্তি আর নেই।

একটি ছেলে : তার মানে, সেও দুঃখিত হয়, আমরাও দুঃখিত হই। বাস চুকে যায়।

রবীন্দ্রনাথ : কিন্তু কেউ যদি ভাবে বিচারকরা তার প্রতি অযথা দোষারোপ করছে? তাহলে তোমাদের উপরেও আর কারো কাছে সে আপিল করতে পারে?

পূর্বোক্ত ছেলেটি : বিচার ন্যায় কিনা এ প্রশ্নে গোলমাল দেখা দিলে আমরা ভোট নিই। অধিকাংশের মত অভিযুক্তকে মানতেই হয়।

রবীন্দ্রনাথ: অভিযুক্ত যদি অধিকাংশের কথা স্বীকার না করে?

ছেলেমেয়েরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটি মেয়ে উঠে বলল, 'তা হলে হয়তো আমরা শিক্ষকদের পরামর্শ নিতে যাই—কিন্তু সত্যি বলতে কি এরকম ঘটনা কখনও ঘটে নি।'

পূর্বোক্ত ছেলেটি : আমি এর উত্তর দেব। খারাপ কাজকে আমরা কখনো ন্যায় বলে দেখাতে চাই না কারণ আমরা হলাম বাছাই করা পাইওনিয়র, আগে থেকে জানি কী আমাদের করা উচিত, কী উচিত নয়।

দোভাষী : এই পাইওনিয়রদের অনাথ ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে বিশেষ করে বেছে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ গুণ আছে বলেই পাইওনিয়র কমিউনে এদের নেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ : তোমাদের কথা বুঝতে পেরেছি। তোমাদের কমিউনের পরিবেশটাই তার সদস্যদের অন্যায় কাজের পথে সবচেয়ে ভাল বাধা। এই উচ্চ নৈতিক পরিবেশের ফলেই কমিউনের সদস্যরা নিজেরাই কমিউন জীবনের

বই বইয়ের ঠিকানা

পরিপন্থী ক্ষতিকর কাজের ভুল বুঝতে পারে। এবার তোমাদের কর্তব্যের বিষয়ে কিছু জানতে চাই।

কয়েকটি ছেলেমেয়ে উত্তর দেবার জন্য উঠে দাঁড়ায়।

একটি ছেলে : বুর্জোয়া স্কাউটদের সঙ্গে আমাদের মিল নেই। ওরা পুরস্কার চায়, সামরিক সম্মান চায়। ওরা সবকিছু নিজের জন্য চায়, সবার ভালোর জন্য নয়। আমরা পাইওনিয়ররা শুধু নিজের জন্য কিছুই চাই না। সবার যেটুকু মঙ্গল আমরা করি, তাতেই আমাদের নিজেদের মঙ্গল। আমরা পাড়াগাঁয়ে যাই গাঁয়ের লোকদের শেখাতে—কী করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়। বুঝিয়ে বলি কী ভাবে সব কাজ বুদ্ধিপূর্বক করতে হয়। কখনো কখনো কিছুদিন করে তাদের সঙ্গেই থাকি। নাটক অভিনয় করি, দেশের অবস্থার কথা বলি। বলি আগে কেমন ছিল, এখন কী অবস্থা, ঠিক মতো কাজ করলে ভবিষ্যতে কী হয়ে উঠবে।

একটি মেয়ে : দর্শকদের আগ্রহ জাগিয়ে উপকারী নানা বিষয় নিয়ে আমরা কী ভাবে নাটক করি, দল বেঁধে আবৃত্তি করি, তা আপনাকে দেখাব। আমাদের সজীব সংবাদপত্রের পরিচয় দেব। আমাদের অনেক খবর জানতে হয়, আমরা যা জানি তাই আবার অন্য সবাইকে জানান আমাদের কর্তব্য। কেননা ঠিক মতো করে তথ্যগুলি জানতে এবং তাদের উপলব্ধি করতে পারলে তবেই আমাদের কাজ খাঁটি হতে পারে।

একটি ছেলে : এ সব আমরা প্রথমে বই থেকে, আমাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে শিখি। তা নিয়ে আগে আমরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করি, তারপরেই কেবল লোকের কাছে গিয়ে তা জানাবার অনুমতি মেলে।

রবীন্দ্রনাথ : তোমাদের জেনে ভাল লাগবে—তোমাদের মতো আমাদের ইস্কুলেও ব্রতী বালক আর ব্রতী বালিকা নামে ছেলে আর মেয়েদের দুটি সংগঠন আছে। বয়-স্কাউটস আর গার্ল-গাইড্‌সের সংগঠনে আমার আস্থা নেই। কারণ তাদের নানা রকমের সব শপথ নিতে হয় আর তোমরা যা বললে, ঐ সব সংগঠনে সামরিক ধাঁচের কিছু বিষাক্ত মতবাদও আছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা গ্রামের কাজে যায় (চাষীদের সাহায্য করে)। কাছাকাছি কোথাও আগুন লাগলে নেবায়, ওষুধ বিলি করে, গাঁয়ের লোকদের কী ভাবে ভাল করে বসবাস করা উচিত তা বুঝিয়ে বলে, তোমরা এই ধরনের কাজ করে আনন্দ পাও জেনে খুবই খুসি হলাম, কারণ তোমরা যা বললে—গাঁয়ের লোকেদের সাহায্য করা মানে তোমাদের নিজেদেরই সাহায্য করা, সারা দেশের সেবা করা।

তোমাদের প্রাত্যহিক ইস্কুল জীবনের কথা জানতে আমি উৎসুক।*

---

* পাইওনিয়ররা রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তাদের ইস্কুলের দৈনন্দিন কার্যসূচীর কথা বিস্তারিতভাবে বলে।

মস্কোর কেন্দ্রীয় কৃষিভবনে যৌথখামারী ও পৃথক কৃষকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপের স্টেনো-রিপোর্ট

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

প্রশ্ন : আজ ভারতবর্ষের জাতীয় নীতি কী, হিন্দু মুসলমানে বিরোধের কারণটাই বা কী?

রবীন্দ্রনাথ : আমি নিজে দেখেছি এই বিরোধ কেবল গত পঁচিশ বছরের ঘটনা। এর আগে, আমার যতদূর মনে পড়ে, আমি বহু বছর গ্রামে কাটিয়েছি—এদের মধ্যে এমন বিদ্বেষ আর শত্রুতা ছিল না। আমি স্থিরনিশ্চিত যে এই বিরোধ আরো বেড়েছে ভারতের চাষীদের বিপুল অজ্ঞতা আর অশিক্ষার ফলে। আমার মতে এই ধর্মবিরোধ একমাত্র লোকশিক্ষা বিস্তারের ফলেই দূর হতে পারে। দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষে আজ লোকশিক্ষার কোন সম্ভাবনা নেই। এ সম্ভাবনা আছে কেবল আপনাদের দেশেই।

প্রশ্ন : আপনি চাষীদের বিষয়ে কখনো কিছু লিখেছেন কি, ভারতীয় চাষীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?

রবীন্দ্রনাথ : শুধু লেখা কেন, তাদের জন্য আমি কাজ সুরু করেছি। আমার একলার সাধ্যে যতটুকু সম্ভব তাই নিয়ে তাদের শিক্ষার কাজ চালাই, আমার ইস্কুলে শুধু যে শিশুদের আর তরুণদের পড়াই তা নয়, চারপাশের গ্রামেও সেকাজ চলে। অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে যে প্রকাণ্ড কাজ চালাচ্ছে তার তুলনায় এ উদ্যোগ অতি হৃস্বসামান্য।

প্রশ্ন: এদেশে যে যৌথীকরণ (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঐকত্রিকতা) চলছে সে বিষয়ে আপনার মত কী?

রবীন্দ্রনাথ : অসীম সাহসে চাষীরা এখানে সে কাজ (ঐকত্রিকতা) চালাচ্ছেন আর তার গুরুত্ব যে বিরাট তা আমি অনুভব করি। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম, কারণ দুর্ভাগ্যবশত, এবিষয়ে আমি জানি খুবই কম। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই সমস্যা কী ভাবে সমাধান করা হচ্ছে তা জানি না বলেই তো আপনাদের দেশে এসেছি। এটি আমার আসার একটি কারণ। তাই আপনাদের কথার উত্তর দেবার আগে গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটা সবিস্তারে জানার জন্য আপনাদের সাহায্য চাই।

প্রশ্ন : আমাদের যৌথীকরণ আর সাধারণভাবে আমাদের দেশে যা করা হচ্ছে সে বিষয়ে ভারতবর্ষের লোকে কী জানে?

রবীন্দ্রনাথ : দুর্ভাগ্যবশত খুবই কম জানে, কারণ অন্য সব দেশের মতোই

বই বইয়ের ঠিকানা

ভারতের পত্রপত্রিকায় আপনাদের দেশের খবর নানা কারণে চাপা পড়ে যায়। এবং যা-কিছু শোনা যায় তা-ও সব বিশ্বাসযোগ্য নয়।

প্রশ্ন : আগে কখনো কৃষি ভবন আর তাদের কাজের কথা শুনেছিলেন কি ?

রবীন্দ্রনাথ : আপনাদের কল্যাণের জন্য কী করা হচ্ছে মস্কোয় এসে তা প্রথম দেখলেম এবং জানলেম। চাষী প্রজার পক্ষে এই ঐকত্রিকতার ফলাফল সম্বন্ধে আপনাদের মত জানতে চাই।

একজন বত্রিশ বছরের উক্রেনীয় যুবক চাষী খেরসন অঞ্চলবাসী, নাম তার সেমেন্চেংকো, বলেন, 'দু বছর হল একটি যৌথখামার স্থাপিত হয়েছে, আমি তাতে কাজ করি। এই খামারে শাকসবজির বড়ো বড়ো বাগান আছে, তা থেকে আমরা সবজিপাতি জোগান দিই ক্যানিং কারখানায়, সেখানে সেগুলো টিনের কৌটোয় পোরা হয়। এ ছাড়া বড়ো বড়ো খেত আছে, সেখানে সব গমের চাষ। আমরা দিনে আট ঘণ্টা কাজ করি আর প্রতি পঞ্চম দিন ছুটি (পাঁচদিনের সপ্তাহ এখন সারা দেশেই চলছে, তার নাম হল "অবিরাম শ্রম সপ্তাহ")। আমাদের আশেপাশের যে-সব চাষী নিজের খেত নিজে চষে তাদের চেয়ে আমাদের এখানে অন্তত দুনো ফসল হয়। যৌথখামারে প্রায় গোড়া থেকেই (দু-বছর আগে) দেড়শো চাষী যোগ দেয়। ১৯২৯ সালের বসন্তে অর্ধেক যৌথচাষী আমাদের ছেড়ে চলে যায়। তার কারণ (সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক) কমরেড স্তালিনের নির্দেশ-পত্রটিকে ভুল করে বোঝা ও তার বেঠিক প্রয়োগ। তিনি বিশেষ করে বলেছিলেন, যৌথীকরণের মূলনীতি হচ্ছে যৌথখামার সংগঠনে স্বেচ্ছামূলক যোগদান। অনেক গ্রাম অঞ্চলে এই মূল-নীতির মর্ম ঠিকভাবে বোঝা হয় নি। তার অপপ্রয়োগ ও তজ্জাত আমলাতন্ত্রী ত্রুটির ফলে অনেক চাষী যৌথখামার ছেড়ে দেয়। কিন্তু পরে ভাল করে বোঝান ও অবশিষ্ট যৌথখামারীদের মনোবল আর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে এখন ছেড়ে চলে যাওয়াদের সিকি ভাগেরও বেশি লোক আবার ফিরে এসেছে। এখন আগে-কার চেয়ে আমরা আরো বল পেয়েছি। আমাদের খামারীদের জন্যে নতুন সব বাসা, একটা নতুন ভোজনশালা, আর একটা ইস্কুল তৈরি হচ্ছে।'

এই বিষয়েই আরো তথ্য জোগান সাইবেরিয়ার এক কৃষাণী। তিনি দশ বছর ধরে এক সমবায় খেতে কাজ করছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে একটি কথা মনে রাখতে বলেন, যৌথখামারের সঙ্গে নারী-উন্নতি-প্রচেষ্টার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। তিনি বলেন, আজকের মেয়েরা আগের চেয়ে অনেক সক্রিয়, আত্মনির্ভর-শীল, তাই পৃথক চাষীদের যৌথখামারে টেনে আনার বিরাট উদ্যোগে মেয়েদের মধ্যেও বিশেষ কাজের প্রয়োজন। মেয়েরা তাদের সাধারণ পশ্চাৎপরতার ফলে সফল ঐকত্রিকতার পথে সব উপায়েই বাধা দেয়। এখন আমরা মেয়ে যৌথ-খামারীরা বিশেষ দল তৈরি করেছি। তারা দেশের নানা গ্রাম অঞ্চলে ঘুরে মেয়েদের মধ্যে কাজ করে, তাদের উদ্বুদ্ধ করে, যৌথ শ্রমের অর্থ ও সাংস্কৃতিক সুবিধার কথা ওদের বুঝিয়ে দেয়। যৌথখামারী মেয়েদের জীবনযাত্রা ও কাজ

কেন্দ্রীয় কৃষিভবনে যৌথখামারী ও পৃথক কৃষকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

সহজ করে তোলা আর পুরুষ সঙ্গীদের সঙ্গে তাদের প্রকৃত সমান মর্যাদা দেওয়ার জন্য প্রত্যেক যৌথখামারে একটি করে শিশুপালনাগার, কিণ্ডারগার্টেন আর সাধারণ পাকশালা স্থাপিত হয়েছে।

ককেশাসে 'গিগান্ত' নামক একটি সুবিখ্যাত রাষ্ট্রীয় খামার আছে। সেখান-কার একজন চাষী যৌথীকরণের আদর্শ রূপায়ণের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, 'আমাদের এই খেতে জমির পরিমাণ এক লক্ষ হেকটার। গত বছর সেখানে তিন হাজার লোক কাজ করেছে। এ বছরে সংখ্যা কিছু কমবে, যদিও মাথাপিছু উৎপাদন আগেকার চেয়ে বাড়বে। তার কারণ হল জমিতে উন্নত কৃষি পদ্ধতির প্রয়োগ, যেমন বিজ্ঞানসম্মত সার দেওয়া, ট্র্যাকটর প্রভৃতি যন্ত্রের ব্যবহার। এখন আমাদের তিনশ'র বেশি ট্র্যাকটর আছে। আমাদেরও দিনে আট ঘণ্টা কাজ করার মেয়াদ। যারা তার বেশি কাজ করে তারা উপরি পারিশ্রমিক পায়। শীতের সময় সব চাষীদের জন্য যথেষ্ট কাজ থাকে না, তখন তাদের দুই-তৃতীয়াংশ খেত ছেড়ে বাড়ি তৈরি, রাস্তা মেরামত প্রভৃতি নানা কাজে শহরে চলে যায়। এই অনুপস্থিতির সময়েও তারা গ্রীষ্মকালীন বেতনের এক-তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকে আর তাদের পরিবারের লোকেরা তাদের নির্দিষ্ট ঘরে বাস করতে পারে।'

রবীন্দ্রনাথ : ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধে এখানে পৃথক চাষীর মত শুনতে চাই। এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের কারো কাছ থেকে আপন সম্পত্তির নীতি সম্বন্ধে মত আর ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে নিজের খেত মিলিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে কোন খেদ আছে কিনা তা জানতে চাই।

কমরেড ইয়েশুকেভ প্রস্তাব করলেন হাত তুলে জানান হোক কারা চাষী। দেখা গেল অধিকাংশেই চাষী। তাছাড়া জানা গেল তাঁদের ৫০%ই হয় যৌথ-খামারে নয় রাষ্ট্রখামারে কাজ করছেন।

বই বইয়ের ঠিকানা

চাষীদের কাছ থেকে এ প্রশ্নের জবাব পাবার আগে কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। কয়েকজন বললেন অশিক্ষার ফলে ব্যাপারটা তারা বুঝতে পারে না তাই এ বিষয়ে কোন মত গড়ে তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। অন্যেরা লজ্জা পেল, অস্বস্তি বোধ করল।

শেষকালে মধ্য এশিয়ার বাশকির প্রজাতন্ত্রের একজন যুবক বললেন। তিনি বললেন, 'আজও আমার নিজের স্বতন্ত্র খামার আছে। কিন্তু নিকটবর্তী ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে আমি শীঘ্রই যোগ দেব। কেননা দেখেছি, পৃথক প্রণালীর চেয়ে ঐকত্রিক প্রণালীতে ঢের ভালো জাতের এবং অধিক পরিমাণে ফসল ফলান যায়। আরো ভালোভাবে জমি চাষ করতে হলে ট্র্যাকটর চাই। আমাদের পক্ষে পৃথক-ভাবে ট্র্যাকটর কেনা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিজের নিজের টুকরো জমিতে ট্র্যাক-টরের ব্যবহার অসম্ভব। এইসব টুকরো জমিকে বড় ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে এক করেই আমরা সত্যিকার নতুন জীবন গড়ে তুলতে পারি।'

তারপর মস্কোর প্রায় ১৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত তাম্বভ অঞ্চলের এক কৃষাণী বললেন, 'যৌথখামারের জীবন যে স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে ভালো সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। আমার তো মনে হয় না এই পরিবর্তনে কেউ দুঃখ পায়।'

অন্য অনেকেই এই মত সমর্থন করলেন অর্থাৎ যে-কোনো জীবনের চেয়ে যৌথখামারের জীবনের শ্রেষ্ঠতা আর গুরুত্ব বেশি। একজন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমাদের আগেকার সেই ক্ষুদে ক্ষুদে নোংরা কুঁড়েঘরের বদলে এখন ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রের বড় বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর বাড়ি পেয়েছি—এই পরিবর্তনে কেউ কি কখনো অসুখী হতে পারে?'

রবীন্দ্রনাথ : কাল মঁশিয়ে কারাখানের* সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ হয়েছিল। তিনি বললেন মেয়েদের মুক্তি আর শিশুদের শিক্ষা ও মানুষ করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত গভর্নমেন্ট ও সোভিয়েত সামাজিক সংগঠনগুলির কাজে তিনি বিশেষ গর্ববোধ করেন। আমি তাঁকে বললুম, তোমরা পারিবারিক দায়িত্বকে সরকারি দায়িত্ব করে তুলে হয়তো পরিবারের সীমা লোপ করে দিতে চাও।

তিনি বললেন, 'সেটাই যে আমাদের আশু সংকল্প তা নয়—কিন্তু শিশুদের প্রতি দায়িত্বকে ব্যাপক করে নিয়ে যদি স্বভাবতই একদা পরিবারের গণ্ডী লোপ পায় তাহলে এই প্রমাণ হবে, সমাজে পারিবারিক যুগে সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতাবশতই নবযুগের প্রসারের মধ্যে আপনিই অন্তর্ধান করছে।' যা

---

* কারাখান, লেভ মিখাইলোভিচ (১৮৮৯-১৯৩৭)—সোভিয়েত কূটনীতিজ্ঞ, ১৯১৮ সাল থেকে পররাষ্ট্র গণকমিসারিয়েত কলেজিয়মের সদস্য ও উক্ত দপ্তরের গণকমিসারের সহকারী ছিলেন। ১৯২৩-২৭ সাল পর্যন্ত চীনে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। চীন থেকে ফিরে এসে আবার পূর্বোক্ত গণকমিসারের সহকারী হন।

হোক, এ সম্বন্ধে আপনাদের কী মত জানতে ইচ্ছে করি। আপনারা কি মনে করেন যে, আপনাদের একত্রীকরণের নীতি বজায় রেখে পরিবার বজায় থাকতে পারে।

উক্রেনের সেই যুবক চাষী সেমেনচেংকো বললেন, 'নতুন সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক জীবন নষ্ট হচ্ছে বা ভবিষ্যতে নষ্ট হবে কি না তা বোঝা যাবে আমার কথা থেকে। আমার বাবা যখন বেঁচে ছিলেন শীতের ছয় মাস তিনি সহরে কাজ করতেন আর গরমের ছয় মাস ভাইবোনদের সঙ্গে আমায় ধনী চাষীর চাকরি নিয়ে পশুচারণে যেতে হত। বাবার সঙ্গে আমাদের দেখা প্রায়ই হত না। এখন রোজই কিণ্ডারগার্টেন থেকে আমার ছেলে ফিরে এলে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়, আমাদের মধ্যে খুবই ভাব।'

একটি কৃষাণী বললেন, শিশুপালনাগার আর শিশুবিদ্যালয় চালু হবার ফলে স্বামী স্ত্রীতে আরো ভালো বোঝাপড়া আর সুখের সম্বন্ধ গড়ে ওঠায় সহায়তা করা হয়েছে। বাপমায়ের মনে শিশুদের প্রতি তাঁদের গভীর দায়িত্ববোধ আর কর্তব্যজ্ঞান আরো বেড়েছে।

তারপর একটি ককেশীয় যুবতী গভীর আবেগ আর উৎসাহের সঙ্গে বললেন। গত চারটি বছর বাদ দিলে মেয়েটির বাকি জীবনটা ককেশীয় পাহাড়ের এক ছোট্ট গাঁয়ে কাটে। মহিলা দোভাষীকে বললেন, 'মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলুন, আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের মেয়েরা, বিশেষত ট্রান্স-ককেশীয় প্রজাতন্ত্রগুলির মেয়েরা অনুভব করি যে অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে আমরা যথার্থ স্বাধীনতা এবং সুখ পেয়েছি। বিপ্লবপূর্ববর্তী অন্ধকার যুগ এখন দূর অতীতের ব্যাপার। আমরা নতুন জীবন গড়ছি, আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সব বুঝেই সে জীবনে আমরা সম্পূর্ণরূপে যোগ দিচ্ছি। তার জন্য চূড়ান্ত রকমের আত্মত্যাগ স্বীকার করতে আমরা রাজী। মহাকবিকে জানান, সোভিয়েত ইউনিয়নের নানা জাতির লোকেরা তাঁর মারফত ভারতবাসীদের আন্তরিক প্রীতি ও তাদের এই দুঃসময়ে আন্তরিক দরদ জানাতে চায়।'

রবীন্দ্রনাথ : আমাদের জনসাধারণ এখনো অজ্ঞ, আমাদের মেয়েরা অসহায়, মানব সমাজে নিজের স্থান পেতে হলে তাদের নবযুগের আলোর প্রয়োজন।

ককেশীয় যুবতীটি বললেন : 'যদি সম্ভব হত আমার ঘরদুয়োর, আমার ছেলেপুলে, সব ছেড়ে আপনার স্বদেশীয়দের মাঝখানে কাজ করে তাদের সাহায্য করতে যেতুম।'

রবীন্দ্রনাথ : বাঁদিকে বসে আছেন, মঙ্গোলীয় ছাঁদের মুখ যুবকটি কে?

দোভাষী : উনি হলেন কিরঘিজ প্রজাতন্ত্রের এক যৌথচাষীর ছেলে? মস্কোয় এসেছেন উক্ত হস্তশিল্প টেকনিকুমে পড়তে। তিন বছর বাদে এঞ্জিনিয়র হয়ে তাঁর প্রজাতন্ত্রে ফিরে যাবেন। বিপ্লবের পরে সেখানে একটি বড়ো কারখানা স্থাপিত হয়েছে, সেইখানে তিনি কাজ করবেন।

বই বইয়ের ঠিকানা

কেন্দ্রীয় কৃষি ভবনের পরিদর্শক সভা সমাপ্তি ঘোষণা করে বলেন, 'কবির সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের তাৎপর্য অত্যন্ত বিরাট। আমাদের দেশে এমন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সংস্কৃতির জগতের এমন বিখ্যাত কর্মীর আগমন—ভারত আর সোভিয়েত ইউনিয়নের মেহনতী মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসাধনে এক নতুন বিরাট পদক্ষেপ। আমাদের আশা, ইতিহাসে প্রথম মজুর ও চাষীদের প্রজাতন্ত্রের মজুর চাষীরা যা-কিছু করছেন, যা-কিছু করার চেষ্টা করছেন সে বিষয়ে ভারতে সত্য ও নিরপেক্ষ তথ্য প্রচারে কবি সাহায্য করবেন।' (অনেকক্ষণ ধরে হাততালি পড়ে, 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাওয়া হয়)।

ওকৃসের সভাপতি ফ. ন. পেত্রভের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপের স্টেনো-রিপোর্ট

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০

পেত্রভ : আমি আমাদের কাজ, নতুন বৈপ্লবিক গঠনের কাজ সম্বন্ধে বলতে চাই—আপনি এবিষয়ে কৌতূহলী তা জেনে সুখী হলাম। আপনার মধ্যে আমরা এমন এক অতিথিকে দেখেছি যিনি নতুন ও উত্তম ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য আমাদের মেহনতী জনগণের বিপুল কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হতে উৎসুক।

রবীন্দ্রনাথ : আপনারা যে শুধু নিজেদের সমস্যার সমাধান করছেন তা নয়, আপনারা সমগ্রভাবে জগৎ সমস্যার কথাই ভাবছেন, আর সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই নিজেদের গঠন কর্মে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। আমার কাছে এর মূল্যই সবচেয়ে বেশি। এতে প্রচণ্ড সাহসের দরকার, এর তাৎপর্য বৃহৎ।

পেত্রভ : আমরা যে বিশ্বসমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত থাকব, সেটা আমার মতে খুবই স্বাভাবিক। সোভিয়েত ইউনিয়নে নানা জাতি অধিজাতির বাস। আগে তাঁরা ছিলেন উৎপীড়িত। নিজেদের জাতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ তাঁরা ঘটাতে পারেন নি। বিপ্লব এইসব জাতি অধিজাতিকে মুক্তি এনে দেয় ও স্বভাবতই তাঁদের বিকাশ ও প্রগতিতে বিরাট উদ্দীপনা যোগায়। আমাদের বিপ্লবের মধ্যে একটি জিনিস আছে যা আমার মতে মানুষের আত্মার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ—স্বাধীনতা ও পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা। এ জিনিসটা সব জাতিকেই চুম্বকের মতো টানে। তাঁরা আমাদের প্রচেষ্টায় আমাদের অগ্রগতিতে আগ্রহী কারণ সব জাতির জীবনের পক্ষেই এই আন্দোলনের একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ : আমার কৌতূহলের প্রধান বিষয় হল লোকশিক্ষা। আপনারা ব্যবস্থার বদল ঘটিয়েছেন, এ ঘটনা এখনই তেমন কিছু প্রত্যক্ষ ফল দিতে পারে না। কিন্তু এই প্রথম সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া, এককালের শোষিত

উৎপীড়িত জনসাধারণের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে কাজে লাগান—এ আপনাদের বিরাট কীর্তি। এ কীর্তি সবচেয়ে ভালো ফল না দিয়ে পারে না, জগৎটাকে আরো নিখুঁত করে তোলার সুযোগ তা দেবেই।

পেত্রভ : সব রকম আর্থনীতিক পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ ফল হল শিক্ষা, সংস্কৃতি। আমরা যে নতুন আর্থনীতিক অবস্থার দিকে চলেছি তা শিক্ষা, সংস্কৃতি আর মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্যই। যে আর্থনীতিক ব্যবস্থায় অধিকাংশ মানুষ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যোগ দিতে পারে, সেটিই ভাল ব্যবস্থা। তাই একথা আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের সবচেয়ে বড় কীর্তি হল, আর্থনীতিক ব্যবস্থার বদল ঘটিয়ে এমন একটা কাঠামো গড়া যেখানে প্রতিটি মানুষ লাভ করতে পারবে সবচেয়ে বেশি সাংস্কৃতিক কল্যাণ, সবচেয়ে বেশি করে পাবে তাই যার উপর তার নিঃসন্দেহ অধিকার। আর্থনীতিক বিকাশের পাশাপাশি আমাদের এখানে শিক্ষা বিস্তারের কাজ চলছে। আমাদের তাই আর্থনীতিক ভিত্তির বিকাশ ঘটিয়ে প্রতিটি মেহনতী মানুষকে সর্বোত্তম আর্থনীতিক কল্যাণ লাভের সুযোগ দিতে হবে। এইভাবে খুলে দিতে হবে সাংস্কৃতিক বিকাশ ও শিক্ষার পথ। আর্থনীতিক ব্যবস্থার বদল ঘটানর ফলেই আমরা বারো বছরে সাক্ষরের সংখ্যাকে ৩০% থেকে ৬৫%-এ তুলতে পেরেছি। স্বৈরাচারের দু'শ বছরে যতটুকু শিক্ষাপ্রসার হয়েছে এই দশ বছরেই হয়েছে তার চেয়েও বেশি।

রবীন্দ্রনাথ : আপনি কি মনে করেন লোকশিক্ষার এই প্রসার কেবল আর্থনীতিক পরিবর্তনের ফলেই ঘটেছে?

পেত্রভ : তা বৈকি। তা না হলে আমাদের এই লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে কী ভাবে শিক্ষা দেওয়া যেত, তা জানি না। বিরাট জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ইস্কুলের পড়া আর ইস্কুল ছাড়া লোকশিক্ষার মধ্যে দিয়ে—আমাদের দেশে তাকে বলে রাজনৈতিক শিক্ষা। জনগণ সব আর্থনীতিক কল্যাণের অধিকারী হতে পেরেছেন বলেই আমাদের সমাজতান্ত্রিক গঠনের মহান কর্তব্য সমাধায় পা বাড়াতে পারা গেল—নতুন সংস্কৃতিসম্পন্ন স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গড়া, এমন ব্যক্তিত্ব যা ঐতিহাসিক বিকাশের পথকে সোজা পরিচালিত করতে পারে মানবজাতির অস্তিত্বের এক অজ্ঞাতপূর্ব অন্য রূপে যা আমাদের মতে উন্নততর।

রবীন্দ্রনাথ : আপনাদের অবস্থায় সাধারণজনের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের আগে যে (অর্থনীতির) প্রচলিত রূপকে ভেঙে দেওয়া দরকার ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু জারের রাশিয়ায় জনশিক্ষা (Public education) থেকে জনসাধারণ যত দূরে ছিলেন অন্য অনেক দেশে তেমন হয়নি। ইংলণ্ড আর জার্মানীতেও জনসাধারণ জনশিক্ষার ফল পেয়েছেন কিন্তু শোষণ, আর ধনতন্ত্রী উৎপাদনের প্রধান প্রধান ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বড় বড় শিল্পকেন্দ্রগুলিতে সম্পদের স্বাভাবিক সংহতি বরবাদ করা হয়নি। সেখানেও সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রসার সম্ভব, সম্ভব শিক্ষার ভিত্তিতে ব্যক্তির অন্তরের মুক্তিসাধন। আমার মতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের আমাদের যে সমস্যা—সেটা আভ্যন্তরিক।

বই বইয়ের ঠিকানা

জনসাধারণ যখন শিক্ষিত হবেন, আত্মশক্তি লাভ করবেন, তখন জনশিক্ষা আর শাসন পদ্ধতির আমূল সংশোধন ঘটাতে পারবেন। বর্তমান অবস্থায় এটি জনশিক্ষা প্রসারে কিছুটা বাধা।

আমি রাশিয়ায় এসেছি শিখতে; আপনাদের লোকশিক্ষা ব্যবস্থা, জনসাধারণের জন্য সংস্কৃতির ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেওয়ার কাজ, ব্যক্তিত্বের মুক্তি-সাধন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে, কারণ আমি মনে করি স্বাধীনতার স্ফুলিঙ্গটুকুও, ব্যক্তিত্বের মুক্তির সামান্যতম বিকাশও ভাবীকালের পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আজ যদি আমরা অল্প কিছুও করতে পারি, একটি ছোট ক্ষেত্রে যদি আমাদের প্রচেষ্টা সংহত হয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেই স্ফুলিঙ্গ ভবিষ্যতে সোশিয়ালিজমে বিকাশ পাবে।

পেত্রভ : ভারতীয় প্রশ্নে আমি বিশেষজ্ঞ নই, আমার প্রধান কর্মক্ষেত্র হল প্রকৃতিবিজ্ঞান। তাই ভারতীয় জনগণের সাংস্কৃতিক বিকাশের বিস্তারিত বিচারে অক্ষম। কিন্তু একথা বলবই, ভারতে এখন যে মুক্তি আন্দোলন চলছে আমি তা গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ করে চলেছি। যে সব সুফলের কথা বললেন অর্থাৎ জনগণের পক্ষে সংস্কৃতি ও শিক্ষার নিকটবর্তী হওয়ার সম্ভাবনা, এই আন্দোলন নিঃসন্দেহে তা এনে দেবে। সব জনগণ ও জাতির শিক্ষা পাওয়া উচিত—এই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু ব্যাপক জনগণকে শিক্ষা ও তাঁদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিতে হলে বাইরের অনুকূল আর্থনীতিক অবস্থা গড়া চাই। তাই ইংলণ্ড আর জার্মানীর মেহনতী শ্রেণীর শিক্ষার গড়পড়তা মান উচ্চতর হলেও একথা বলা যাবে না যে ইংলণ্ড আর জার্মানীর প্রলেতারিয়েত উচ্চ সাংস্কৃতিক কীর্তি উপভোগের বেশি সুযোগ পান। ঐ সব দেশের মেহনতীদের আন্দোলন লক্ষ করে আর তা নিয়ে পড়াশুনো করে দেখেছি ধনতন্ত্রী ব্যবস্থার জন্য আর উৎপাদনের প্রধান উপায়গুলোয় তাঁদের মালিকানা না থাকায় মেহনতীরা সংস্কৃতির প্রকৃত উচ্চ মানে উঠতে পারেন না। তাই আমাদের মতে, প্রত্যেক দেশকেই একটা পর্যায় পার হতে হবে। সেই পর্যায়ে পুরনো আর্থনীতিক ব্যবস্থার জায়গায় এমন একটা নতুন, সোশিয়ালিস্ট আর্থনীতিক ব্যবস্থা দেখা দেওয়া চাই—মেহনতীদের ব্যাপক জনগণ যাতে সংস্কৃতির সব আশীষ লাভে সক্ষম হন, মানব ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়। সব ঐতিহাসিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হল মানব ব্যক্তিত্বের বিকাশ, পশু-পূর্বপুরুষদের ছাড়িয়ে মানুষের যতদূর সম্ভব প্রগতি ঘটান। মানুষের মধ্যে আজও বহু পাশবিকতা রয়েছে। বস্তুশিল্পের অবস্থার যত উন্নতি ঘটবে মানব ব্যক্তিত্ব ততই উন্নত ও এই সব পাশবিকতামুক্ত হবে। এই সব কথা বললাম, সোভিয়েত রাশিয়ায় আমরা যে ভাব ও আদর্শগত প্রচেষ্টায় মেতে উঠেছি সেটিকে পরিষ্কার করে তোলার জন্য, এর ভিত্তিতেই আমরা আমাদের জনগণের সমৃদ্ধির সমস্যা যতদূর সম্ভব দ্রুত সমাধান করছি। এই সমস্যা আমরা নিজেদের জন্য সমাধান করছি। অন্য যে সব জাতি তা সমাধানে সচেষ্ট

তাঁদের প্রতি বলাই বাহুল্য আমাদের সহানুভূতি রয়েছে। আমরা মনে করি মানবজাতি এই মুহূর্তে এক মহান ঐতিহাসিক পর্বের মধ্যে দিয়ে চলেছে। সব জাতি এখন জয় করে নিতে চাইছেন জীবনে তাঁদের অধিকার, মুক্ত জীবনে সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার—মানবজাতির পক্ষে যা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই ঐতিহাসিক বিকাশের ফলেই আমাদের মেহনতী জনগণ গভীর দরদ ও কৌতূহল নিয়ে ভারতে কী ঘটছে তা লক্ষ্য করে দেখছেন।

রবীন্দ্রনাথ : আমার ব্রত হল জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, একেই আমার কর্তব্য বলে জানি, হয়ত একাজ করার মতো সময়ের পুঁজি আমার হাতে আর নেই। তাই আপনাদের ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে চাই, দেখতে চাই তার কতটা আমার দেশে কাজে লাগাতে পারা যায়, কারণ যারা অসহায়, যাদের সহায়তা সাধনে আমি সক্ষম, তাদের সাহায্য করাটা আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

পেত্রভ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুধু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই নয় ব্যাপক জনসমাজেই অত্যন্ত সুপরিচিত। আপনার সব বইই রুশ ভাষায় বেরিয়েছে। গতকাল আপনার পূর্ণ গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখি ১৯২৫, ১৯২৬, ১৯২৭ সালে প্রকাশিত রচনাবলীও এর মধ্যেই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। জনগণের মধ্যে ব্যাপক বিস্তারের ফলে তাদের এখন কেবল পুরনো বইয়ের দোকানে পাওয়াই সম্ভব। এতেই বুঝবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলীতে এখানে লোকের কী আগ্রহ। এ থেকেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখায় যে-সব আইডিয়া ও চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন আমরা সে-সবের প্রতিই মনোযোগ দিই, এমন মহাপুরুষের মূল্য ও প্রয়োজন আমরা পুরোপুরির বুঝি। আমাদের নানা সাংস্কৃতিক ও আর্থনীতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে আমি তাঁর যে অতি সামান্য সেবার সুযোগ পেয়েছি তাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত আনন্দিত। এই ক্ষেত্রে আপনার অভিলাষের প্রতি আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। আমরা তা পূরণে সচেষ্ট থাকব।

রবীন্দ্রনাথ : দুঃখের বিষয় আমি খুব বেশি দেখে উঠতে পারব না। আপনাদের ভাষা আমি জানিনে। তাই আপনারা যা দেখাবেন তা নিয়ে লেগে থাকা, লিখিতাকারে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা সম্ভব হবে না। ইংরেজীতে আপনাদের লোকশিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত কোন বই পেলে খুবই খুশি হব।

পেত্রভ : দুর্ভাগ্যবশত ইংরেজীতে কোন প্রকাশ ব্যবস্থা আমাদের নেই। অবশ্য আমাদের বন্ধুদের ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকায় শিক্ষা বিষয়ে নানারকমের যেসব প্রবন্ধ বেরয় সেগুলো সংগ্রহ করা যেতে পারে। ইংরেজীতে যা বেরয় তা সংগ্রহ করার জন্য খুবই চেষ্টা করব, তবে আমাদের মূল পাঠ্যপুস্তক সবই রুশ ভাষায়।

অত্যন্ত দুঃখের কথা আমাদের শিক্ষাবিষয়ক প্রদর্শনী মাত্র দুসপ্তাহ আগে শেষ হয়ে গেল। লেনিনগ্রাদের এই সারা ইউনিয়ন শিক্ষাবিষয়ক প্রদর্শনীতে

বই বইয়ের ঠিকানা

আমাদের লোকশিক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয়। প্রদর্শনীটির অনেক ছবি তোলা হয়েছে। এবিষয়ে কিছু ধারণা দিতে পারে এমন সব ছবি দিতে পারব। তাছাড়া মস্কোয় যে লোকশিক্ষা প্রদর্শনীটি রয়েছে, সেটিও দ্রষ্টব্য। লোকশিক্ষা সংক্রান্ত আমাদের অনেক রিপোর্ট অনুবাদ করাও সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৃতজ্ঞতা জানান।

পেত্রভ : আজ সন্ধ্যায় ভবনে আপনার জন্য যে জলসার ব্যবস্থা করেছে আশা করি সেখানে আবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দ পাব।

ট্রেড ইউনিয়ন ভবনে রবীন্দ্রনাথের সম্মানে জলসায় ক. ন. পেত্রভের বক্তৃতার স্টেনো-রিপোর্ট

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০

কমরেডগণ,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সোভিয়েত সমাজে আর সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপক মেহনতী জনগণের কাছে সুপরিচিত। গীতিকবিতার এই কবির নাম আমরা ভাল করেই জানি। এই গীতিকাব্য আবেগের মাধ্যমে রূপ দেয় তাঁর সুসংহত, ধ্যানমগ্ন ভিতরের জগৎটিকে। সমাজসচেতন কবি রবীন্দ্রনাথ, যিনি জাতীয় স্বাধীনতার আদর্শ গঠনে তাঁর জাতির আশাআকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেন তাঁর কথা আমরা খুব কমই জানি। আপনাদের কাছে আজ যে সব রচনাবলী তুলে ধরা হবে তাতে ভারতীয়দের আদর্শকে রূপ দিচ্ছেন যে কবি, তাঁর পরিচয় পাবেন।

রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের কালে আমরা এই মহাপুরুষের, এই বিরাট স্রষ্টার আরো দুটি কর্মক্ষেত্রের পরিচয় পেয়েছি। খুব কম লোকই জানে যে রবীন্দ্রনাথ কাব্যে তাঁর আদর্শের কথা প্রকাশ করেই থেমে যান নি। সুসমন্বিত পূর্ণ মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ার আদর্শকে বাস্তবে সম্ভব করারও চেষ্টা করেছেন। কলিকাতার কাছে তাঁর যে অনন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেখানে তিনি একটি বিরাট সমস্যার সমাধানে রত—নতুন সুসমন্বিত মানুষ গড়া, এমন মানুষ মনীষার উচ্চগুণ আর শ্রমের মধ্যে মিল ঘটানর যার ক্ষমতা আছে।

আমাদের সঙ্গে আলাপে দুঃখ জানিয়ে কবি বলেছেন যে এই সমস্যার সমাধান ভারতে হয় নি। অক্টোবর বিপ্লব সোভিয়েত ইউনিয়নের মেহনতী জনগণের কাছে এক নতুন সমাজাদর্শ, নতুন আর্থনীতিক ব্যবস্থা এনে দিয়েছে। নতুন সুসমন্বিত পূর্ণ মানুষ গড়ার কর্তব্য তুলে ধরেছে।

সমাজ বিপ্লবের এই সব আদর্শই আমাদের শিক্ষাবিদদের পরিচালিত

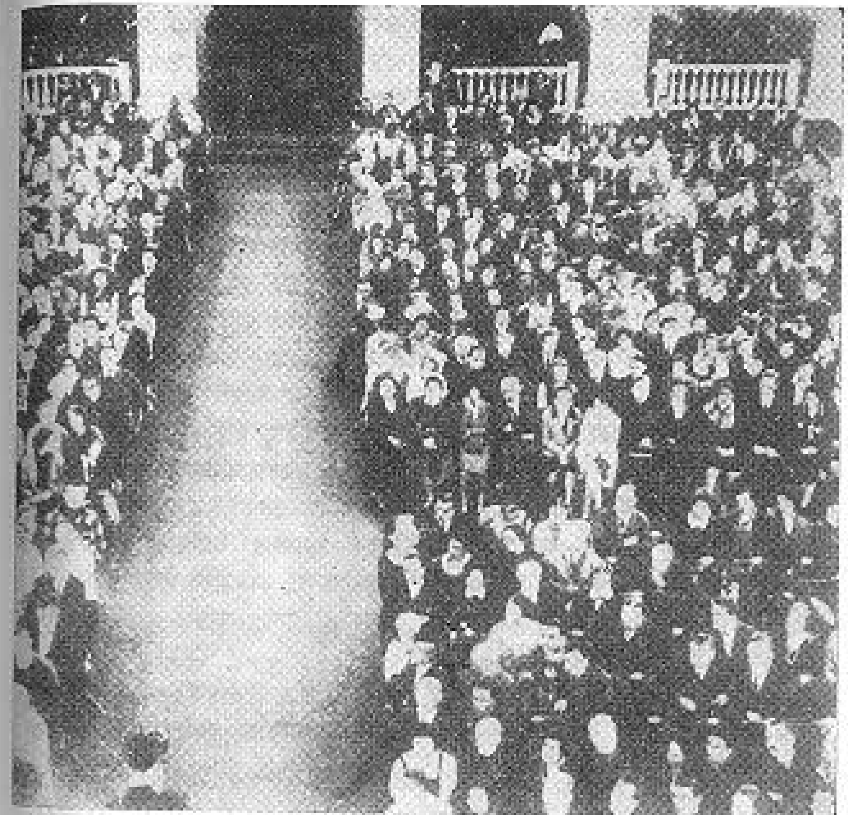

রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা সভার একটি দৃশ্য

করছে, আর কবিকে আমাদের দেশের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। কবি আমাদের এখানে এসেছেন নতুন অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের মধ্যে দিয়ে আমরা এই সমস্যার কী ভাবে সমাধান ঘটাচ্ছি তা দেখতে। কবি তাঁর বিশ্ববীক্ষা, তাঁর বিশ্ববোধ শুধু কাব্যিক সুষমার সমস্যা সমাধানের মাধ্যমেই প্রকাশ করেন নি। তাঁর অত্যন্ত সুন্দর শিল্পে, ছবিতে আলো ছায়ার রূপ গড়ে তিনি সব ভাষার লোকের কাছেই সুবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য তাঁর বিশ্ববীক্ষা, বিশ্ববোধ ও অনুভূতির এক প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তাঁর চিত্রকলা শুধু মনস্তত্ত্বের দিক দিয়েই কৌতূহলজনক। একথায় আমরা বিস্মিত হয়েছি। কারণ তাঁর চিত্রকলায় কবি যে তাৎপর্য আরোপ করেছেন শুধু সেটুকুই নেই। নিঃসন্দেহে তা হল উঁচু দরের শিল্পগুণ, শিল্পনৈপুণ্যের ফল।

আমাদের দেশে আজ এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর ও লোকশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক বাস্তব কর্মীকে দেখতে পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে আমাদের দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত

বই বইয়ের ঠিকানা

করেছেন, আমাদের কাছে এসেছেন জানতে কী ভাবে আমরা নতুন সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার, মানুষের ব্যক্তিত্বকে নিয়ে সুষম বিকাশ ও প্রগতির দিকে যাওয়ার সমস্যার সমাধান করছি—এর মূল্য অসীম। আমরা আনন্দিত যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবার নিশ্চিত বুঝতে পারবেন যে বিদেশে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন, গঠনকার্য সম্বন্ধে যে সব গুজব আর খবর ছড়ান হয়, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, অসত্য—সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে, সৃষ্টিকর্মের বিকাশের পথে আমাদের মহান প্রচেষ্টা ও কাজের স্বরূপ তাতে কণামাত্রও প্রতিফলিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের মতো খোলা মন ও অকলুষ হৃদয় মানুষের এখানে এসে আমাদের কাজ দেখে যাওয়ার মূল্য আমাদের কাছে খুবই বেশি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরাট মনীষার ফলে এদেশে যা ঘটছে তার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছেন। আমাদের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য পূর্ণ হয়ে উঠছে যে মহান সৃষ্টিকর্মের দ্বারা তার মর্মটিকে বাইরের আবরণ, বাইরের ত্রুটি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির আড়ালে রাখে নি। আশা করি আমাদের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের এই মূল কথাটা তিনি ধরতে পেরেছেন যে একাজ হল, প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের মাধ্যমে আর্থনীতিক সমস্যার সমাধান, তার লক্ষ্য হল, সমবেত জীবনের আরো নিখুঁত রূপ গড়ে তোলা, মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন, কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে আদর্শ রূপায়ণে সচেষ্ট তার রূপায়ণ সম্ভব একমাত্র এই পথেই।

আমাদের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পমণ্ডলী এবং সমগ্র সোভিয়েত সমাজের তরফ থেকে আমাদের প্রিয় অতিথি, মহান কবি ও চিন্তাবীর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অভিনন্দন জানাই।

ট্রেড ইউনিয়ন ভবনে তাঁর সম্মানে অনুষ্ঠিত জলসায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার স্টেনো-রিপোর্ট

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০

আজকের সভায় আমার আমন্ত্রণ পেয়ে আমি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। ডাঃ পেত্রভ আমার বিষয়ে যে প্রশংসাবাণী বলেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই দেশকে জানার এবং এখানে জনসাধারণ যে বিরাট কাজ করছেন তার পরিচয় লাভের সুযোগ দানের জন্য আমি এই দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানাই। আমার জীবনের ব্রত হল শিক্ষা। আমার বিশ্বাস, সব সমস্যার, মানব সমস্যার মৌলিক সমাধান মেলে শিক্ষায়। কবি হিসেবে আমার যে কাজ

তার উপরেও নিজের সাধ্যমত আমার জনগণকে শিক্ষা দেবার এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আমি জানি আমার দেশ যত অমঙ্গলে উৎপীড়িত তার প্রধান কারণ হল জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার অভাব।

আমাদের দারিদ্র্য, মহামারী, সাম্প্রদায়িক বিরোধ আর যন্ত্রশিল্পে আমাদের পশ্চাৎপরতা, অর্থাৎ যা কিছু আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে সে সবই শুধু শিক্ষার অভাবের ফল। সেই কারণেই আমার বৃদ্ধ বয়স ও দুর্বল শরীর সত্ত্বেও আপনারা শিক্ষার বিরাট সমস্যাকে কীভাবে দূর করছেন তা দেখার আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করেছি। আপনারা এই দেশে যে বিরাট সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন তা আমি দেখেছি, তাকে বাহবা জানিয়েছি, এবং ঈর্ষা বোধ করেছি। আপনারা জানেন ভারতবর্ষে আমাদের অবস্থার সঙ্গে এদেশে আপনাদের অবস্থার খুবই মিল রয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষ কৃষিজীবী। এদেশে আপনাদের যে সাহায্য ও উৎসাহের প্রয়োজন ছিল ভারতীয়দেরও তাই প্রয়োজন। সম্পূর্ণরূপে কৃষির উপর নির্ভর করে এই বেঁচে থাকাটা যে কী সংকটজনক তা আপনারা জানেন। জানেন কৃষকদের পক্ষে জীবনের বর্ধিত দাবী মেটানর জন্য শিক্ষা ও ফসল উৎপাদনের হাল আমলী পদ্ধতির জ্ঞান কী একান্ত প্রয়োজনীয়।

আমাদের দেশের লোক নিত্য দুর্ভিক্ষের মুখে রয়েছেন। নিজেদের মনুষ্যত্বে তাঁদের বিশ্বাস ভরসা নেই বলে তাঁরা এর কোন প্রতিকার জানেন না। এই বিরাট জনসমষ্টির এ হল বৃহত্তম দুর্ভাগ্য, গভীর অজ্ঞতা আর অসহায়তার ভারে পীড়িত তিরিশ কোটি নরনারী।

তাই আমি এদেশে এসেছি দেখতে এই সমস্যাকে কীভাবে আপনারা দূর করছেন, কেমন করে আপনারা লড়াই করেছেন এদেশের মজুর ও চাষীদের মধ্যে অজ্ঞানের উৎস, কুসংস্কার আর অনীহার বিরুদ্ধে। যেটুকু দেখলুম তাতে দৃঢ় বিশ্বাস হল, আপনারা অপূর্ব প্রগতি সাধন করেছেন, অত্যাশ্চর্যকে সম্ভব করেছেন। আমরা অজ্ঞান ও অক্ষমতার নিবিড় ছায়ায় পড়ে আছি, আমাদের পক্ষে তাই বোঝা কঠিন এত অল্প সময়ে আপনাদের জনসাধারণের মনের বদল কী করে ঘটান গেল। একথা জেনে খুবই আনন্দ পেলুম, যে-জনগণ সমাজ-জীবনের ভিত্তি, সে-জনগণ তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত নয়, সোশিয়ালিস্ট সমাজের সব সুখ-সুবিধারই তাঁরা সমান অংশীদার।

আমি স্বপ্ন দেখি সেই দিনটির যেদিন আর্যসভ্যতার ঐ প্রাচীন ভূমির সব মানুষ শিক্ষা ও সাম্যের মহাশীর্বাদ লাভ করবেন। আমার বহুদিনের স্বপ্ন, যুগ যুগ ধরে শৃঙ্খলিত গণমানসমুক্তির স্বপ্নের বাস্তবরূপ দেখতে আমায় যাঁরা সাহায্য করলেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

আমার রচিত মূল বাংলা কবিতার ছন্দ ও ধ্বনির সঙ্গে আপনাদের পরিচিত করিয়ে দেওয়ার কথা আমায় বলা হয়েছে। আমার সব ইংরেজী অনুবাদই সহজ

বই বইয়ের ঠিকানা

গদ্যে করা। মূল কবিতাগুলি কিন্তু রচিত ছন্দে, আজকের শ্রোতারা হয়ত তাতে কৌতূহল অনুভব করতে পারেন।

প্রথম যে কবিতাটি পড়ব সেটি বর্ষার আবির্ভাব নিয়ে। আপনারা জানেন আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে বর্ষার প্রথম মেঘ মানুষের মনে গভীর আনন্দ সঞ্চারিত করে। আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত মেঘে ঢেকে যায়, আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে এক হৃদয় থেকে আরেক হৃদয়ে, এক গাঁ থেকে আরেক গাঁয়ে। গ্রীষ্মের শুষ্কতার পর বর্ষার প্রথম দূতকে দেখে কবির মনে যে আনন্দ জেগে-ছিল তার বর্ণনা রয়েছে কবিতাটিতে। কবি বলছেন তাঁর হৃদয় ময়ূরের মতো পেখম মেলে নেচে উঠেছে।

দ্বিতীয় কবিতাটি প্রেমের। তাতে একটি নারী জিজ্ঞেস করছে তার প্রণয়ীকে, তার রূপের প্রশংসায় প্রণয়ী যা বলছে সে সবই কি সত্য। সে বার-বারই জিজ্ঞেস করছে এ কি সবই সত্য। এই হল বিষয়টা।

মার্কিন সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ সম্বন্ধে 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ

৪ঠা নভেম্বর ১৯৩০

মার্কিন পত্রিকা 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্'এর প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবার আগে তাঁর মনে যে সংশয় ও সন্দেহ ছিল তা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের পর দূর হয়েছে। তাঁর মনে বিশেষ রেখাপাত করেছে সোভিয়েত ইউনিয়নে লোকশিক্ষা বিকাশের কার্যসূচী আর সাংস্কৃতিক জীবনে জনগণের ব্যাপক যোগদান। রবীন্দ্রনাথ এও বলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতিগত শত্রুতা লোপ পেয়েছে এবং সোভিয়েত ইউ-নিয়নের নানা জাতি গভীর শান্তিতে মিলেমিশে বাস করে।

বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের সারা ইউনিয়ন সমিতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে যে চিঠি পেয়েছে, তাতে তিনি মস্কোয় তাঁর সংবর্ধনার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখেছেন :

'আপনাদের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ এবং বিশেষ করে আপনাদের সহরের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় গ্রহণ আমার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটি।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একথাও জানিয়েছেন যে তিনি তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের বিষয়ে লিখছেন এবং সে লেখা ইংরেজীতে অনুবাদ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভক্সে তার পাণ্ডুলিপি অবশ্যই পাঠাবেন।

রাশিয়ার চিঠি

(নির্বাচিত অংশ)

বই বইয়ের ঠিকানা

রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।

চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন ; তাদের মানুষ হবার সময় নেই ; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে, কম পরে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে ; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবনযাত্রার জন্য যত-কিছু সুযোগসুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

আমি অনেক দিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোনো উপায় নেই। এক দল তলায় না থাকলে আর একদল উপরে থাকতেই পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না ; কেবলমাত্র জীবিকানির্বাহ করার জন্যে তো মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। মানুষের সভ্যতায় এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। তাই ভাবতুম, যে-সব মানুষ, শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর-মনের গতিকে নীচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সুখসুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।

মুশকিল এই, দয়া করে কোনো স্থায়ী জিনিস করা চলে না ; বাইরে থেকে উপকার করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে। সমান হতে পারলে তবেই সত্যকার সহায়তা করা সম্ভব হয়। যাই হোক, আমি ভালো করে কিছুই ভেবে পাই নি—অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে, এ কথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে।

ভেবে দেখো-না, নিরন্ন ভারতবর্ষের অন্নে ইংলণ্ড পরিপুষ্ট হয়েছে। ইংলণ্ডের অনেক লোকেরই মনের ভাব এই যে, ইংলণ্ডকে চিরদিন পোষণ করাই ভারতবর্ষের সার্থকতা। ইংলণ্ড বড়ো হয়ে উঠে মানবসমাজে বড়ো কাজ করছে,

বই বইয়ের ঠিকানা

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে চিরকালের মতো একটা জাতিকে দাসত্বে বদ্ধ করে রেখে দিলে দোষ নেই। এই জাতি যদি কম খায়, কম পরে, তাতে কী যায় আসে। তবুও দয়া করে তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি করা উচিত, এমন কথা তাদের মনে জাগে। কিন্তু একশো বছর হয়ে গেল, না পেলুম শিক্ষা, না পেলুম স্বাস্থ্য, না পেলুম সম্পদ।

প্রত্যেক সমাজের নিজের ভিতরেও এই একই কথা। যে মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না সে মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম। অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়। রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলছে। তার শেষ ফলের কথা এখনও বিচার করবার সময় হয় নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে পড়ছে তা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। আমাদের সকল সমস্যার সব চেয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত—ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষ যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এজন্যে কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম। শুধু শ্বেত রাশিয়ার জন্যে নয়—মধ্য-এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে—সায়েন্সের শেষ ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই। এখানে থিয়েটারে অভিনয়ে বিষম ভিড়, কিন্তু যারা দেখছে তারা কৃষি ও কর্মীদের দলের। কোথাও এদের অপমান নেই। ইতিমধ্যে এদের যে দুই-একটা প্রতিষ্ঠান দেখলুম সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি এদের চিত্তের জাগরণ এবং আত্মমর্যাদার আনন্দ। আমাদের দেশের জনসাধারণের তো কথাই নেই—ইংলণ্ডের মজুর-শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করলে আকাশ-পাতাল তফাত দেখা যায়। আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে। আমাদের কর্মীরা যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা করে যেতে পারত তাহলে ভারি উপকার হত। প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি কী হয়েছে আর কী হতে পারত। আমার আমেরিকান সঙ্গী ডাক্তার হ্যারি টিম্বর্স্ এখানকার স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা আলোচনা করছে—তার প্রকৃষ্টতা দেখলে চমক লাগে—আর কোথায় পড়ে আছে রোগতপ্ত অভুক্ত হতভাগ্য নিরুপায় ভারতবর্ষ! কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল—এই অল্পকালের মধ্যে দ্রুত বেগে বদলে গেছে—আমরা পড়ে আছি জড়তার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন।

এর মধ্যে যে গলদ কিছুই নেই, তা বলি নে—গুরুতর গলদ আছে। সেজন্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে—কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না—সজীব মনের

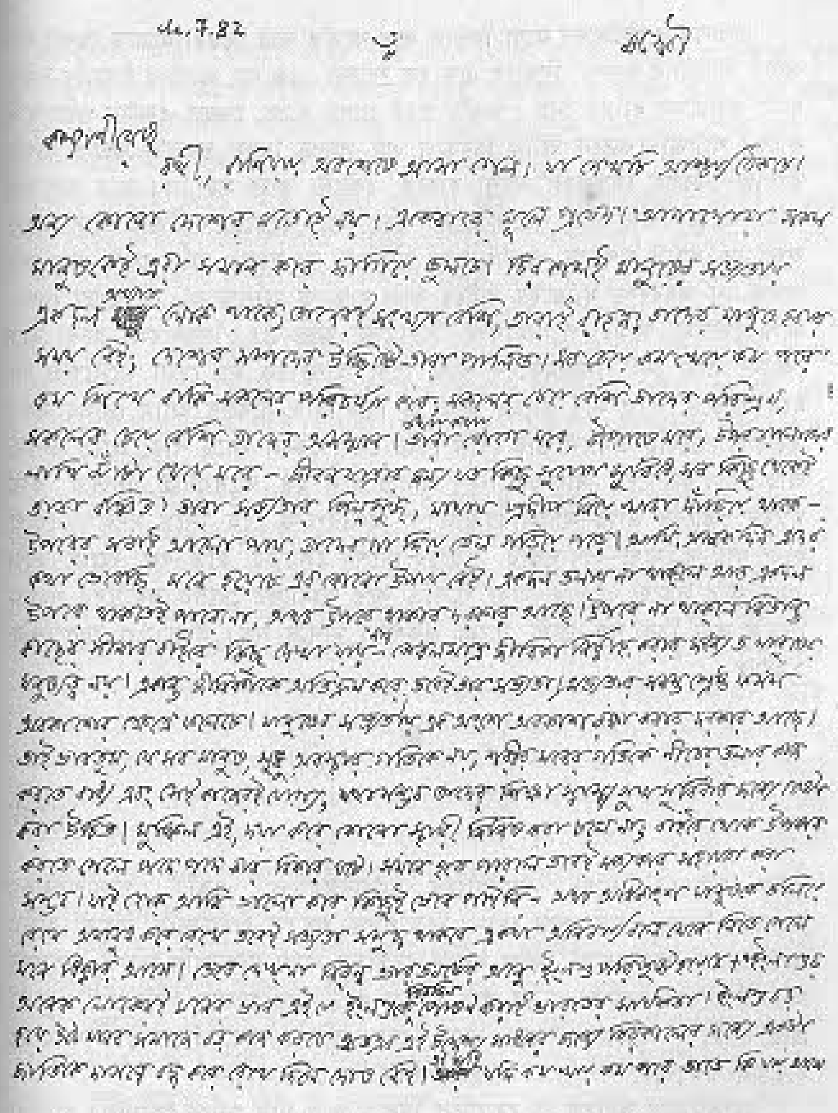

মস্কো থেকে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে স্বহস্তে লিখিত কবির চিঠির প্রতিলিপি। পরে এটিই "রাশিয়ার চিঠি" পুস্তকের ১নং চিঠি হিসাবে মুদ্রিত হয়।

তত্ত্বর সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিংবা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।

বই বইয়ের ঠিকানা

এখানকার ছেলেদের মধ্যে বিভাগ করে কর্মের ভার দেওয়া হয়েছে দেখলুম— ওদের আবাসের ব্যবস্থা সম্বন্ধে এক দল স্বাস্থ্য, এক দল ভাণ্ডার ইত্যাদি নানা রকম তদারকের দায়িত্ব নেয় ; কর্তৃত্ব সবই ওদের হাতে, কেবল একজন পরিদর্শক থাকে। শান্তিনিকেতনে আমি চিরকাল এই সমস্ত নিয়ম প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছি—কেবলই নিয়মাবলী-রচনা হয়েছে, কোনো কাজ হয় নি। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে, স্বভাবতই পাঠবিভাগের চরম লক্ষ্য হয়েছে পরীক্ষায় পাস করা, আর সব-কিছুই উপলক্ষ, অর্থাৎ হলে ভালোই, না হলেও ক্ষতি নেই—আমাদের অলস মন জবরদস্ত দায়িত্বের বাইরে কাজ বাড়াতে অনিচ্ছুক। তা ছাড়া শিশু-কাল থেকেই আমরা পুঁথিমুখস্থ বিদ্যাতেই অভ্যস্ত। নিয়মাবলী রচনা করে কোনো লাভ নেই—নিয়ামকদের পক্ষে যেটা আন্তরিক নয় সেটা উপেক্ষিত না হয়ে থাকতে পারে না। গ্রামের কাজ ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আমি যে-সব কথা এতকাল ভেবেছি এখানে তার বেশি কিছু নেই, কেবল আছে শক্তি, আছে উদ্যম, আর কার্যকর্তাদের ব্যবস্থাবুদ্ধি। আমার মনে হয়, অনেকটাই নির্ভর করে গায়ের জোরের উপর—ম্যালেরিয়ায়-জীর্ণ অপরিপুষ্ট দেহ নিয়ে সম্পূর্ণ বেগে কাজ করা দুঃসাধ্য—এখানকার শীতের দেশের লোকের হাড় শক্ত বলেই কাজ এমন করে সহজে এগোয়—মাথা গুনতি করে আমাদের দেশের কর্মীদের সংখ্যা নির্ণয় করা ঠিক নয়—তারা পুরো একখানা মানুষ নয়। ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

●

মস্কৌ

স্থান রাশিয়া। দৃশ্য, মস্কৌয়ের উপনগরীতে একটি প্রাসাদভবন। জানলার ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখি, দিক্‌প্রান্ত পর্যন্ত অরণ্যভূমি, সবুজ রঙের ঢেউ উঠেছে—ঘন সবুজ, ফিকে সবুজ, বেগনির সঙ্গে মেশামেশি সবুজ, হলদের আমেজ দেওয়া সবুজ। বনের শেষ সীমায় বহু দূরে গ্রামের কুটিরশ্রেণী। বেলা প্রায় দশটা। আকাশে স্তরে স্তরে মেঘ করেছে—অবৃষ্টিসংরম্ভ সমারোহ, বাতাসে ঋজুকায়া পপ্‌লার গাছের শিখরগুলি দোদুল্যমান।

মস্কৌয়েতে কয়দিন যে হোটেলে ছিলুম তার নাম গ্র্যান্ড হোটেল। বাড়িটা মস্ত, কিন্তু অবস্থা অতি দরিদ্র। যেন ধনীর ছেলে দেউলে হয়ে গেছে। তার সাবেক কালের সাজসজ্জা কতক গেছে বিকিয়ে, কতক গেছে ছিঁড়ে ; তালি দেওয়ারও সংগতি নেই, ময়লা হয়ে আছে—ধোবার বাড়ির সম্পর্ক বন্ধ। সমস্ত শহরেরই অবস্থা এইরকম—একান্ত অপরিচ্ছন্নতার ভিতর দিয়েও নবাবী আমলের চেহারা দেখা যাচ্ছে, যেন ছেঁড়া জামাতেও সোনার বোতাম লাগানো, যেন ঢাকাই ধুতি রিফু-করা। আহারে ব্যবহারে এমন সর্বব্যাপী নির্ধনতা

য়ুরোপের আর কোথাও দেখা যায় না। তার প্রধান কারণ, আর-আর সব জায়গায় ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ থাকাতে ধনের পুঞ্জীভূত রূপ সব চেয়ে বড়ো করে চোখে পড়ে—সেখানে দারিদ্র্য থাকে যবনিকার আড়ালে, নেপথ্যে ; সেই নেপথ্যে সব এলোমেলো, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর, দুঃখে দুর্দশায় দুষ্কর্মে নিবিড় অন্ধকার। কিন্তু বাইরে থেকে গিয়ে আমরা যেখানে বাসা পাই সেখানকার জানলা দিয়ে যা-কিছু দেখতে পাই সমস্তই সুভদ্র, শোভন, সুপরিপুষ্ট। এই সমৃদ্ধি যদি সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেত তাহলে তখনই ধরা পড়ত, দেশের ধন এত কিছু বেশি নয় যাতে সকলেরই ভাত-কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে জোটে। এখানে ভেদ নেই বলেই ধনের চেহারা গেছে ঘুচে ; দৈন্যেরও কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা। দেশজোড়া এই অধন আর কোথাও দেখি নে বলেই প্রথমেই এটা আমাদের খুব চোখে পড়ে। অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি এখানে তারাই একমাত্র।

মস্কৌয়ের রাস্তা দিয়ে নানা লোক চলেছে। কেউ ফিটফাট নয়, দেখলেই বোঝা যায় অবকাশভোগীর দল একেবারে অন্তর্ধান করেছে, সকলকেই স্বহস্তে কাজকর্ম করে দিনপাত করতে হয়, বাবুগিরির পালিশ কোনো জায়গাতেই নেই। ডাক্তার পেট্রোভ বলে এক ভদ্রলোকের বাড়ি যেতে হয়েছিল, তিনি এখানকার একজন সম্মানী লোক, উচ্চপদস্থ কর্মচারী। যে বাড়িতে তাঁর আপিস সেটা সেকালের একজন বড়োলোকের বাড়ি, কিন্তু ঘরে আসবাব অতি সামান্য, পারি-পাট্যের কোনো লক্ষণ নেই—নিষ্কার্পেট মেঝের এক কোণে যেমন-তেমন এক-খানা টেবিল ; সবসুদ্ধ, পিতৃবিয়োগে ধোপা-নাপিত-বর্জিত অশৌচদশার মতো শয্যাসনশূন্য ভাব, যেন বাইরের লোকের কাছে সামাজিকতারক্ষার কোনো দায় নেই। আমার বাসায় আহারাদির যে ব্যবস্থা তা গ্র্যান্ড হোটেল নামধারী পান্থাবাসের পক্ষে নিতান্তই অসংগত। কিন্তু এজন্যে কোনো কুণ্ঠা নেই—কেননা সকলেরই এক দশা।

আমাদের বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। তখনকার জীবনযাত্রা ও তার আয়োজন এখনকার তুলনায় কতই অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সেজন্যে আমাদের কারো মনে কিছুমাত্র সংকোচ ছিল না ; তার কারণ, তখনকার সংসারযাত্রার আদর্শে অত্যন্ত বেশি উঁচুনিচু ছিল না—সকলেরই ঘরে একটা মোটামুটি রকমের চাল-চলন ছিল—তফাত যা ছিল তা বৈদগ্ধ্যের, অর্থাৎ গানবাজনা পড়াশুনো ইত্যাদি নিয়ে। তা ছাড়া ছিল কৌলিক রীতির পার্থক্য অর্থাৎ ভাষা ভাবভঙ্গি আচার বিচার-গত বিশেষত্ব। কিন্তু তখন আমাদের আহারবিহার ও সকল প্রকার উপ-করণ যা ছিল তা দেখলে এখনকার সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকদের মনেও অবজ্ঞা জাগতে পারত।

ধনগত বৈষম্যের বড়াই আমাদের দেশে এসেছে পশ্চিম-মহাদেশ থেকে। একসময়ে আমাদের দেশে যখন হাল আমলের আপিসবিহারী ও ব্যবসাদারদের ঘরে নতুন টাকার আমদানি হল তখন তারা বিলিতি বাবুগিরির চলন শুরু

বই বইয়ের ঠিকানা

করে নিলে। তখন থেকে আসবাবের মাপেই ভদ্রতার পরিমাপ আরম্ভ হয়েছে। তাই আমাদের দেশেও আজকাল কুলশীল রীতিনীতি বুদ্ধিবিদ্যা সমস্ত ছাপিয়ে চোখে পড়ে ধনের বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতার গৌরবই মানুষের পক্ষে সব চেয়ে অগৌরব। এরই ইতরতা যাতে মজ্জার মধ্যে প্রবেশ না করে সেজন্যে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

এখানে এসে যেটা সব চেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এ দেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভুষো সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছি। মানুষে মানুষে ব্যবহার কী আশ্চর্য সহজ হয়ে গেছে। অনেক কথা বলবার আছে, বলবার চেষ্টা করব— কিন্তু এই মুহূর্তে আপাতত বিশ্রাম করবার দরকার হয়েছে। অতএব জানলার সামনে লম্বা কেদারার উপর হেলান দিয়ে বসব, পায়ের উপর একটা কম্বল টেনে দেব—তার পরে চোখ যদি বুজে আসতে চায় জোর করে টেনে রাখতে চেষ্টা করব না। ইতি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

●

মস্কৌ

বহুকাল গত হল তোমাদের উভয়কে পত্র লিখেছিলুম। তোমাদের সম্মিলিত নৈঃশব্দ্য থেকে অনুমান করি সেই যুগল পত্র কৈবল্য লাভ করেছে। এমনতরো মহতী বিনষ্টি ভারতীয় ডাকঘরে আজকাল মাঝে মাঝে ঘটেছে বলে শঙ্কা করি। এই কারণেই আজকাল চিঠি লিখতে উৎসাহ বোধ করি নে। অন্তত, তোমাদের দিক থেকে সাড়া না পেলে চুপ করে যাই। নিঃশব্দ রাত্রির প্রহরগুলোকে দীর্ঘ বলে মনে হয়—তেমনিতরোই নিশ্চিঠি কাল কল্পনায় অত্যন্ত লম্বা হয়ে ওঠে। তাই থেকে থেকে মনে হয় যেন লোকান্তরপ্রাপ্তি হয়েছে। তাই পাঁজি গেছে বদল হয়ে, ঘড়ি বাজছে লম্বা তালে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মতো আমার দেশে যাবার সময়কে যতই টান মারছে ততই অফুরান হয়ে বেড়ে চলেছে। যেদিন ফিরব সেদিন নিশ্চিতই ফিরব—আজকের দিন যেমন অব্যবহিত নিকটে সেদিনও তেমনিই নিকটে আসবে, এই মনে করে সান্ত্বনার চেষ্টা করি।

তা হোক, আপাতত রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্বপ্রথমেই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস। সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থিমজ্জায় মনে প্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে, তার কত দিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ থেকে কত ট্যাক্সো আদায় করে তার তহবিল হয়ে উঠেছে পর্বতপ্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে—ভয় ভাবনা সংশয় কিছুই মনে নেই। সনাতনের গদি দিয়েছে ঝাঁটিয়ে, নূতনের জন্যে একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে। পশ্চিম-মহাদেশ বিজ্ঞানের জাদুবলে দুঃসাধ্য সাধন করে, দেখে মনে মনে তারিফ করি। কিন্তু এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলছে সেটা দেখে আমি সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছি। শুধু যদি একটা ভীষণ ভাঙচুরের কাণ্ড হত তাতে তেমন আশ্চর্য হতুম না; কেননা, নাস্তানাবুদ করবার শক্তি এদের যথেষ্ট আছে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, বহুদূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নূতন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে। দেরি সইছে না, কেননা জগৎ জুড়ে এদের প্রতিকূলতা, সবাই এদের বিরোধী—যত শীঘ্র পারে এদের খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে—হাতে হাতে প্রমাণ করে দিতে হবে, এরা যেটা চাচ্ছে সেটা ভুল নয়, ফাঁকি নয়। হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ-পনেরো বছর জিতবে বলে পণ করেছে। অন্য দেশের তুলনায় এদের অর্থের জোর অতি সামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর দুর্ধর্ষ।

এই যে বিপ্লবটা ঘটল এটা রাশিয়াতে ঘটবে বলেই অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করছিল। আয়োজন কত দিন থেকেই চলছে। খ্যাত-অখ্যাত কত লোক কত কাল থেকেই প্রাণ দিয়েছে, অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেছে। পৃথিবীতে বিপ্লবের কারণ বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে, কিন্তু এক-একটা জায়গায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে—সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে উঠলেও এক-একটা দুর্বল জায়গায় ফোড়া হয়ে লাল হয়ে ওঠে। যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।

একদিন ফরাসী-বিদ্রোহ ঘটেছিল এই অসাম্যের তাড়নায়। সেদিন সেখান-কার পীড়িতেরা বুঝেছিল এই অসাম্যের অপমান ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লবে সাম্য সৌভ্রাত্র ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্বদেশের গণ্ডি পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু টিকল না। এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে। এ বাণী চিরদিন টিকবে কি না কেউ বলতে পারে না। কিন্তু স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত, এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে।

এই যুগে বিশ্ব-ইতিহাসের রঙ্গভূমির পর্দা উঠে গেছে। এতকাল যেন আড়ালে আড়ালে রিহার্স্যাল চলছিল, টুকরো টুকরো ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন কামরায়। প্রত্যেক দেশের চারিদিকে বেড়া ছিল। বাহির থেকে আনাগোনা করবার পথ একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু বিভাগের মধ্যে মানবসংসারের যে চেহারা দেখেছি আজ তা দেখি নে। সেদিন দেখা যাচ্ছিল একটি একটি গাছ, আজ দেখছি অরণ্য। মানবসমাজের মধ্যে যদি ভারসামঞ্জস্যের অভাব ঘটে থাকে সেটা

বই বইয়ের ঠিকানা

আজ দেখা দিচ্ছে পৃথিবীর একদিক থেকে আর-একদিক পর্যন্ত। এমন বিরাট করে দেখতে পাওয়া কম কথা নয়।

টোকিওতে যখন কোরীয় যুবককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম 'তোমাদের দুঃখটা কী' সে বললে, আমাদের কাঁধে চেপেছে মহাজনের রাজত্ব, আমরা তাদের মুনফার বাহন। আমি প্রশ্ন করলুম, যে কারণেই হোক, তোমরা যখন দুর্বল তখন এই বোঝা নিজের জোরে ঝেড়ে ফেলবে কী উপায়ে? সে বললে, নিরুপায়ের দল আজ পৃথিবী জুড়ে, দুঃখে তাদের মেলাবে—যারা ধনী, যারা শক্তিমান, তারা নিজের নিজের লোহার সিন্দুক ও সিংহাসনের চারদিকে পৃথক হয়ে থাকবে, তারা কখনো মিলতে পারবে না। কোরিয়ার জোর হচ্ছে তার দুঃখের জোর।

দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট করে দেখতে পাচ্ছে, এইটে মস্ত কথা। আগেকার দিনে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দেখেছে বলেই কোনোমতে নিজের শক্তিরূপ দেখতে পায় নি—অদৃষ্টের উপর ভর করে সব সহ্য করেছে। আজ অত্যন্ত নিরুপায়ও অন্তত সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনা করতে পারছে যে রাজ্যে পীড়িতের পীড়া যায়, অপমানিতের অপমান ঘোচে। এই কারণেই সমস্ত পৃথিবীতেই আজ দুঃখজীবীরা নড়ে উঠছে।

যারা শক্তিমান তারা উদ্ধত। দুঃখীদের মধ্যে আজ যে শক্তির প্রেরণা সঞ্চারিত হয়ে তাদের অস্থির করে তুলেছে তাকে বলশালীরা বাইরে থেকে ঠেকাবার চেষ্টা করছে, তার দূতদের ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে না, তাদের কণ্ঠ দিচ্ছে রুদ্ধ করে। কিন্তু আসল যাকে সবচেয়ে ওদের ভয় করা উচিত ছিল সে হচ্ছে দুঃখীর দুঃখ—কিন্তু তাকেই এরা চিরকাল সবচেয়ে অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত। নিজের মুনফার খাতিরে সেই দুঃখকে এরা বাড়িয়ে চলতে ভয় পায় না, হতভাগ্য চাষীকে দুর্ভিক্ষের কবলের মধ্যে ঠেসে ধরে শতকরা দুশো তিনশো হারে মুনফা ভোগ করতে এদের হৃৎকম্প হয় না। কেননা সেই মুনফাকেই এরা শক্তি বলে জানে। কিন্তু মানুষের সমাজে সমস্ত আতিশয্যের মধ্যেই বিপদ, সে বিপদকে কখনোই বাইরে থেকে ঠেকানো যায় না। অতিশয় শক্তি অতিশয় অশক্তির বিরুদ্ধে চিরদিন নিজেকে বাড়িয়ে চলতেই পারে না। ক্ষমতাশালী যদি আপন শক্তিমদে উন্মত্ত হয়ে না থাকত তা হলে সবচেয়ে ভয় করত এই অসাম্যের বাড়াবাড়িকে—কারণ অসামঞ্জস্য মাত্রই বিশ্ববিধির বিরুদ্ধে।

মস্কো থেকে যখন নিমন্ত্রণ এল তখনো বলশেভিকদের সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। তাদের সম্বন্ধে ক্রমাগতই উলটো উলটো কথা শুনেছি। আমার মনে তাদের বিরুদ্ধে একটা খটকা ছিল। কেননা গোড়ায় ওদের সাধনা ছিল জবরদস্তির সাধনা। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করে দেখলুম, ওদের প্রতি বিরুদ্ধতা য়ুরোপে যেন অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আমি রাশিয়াতে আসছি শুনে অনেক লোকেই আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। এমন কি অনেক ইংরেজের মুখেও ওদের প্রশংসা শুনেছি—অনেকে বলেছে, ওরা অতি আশ্চর্য একটা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত।

আবার অনেকে আমাকে ভয় দেখিয়েছে—কিন্তু প্রধান ভয়ের বিষয় আরামের অভাব, বলেছে আহারাদি সমস্তই এমন মোটা রকম যে আমি তা সহ্য করতে পারব না। তা ছাড়া এমন কথাও অনেকে বলেছে, আমাকে যা এরা দেখাবে তার অধিকাংশই বানানো। এ কথা মানতেই হবে, আমার বয়সে আমার মতো শরীর নিয়ে রাশিয়ায় ভ্রমণ দুঃসাহসিকতা। কিন্তু পৃথিবীতে যেখানে সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না আসা আমার পক্ষে অমার্জনীয় হত।

তাছাড়া আমার কানে সেই কোরীয় যুবকের কথাটা বাজছিল। মনে মনে ভাবছিলুম, ধনশক্তিতে দুর্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাঙ্গণদ্বারে ওই রাশিয়া আজ নির্ধনের শক্তিসাধনের আসন পেতেছে সমস্ত পশ্চিম-মহাদেশের ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, এটা দেখবার জন্য আমি যাব না তো কে যাবে? ওরা শক্তিশালীর শক্তিকে, ধনশালীর ধনকে বিপর্যস্ত করে দিতে চায়, তাতে আমরা ভয় করব কিসের, রাগই করব বা কেন? আমাদের শক্তিই বা কী, ধনই বা কত? আমরা তো জগতের নিরন্ন নিঃসহায়দের দলের।

যদি কেউ বলে, দুর্বলের শক্তিকে উদ্বোধিত করবার জন্যেই তারা পণ করেছে তা হলে আমরা কোন্ মুখে বলব যে, তোমাদের ছায়া মাড়াতে নেই? তারা হয়তো ভুল করতে পারে—তাদের প্রতিপক্ষেরাও যে ভুল করবে না তা নয়। কিন্তু আমাদের বলবার আজ সময় এসেছে যে, অশক্তের শক্তি এখনই যদি না জাগে তা হলে মানুষের পরিত্রাণ নেই। কারণ, শক্তিমানের শক্তিশেল অতিমাত্র প্রবল হয়ে উঠেছে; এতদিন ভূলোক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, আজ আকাশকে পর্যন্ত পাপে কলুষিত করে তুললে। নিরুপায় আজ অতিমাত্র নিরুপায়—সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আজ কেবল মানবসমাজের এক পাশে পুঞ্জীভূত, অন্য পাশে নিঃসহায়তা অন্তহীন।

এরই কিছুদিন পূর্বে থেকে ঢাকার অত্যাচারের কাহিনী আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। কী সব অমানুষিক নিষ্ঠুরতা, অথচ ইংলণ্ডের খবরের কাগজে তার খবরই নেই—এখানকার মোটরগাড়ির দুর্যোগে দুটো-একটা মানুষ ম'লে তার খবর এ দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু আমাদের ধন প্রাণ মান কী অসম্ভব সস্তা হয়ে গেছে। যারা এত সস্তা তাদের সম্বন্ধে কখনো সুবিচার হতেই পারে না।

আমাদের নালিশ পৃথিবীর কানে ওঠবার জো নেই, সমস্ত রাস্তা বন্ধ। অথচ আমাদের বিরুদ্ধে বচন জগতে ব্যাপ্ত করবার সকল প্রকার উপায় এদের হাতে। আজকের দিনে দুর্বল জাতির পক্ষে এও একটি প্রবলতম গ্লানির বিষয়। কেননা, আজকের দিনের জনশ্রুতি সমস্ত জগতের কাছে ঘোষিত হয়, বাক্য-চালনার যন্ত্রগুলো যে-সব শক্তিমান জাতির হাতে তারা অখ্যাতির এবং অপযশের আড়ালে অশক্তজাতীয়দের বিলুপ্ত করে রাখতে পারে। পৃথিবীর লোকের কাছে এ কথা প্রচারিত যে, আমরা হিন্দু-মুসলমানে কাটাকাটি মারামারি করি, অতএব,

বই বইয়ের ঠিকানা

ইত্যাদি। কিন্তু য়ুরোপেও একদা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কাটাকাটি মারামারি চলত—গেল কী উপায়ে? কেবলমাত্র শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা। আমাদের দেশেও সেই উপায়েই যেত। কিন্তু শতাধিক বৎসরের ইংরেজ-শাসনের পরে দেশে শতকরা পাঁচজনের কপালে শিক্ষা জুটেছে, সে শিক্ষাও শিক্ষার বিড়ম্বনা।

অবজ্ঞার কারণকে দূর করবার চেষ্টা না করে লোকের কাছে প্রমাণ করা যে আমরা অবজ্ঞার যোগ্য, এইটে হচ্ছে আমাদের অশক্তির সব চেয়ে বড়ো ট্যাক্স্‌। মানুষের সকল সমস্যা-সমাধানের মূলে হচ্ছে তার সুশিক্ষা। আমাদের দেশে তার রাস্তা বন্ধ, কারণ 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার' আর কোনো উপকারের জন্যে জায়গা রাখলে না, তহবিল একেবারে ফাঁকা। আমি দেশের কাজের মধ্যে একটি কাজকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলুম—জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা দেবার শিক্ষা দেব বলে এতকাল ধরে আমার সমস্ত সামর্থ্য দিয়েছি। এজন্য কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যও আমি প্রত্যাখ্যান করতে চাই নি, প্রত্যাশাও করেছি—কিন্তু তুমি জান কতটা ফল পেয়েছি। বুঝতে পেরেছি হবার নয়। মস্ত আমাদের পাপ, আমরা অশক্ত।

তাই যখন শুনলুম, রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অংক থেকে প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে তখন মনে মনে ঠিক করলুম, ভাঙা শরীর আরও যদি ভাঙে তো ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে। এরা জেনেছে, অশক্তকে শক্তি দেবার একটিমাত্র উপায় শিক্ষা—অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই 'পরে নির্ভর করে। ফাঁকা 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার' নিয়ে না ভরে পেট, না ভরে মন। অথচ তার দাম দিতে গিয়ে সর্বস্ব বিকিয়ে গেল।

আধুনিক ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় আমি মানুষ, তাই এত কাল আমার মনে দৃঢ় ধারণা ছিল, প্রায় তেত্রিশ কোটি মূর্খকে বিদ্যাদান করা অসম্ভব বললেই হয়, এজন্য আমাদের মন্দ ভাগ্য ছাড়া আর কাউকে বুঝি দোষ দেওয়া চলে না। যখন শুনেছিলুম, এখানে চাষী ও কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা হু হু করে এগিয়ে চলেছে আমি ভেবেছিলুম, সে শিক্ষা বুঝি সামান্য একটুখানি পড়া ও লেখা ও অংক কষা—কেবলমাত্র মাথা-গুনতিতেই তার গৌরব। সেও কম কথা নয়। আমাদের দেশে তাই হলেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বাড়ি চলে যেতুম। কিন্তু এখানে দেখলুম, বেশ পাকা রকমের শিক্ষা, মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত, নোট মুখস্থ করে এম. এ. পাস করবার মতন নয়।

কিন্তু এ-সব কথা আর-একটু বিস্তারিত করে পরে লিখব, আজ আর সময় নেই। আজই সন্ধ্যাবেলায় বার্লিন অভিমুখে যাত্রা করব। তার পরে ৩রা অক্টোবর আট্‌লাণ্টিক পাড়ি দেব—কত দিনের মেয়াদ আজও নিশ্চিত করে বলতে পারছি নে।

কিন্তু শরীর মন কিছুতে সায় দিচ্ছে না—তবু এবারকার সুযোগ ছাড়তে সাহস হয় না—যদি কিছু কুড়িয়ে আনতে পারি তা হলেই বাকি যে-কটা দিন বাঁচি বিশ্রাম করতে পারব। নইলে দিনে দিনে মূলধন খুইয়ে দিয়ে অবশেষে

বাতি নিবিয়ে দিয়ে বিদায় নেওয়া সেও মন্দ প্ল্যান নয়—সামান্য কিছু উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে রেখে গেলে জিনিসটা নোংরা হয়ে উঠবে। সম্বল যতই কমে আসতে থাকে মানুষের আন্তরিক দুর্বলতা ততই ধরা পড়ে—ততই শৈথিল্য, ঝগড়া-ঝাঁটি, পরস্পরের বিরুদ্ধে কানাকানি। ঔদার্য ভরা-উদরের উপরে অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু যেখানেই যথার্থ সিদ্ধির একটি চেহারা দেখতে পাই সেখানেই দেখা যায় সেটা কেবলমাত্র টাকা দিয়ে হাটে কেনবার নয়—দারিদ্র্যের জমিতেই সে সোনার ফসল ফলায়। এখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় যে অক্লান্ত উদ্যম, সাহস, বুদ্ধিশক্তি, যে আত্মোৎসর্গ দেখলুম, তার অতি অল্প পরিমাণ থাকলেও কৃতার্থ হতুম। আন্তরিক শক্তি ও অকৃত্রিম উৎসাহ যত কম থাকে টাকা খুঁজতে হয় ততই বেশি করে। ইতি ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

মস্কৌ থাকতে সোভিয়েট ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুটো বড়ো বড়ো চিঠি লিখেছিলুম। সে চিঠি কবে পাবে এবং পাবে কিনা কী জানি।

বার্লিনে এসে একসঙ্গে তোমার দুখানা চিঠি পাওয়া গেল। ঘন বর্ষার চিঠি, শান্তিনিকেতনের আকাশে শালবনের উপরে মেঘের ছায়া এবং জলের ধারায় শ্রাবণ ঘনিয়ে উঠেছে। সেই ছবি মনে জাগলে আমার চিত্ত কী রকম উৎসুক হয়ে ওঠে সে তোমাকে বলা বাহুল্য।

কিন্তু এবারে রাশিয়া ঘুরে এসে সেই সৌন্দর্যের ছবি আমার মন থেকে মুছে গেছে। কেবলই ভাবছি আমাদের দেশ-জোড়া চাষীদের দুঃখের কথা। আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট-পরিচয় হয়েছে। তখন চাষীদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখাশোনা—ওদের সব নালিশ উঠেছে আমার কানে। আমি জানি, ওদের মতো নিঃসহায় জীব অল্পই আছে, ওরা সমাজের যে তলায় তলিয়ে সেখানে জ্ঞানের আলো অল্পই পৌঁছয়, প্রাণের হাওয়া বয় না বললেই হয়।

তখনকার দিনে দেশের পলিটিক্‌স্‌ নিয়ে যাঁরা আসর জমিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না যাঁরা পল্লীবাসীকে এ দেশের লোক বলে অনুভব করতেন। আমার মনে আছে, পাবনা কন্‌ফারেন্সের সময় আমি তখন-কার খুব বড়ো একজন রাষ্ট্রনেতাকে বলেছিলুম, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে যদি আমরা সত্য করতে চাই তা হলে সব-আগে আমাদের এই তলার লোকদের মানুষ করতে হবে। তিনি সে কথাটাকে এতই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিলেন যে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে, আমাদের দেশাত্মবোধীরা দেশ বলে একটা তত্ত্বকে বিদেশের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন, দেশের মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন না। এই রকম মনোবৃত্তির সুবিধে হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশ আছে বিদেশীর হাতে এই কথা নিয়ে আক্ষেপ করা, উত্তেজিত হওয়া, কবিতা লেখা, খবরের কাগজ চালানো সহজ। কিন্তু দেশের

বই বইয়ের ঠিকানা

লোক আমাদের আপন লোক এ কথা বলবামাত্র তার দায়িত্ব তখন থেকেই স্বীকার করে নিতে হয়, কাজ শুরু হয় সেই মুহূর্তে।

সেদিনকার পরেও অনেক দিন চলে গেল। সেই পাবনা কন্‌ফারেন্সে পল্লী সম্বন্ধে যা বলেছিলুম তার প্রতিধ্বনি অনেকবার শুনেছি—শুধু শব্দ নয় পল্লীর হিতকল্পে অর্থও সংগ্রহ হয়েছে—কিন্তু দেশের যে উপরিতলায় শব্দের আবৃত্তি হয় সেইখানটাতেই সেই অর্থও আবর্তিত হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে, সমাজের যে গভীর তলায় পল্লী তলিয়ে আছে সেখানে তার কিছুই পৌঁছল না।

একদা আমি পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্যচর্চা করেছিলুম। মনে ধারণা ছিল লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব এই আমার একমাত্র কাজ, আর কোনো কাজের আমি যোগ্যই নই। কিন্তু যখন এ কথা কাউকে বলে-কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্যে কলম কানে গুঁজে এ কথা আমাকে বলতে হল—আচ্ছা, আমিই এ কাজে লাগব। এই সংকল্পে আমার সহায়তা করবার জন্যে সেদিন একটিমাত্র লোক পেয়েছিলুম, সে হচ্ছে কালীমোহন। শরীর তার রোগে জীর্ণ, দুবেলা তার জ্বর আসে, তার উপরে পুলিসের খাতায় তার নাম উঠেছে।

তার পর থেকে দুর্গম বন্ধুর পথে সামান্য পাথেয় নিয়ে চলেছে সেই ইতিহাস। চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে—জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর ; দ্বিতীয়ত, সমবায়নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আল-বাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।

কিন্তু এই দুটো পন্থাই দুরূহ। প্রথমত, চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পরমুহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বই কমবে না। কৃষিক্ষেত্র একত্রীকরণের কথা আমি নিজে একদিন চাষীদের ডেকে আলোচনা করেছিলুম। শিলাইদহে আমি যে বাড়িতে থাকতুম তার বারান্দা থেকে দেখা যায়, খেতের পর খেত নিরন্তর চলে গেছে দিগন্ত পেরিয়ে। ভোরবেলা থেকে হাল লাঙল এবং গোরু নিয়ে একটি করে চাষী আসে, আপন টুকরো খেতটুকু ঘুরে ঘুরে চাষ করে চলে যায়। এই রকম ভাগ-করা শক্তির যে কতটা অপচয় ঘটে প্রতিদিন সে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। চাষীদের ডেকে যখন সমস্ত জমি একত্র করে কলের লাঙলে চাষ করার সুবিধের কথা বুঝিয়ে বললুম, তারা তখনই সমস্ত মেনে নিলে। কিন্তু বললে, আমরা নির্বোধ, এত বড়ো ব্যাপার করে তুলতে পারব কী করে ? আমি যদি বলতে পারতুম 'এ ভার আমিই নেব' তা হলে তখনই মিটে যেতে পারত। কিন্তু আমার সাধ্য কী ? এমন কাজের চালনাভার নেবার দায়িত্ব আমার পক্ষে অসম্ভব—সে শিক্ষা, সে শক্তি আমার নেই।

কিন্তু এই কথাটা বরাবর আমার মনে জেগেছিল। যখন বোলপুরের কো-অপারেটিভের ব্যবস্থা বিশ্বভারতীর হাতে এল তখন আবার একদিন আশা হয়েছিল, এইবার বুঝি সুযোগ হতে পারবে। যাদের হাতে আপিসের ভার তাদের বয়স অল্প, আমার চেয়ে তাদের হিসাবী বুদ্ধি এবং শিক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু আমাদের যুবকেরা ইস্কুলে-পড়া ছেলে, তাদের বই মুখস্থ করার মন। যে শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত তাতে করে আমাদের চিন্তা করার সাহস, কর্ম করবার দক্ষতা থাকে না ; পুঁথির বুলি পুনরাবৃত্তি করার 'পরেই ছাত্রদের পরিত্রাণ নির্ভর করে।

বুদ্ধির এই পল্লবগ্রাহিতা ছাড়া আমাদের আর-একটা বিপদ ঘটে। ইস্কুলে যারা পড়া মুখস্থ করেছে আর ইস্কুলের বাইরে পড়ে থেকে যারা পড়া মুখস্থ করে নি তাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ঘটে গেছে—শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত। ইস্কুলে-পড়া মনের আত্মীয়তাবোধ পুঁথি-পোড়োদের পাড়ার বাইরে পৌঁছতে পারে না। যাদের আমরা বলি চাষাভুষো, পুঁথির পাতার পর্দা ভেদ করে তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পৌঁছয় না, তারা আমাদের কাছে অস্পষ্ট। এইজন্যেই ওরা আমাদের সকল প্রচেষ্টা থেকে স্বভাবতই বাদ পড়ে যায়। তাই কো-অপারেটিভের যোগে অন্য দেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলছে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার বেশি কিছু এগোয় না। কেননা, ধার দেওয়া, তার সুদ কষা এবং দেনার টাকা আদায় করা অত্যন্ত ভীরু মনের পক্ষেও সহজ কাজ, এমন-কি ভীরু মনের পক্ষেই সহজ ; তাতে যদি নামতার ভুল না ঘটে তা হলে কোনো বিপদ নেই।

বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদ-বোধ এই উভয়ের অভাব ঘটাতেই দুঃখীর দুঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন হয়েছে ; কিন্তু এই অভাবের জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। কেননা, কেরানি-তৈরির কারখানা বসাবার জন্যেই একদা আমাদের দেশে বণিকরাজত্বে ইস্কুলের পত্তন হয়েছিল। ডেস্ক্‌-লোকে মনিবের সঙ্গে সাযুজ্যলাভই আমাদের সদ্‌গতি। সেইজন্যে উমেদারিতে অকৃতার্থ হলেই আমাদের বিদ্যাশিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। এইজন্যেই আমাদের দেশে প্রধানত দেশের কাজ কংগ্রেসের প্যাণ্ডালে এবং খবরের কাগজের প্রবন্ধমালায়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেদনা-উদ্‌ঘোষণের মধ্যেই পাক খাচ্ছিল। আমাদের কলমে-বাঁধা হাত দেশকে গড়ে তোলবার কাজে এগোতেই পারলে না।

ঐ দেশের হাওয়াতেই আমিও তো মানুষ, সেইজন্যেই জোরের সঙ্গে মনে করতে সাহস হয় নি যে, বহু কোটি জনসাধারণের বুকের উপর থেকে অশিক্ষা ও অসামর্থ্যের জগদ্দল পাথর ঠেলে নামানো সম্ভব। অল্পসল্প কিছু করতে পারা যায় কিনা এতদিন এই কথাই ভেবেছি। মনে করেছিলুম, সমাজের একটি চিরবাধাগ্রস্ত তলা আছে, সেখানে কোনো কালেই সূর্যের আলো সম্পূর্ণ প্রবেশ করানো চলবে না, সেইজন্যেই সেখানে অন্তত তেলের বাতি জ্বালাবার জন্যে

বই বইয়ের ঠিকানা

উঠে-পড়ে লাগা উচিত। কিন্তু সাধারণত সেটুকু কর্তব্যবোধও লোকের মনে যথেষ্ট জোরের সঙ্গে ধাক্কা মারতে চায় না। কারণ, যাদের আমরা অন্ধকারে দেখতে পাই নে তাদের জন্যে যে কিছু করা যেতে পারে, এ কথা স্পষ্ট করে মনে আসে না।

এই রকম স্বল্পসাহস মন নিয়েই রাশিয়াতে এসেছিলুম, শুনেছিলুম এখানে চাষী ও কর্মিকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পরিমাণ অনেক বেড়ে চলেছে। ভেবেছিলুম তার মানে, ওখানে পল্লীর পাঠশালায় শিশুশিক্ষার প্রথম-ভাগ বড়ো জোর দ্বিতীয়-ভাগ পড়ানোর কাজ সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশি হয়েছে। ভেবেছিলুম ওদের সাংখ্যিক তালিকা নেড়েচেড়ে দেখতে পাব ওদের কজন চাষী নাম সই করতে পারে আর কজন চাষীর নামতা দশের কোঠা পর্যন্ত এগিয়েছে।

মনেরেখো, এখানে যে বিপ্লবে জারের শাসন লয় পেলে সেটা ঘটেছে ১৯১৭ খৃস্টাব্দে। অর্থাৎ তেরো বছর পার হল মাত্র। ইতিমধ্যে ঘরে বাইরে এদের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়ে চলতে হয়েছে। এরা একা, অত্যন্ত ভাঙাচোরা একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার বোঝা নিয়ে। পথ পূর্বতন দুঃশাসনের প্রভূত আবর্জনায় দুর্গম। যে আত্মবিপ্লবের প্রবল ঝড়ের মুখে এরা নবযুগের ঘাটে পাড়ি দিলে সেই বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য সহায় ছিল ইংলণ্ড এবং আমেরিকা। অর্থ-সম্বল এদের সামান্য, বিদেশের মহাজনী গদিতে এদের ক্রেডিট নেই। দেশের মধ্যে কলকারখানা এদের যথেষ্ট পরিমাণে না থাকাতে অর্থ-উৎপাদনে এরা শক্তিহীন। এইজন্যে কোনোমতে পেটের ভাত বিক্রি করে চলেছে এদের উদ্যোগ-পর্ব। অথচ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকলের চেয়ে যে অনুৎপাদক বিভাগ—সৈনিকবিভাগ—তাকে সম্পূর্ণরূপে সুদক্ষ রাখার অপব্যয় এদের পক্ষে অনিবার্য। কেননা, আধুনিক মহাজনী যুগের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এদের শত্রুপক্ষ এবং তারা সকলেই আপন আপন অস্ত্রশালা কানায় কানায় ভরে তুলেছে।

মনে আছে, এরাই 'লীগ অফ নেশন্‌স'এ অস্ত্রবর্জনের প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়ে কপট শান্তিকামীদের মনে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। কেননা, নিজেদের প্রতাপ-বর্ধন বা রক্ষণ সোভিয়েটদের লক্ষ্য নয়—এদের সাধনা হচ্ছে জনসাধারণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্নসম্বলের উপায়-উপকরণকে প্রকৃষ্ট প্রণালীতে ব্যাপক করে গড়ে তোলা। এদেরই পক্ষে নিরুপদ্রব শান্তির দরকার সব চেয়ে বেশি। কিন্তু তুমি তো জান, 'লীগ অফ নেশনস'এর সমস্ত পালোয়ানই গুণ্ডাগিরির বহুবিস্তৃত উদ্যোগ কিছুতেই বন্ধ করতে চায় না, কিন্তু 'শান্তি চাই' বলে সকলে মিলে হাঁক পাড়ে। এইজন্যেই সকল সাম্রাজ্যিক দেশেই অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটাবনের চাষ অন্নের চাষকে ছাপিয়ে বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে আবার কিছুকাল ধরে রাশিয়ায় অতি ভীষণ দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল—কত লোক মরেছে তার ঠিক নেই। তার ধাক্কা কাটিয়ে সবেমাত্র আট বছর এরা নূতন যুগকে গড়ে তোলবার কাজে লাগতে পেরেছে, বাইরের উপকরণের অভাব সত্ত্বেও।

কাজ সামান্য নয়—য়ুরোপ এশিয়া জুড়ে প্রকাণ্ড এদের রাষ্ট্রক্ষেত্র।

প্রজামণ্ডলীর মধ্যে যত বিভিন্ন জাতের মানুষ আছে ভারতবর্ষেও এত নেই। তাদের ভূপ্রকৃতি-মানবপ্রকৃতির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য অনেক বেশি। বস্তুত এদের সমস্যা বহুবিচিত্র-জাতি-সমাকীর্ণ বহুবিচিত্র-অবস্থা-সংকুল বিশ্বপৃথিবীর সমস্যারই সংক্ষিপ্ত রূপ।

তোমাকে পূর্বেই বলেছি, বাহির থেকে মস্কো শহরে যখন চোখ পড়ল দেখলুম—য়ুরোপের অন্য সমস্ত ধনী শহরের তুলনায় অত্যন্ত মলিন। রাস্তায় যারা চলেছে তারা একজনও শৌখিন নয়, সমস্ত শহর আটপৌরে-কাপড়-পরা। আটপৌরে কাপড়ে শ্রেণীভেদ থাকে না, শ্রেণীভেদ পোশাকী কাপড়ে। এখানে সাজে পরিচ্ছদে সবাই এক। সবটা মিলেই শ্রমিকদের পাড়া; যেখানে দৃষ্টি পড়ে সেইখানেই ওরা। এখানে শ্রমিকদের কৃষাণদের কী রকম বদল হয়েছে তা দেখবার জন্যে লাইব্রেরিতে গিয়ে বই খুলতে অথবা গাঁয়ে কিম্বা বস্তিতে গিয়ে নোট নিতে হয় না। যাদের আমরা 'ভদ্দর লোক' বলে থাকি তারা কোথায় সেইটেই জিজ্ঞাস্য।

এখানকার জনসাধারণ ভদ্রলোকের আওতায় একটুও ছায়া-ঢাকা পড়ে নেই, যারা যুগে যুগে নেপথ্যে ছিল তারা আজ সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে। এরা যে প্রথম-ভাগ শিশুশিক্ষা পড়ে কেবলমাত্র ছাপার অক্ষর হাৎড়ে বেড়াতে শিখেছে, এ ভুল ভাঙতে একটুও দেরি হল না। এরা মানুষ হয়ে উঠেছে এই কটা বছরেই।

নিজের দেশের চাষীদের মজুরদের কথা মনে পড়ল। মনে হল, আরব্য উপন্যাসের জাদুকরের কীর্তি। বছর দশেক আগেই এরা ঠিক আমাদেরই দেশের জনমজুরদের মতোই নিরক্ষর নিঃসহায় নিরন্ন ছিল, তাদেরই মতো অন্ধ সংস্কার এবং মূঢ় ধার্মিকতা। দুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়েছে; পরলোকের ভয়ে পাণ্ডা-পুরুতদের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা, আর ইহলোকের ভয়ে রাজপুরুষ মহাজন ও জমিদারদের হাতে; যারা এদের জুতোপেটা করত তাদের সেই জুতো সাফ করা এদের কাজ ছিল। হাজার বছর থেকে এদের প্রথাপদ্ধতির বদল হয় নি, যানবাহন চরকা-ঘানি সমস্ত প্রপিতামহের আমলের, হালের হাতিয়ারে হাত লাগাতে বললে বেঁকে বসত। আমাদের দেশের ত্রিশ কোটির পিঠের উপরে যেমন চেপে বসেছে ভূতকালের ভূত, চেপে ধরেছে তাদের দুই চোখ—এদেরও ঠিক তেমনই ছিল। কটা বছরের মধ্যে এই মূঢ়তার অক্ষমতার পাহাড় নড়িয়ে দিলে যে কী করে সে কথা এই হতভাগ্য ভারতবাসীকে যেমন একান্ত বিস্মিত করেছে এমন আর কাকে করবে বলো। অথচ যে সময়ের মধ্যে এই পরিবর্তন চলছিল সে সময়ে এ দেশে আমাদের দেশের বহুপ্রশংসিত 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার' ছিল না।

তোমাকে পূর্বেই বলেছি, এদের জনসাধারণের শিক্ষার চেহারা দেখবার জন্যে আমাকে দূরে যেতে হয় নি কিম্বা স্কুলের ইন্সপেক্টরের মতো এদের বানান তদন্ত করবার সময় দেখতে হয় নি 'কান'এ 'সোনা'য় এরা মূর্ধন্য ণ লাগায় কিনা। একদিন সন্ধ্যাবেলা মস্কো শহরে একটা বাড়িতে গিয়েছিলুম,

বই বইয়ের ঠিকানা

সেটা চাষীদের বাসা, গ্রাম থেকে কোনো উপলক্ষে যখন তারা শহরে আসে তখন সস্তায় ঐ বাড়িতে কিছুদিনের মতো থাকতে পায়। তাদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছিল। সে রকম কথাবার্তা যখন আমাদের দেশের চাষীদের সঙ্গে হবে সেইদিন সাইমন কমিশনের জবাব দিতে পারব।

আর কিছু নয়, এটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি, সবই হতে পারত, কিন্তু হয় নি—না হোক, আমরা পেয়েছি 'ল অ্যান্ড অর্ডার'। আমাদের ওখানে সাম্প্রদায়িক লড়াই ঘটে বলে একটা অখ্যাতি বিশেষ ঝোঁক দিয়ে রটনা হয়ে থাকে—এখানেও য়িহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে খৃস্টান সম্প্রদায়ের লড়াই আমাদেরই দেশেরই আধুনিক উপসর্গের মতো অতিকুৎসিৎ অতিবর্বর ভাবেই ঘটত—শিক্ষায় এবং শাসনে একেবারে তার মূলে উৎপাটিত হয়েছে। কতবার আমি ভেবেছি, আমাদের দেশে সাইমন কমিশন যাবার আগে একবার রাশিয়ায় তার ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল।

তোমার মতো ভদ্রমহিলাকে সাধারণ ভদ্রগোছের চিঠি না লিখে এ রকম চিঠি যে কেন লিখলুম তার কারণ চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, দেশের দশা আমার মনের মধ্যে কী রকম তোলপাড় করছে, জালিয়ানওয়ালাবাগের উপদ্রবের পর একবার আমার মনে এই রকম অশান্তি জেগেছিল। এবার ঢাকার উপদ্রবের পর আবার সেই রকম দুঃখ পাচ্ছি। সে ঘটনার উপর সরকারি চুনকামের কাজ হয়েছে, কিন্তু এ রকম সরকারী চুনকামের যে কী মূল্য তা রাষ্ট্রনীতিবিৎ সবাই জানে। এই রকম ঘটনা যদি সোভিয়েট রাশিয়ায় ঘটত তা হলে কোনো চুনকামেই তার কলঙ্ক ঢাকা পড়ত না। সুধীন্দ্র, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের যার কোনো শ্রদ্ধা কোনো দিন ছিল না, সেও এবারে আমাকে এমন চিঠি লিখেছে যাতে বোঝা যাচ্ছে সরকারি ধর্মনীতির প্রতি ধিক্কার আজ আমাদের দেশে কত দূর পর্যন্ত পৌঁচেছে। যা হোক, তোমার চিঠি অসমাপ্ত রইল—কাগজ এবং সময় ফুরিয়ে এসেছে, পরের চিঠিতে এ চিঠির অসম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ করব। ইতি ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

বার্লিন

মস্কো থেকে তোমাকে একটা বড়ো চিঠিতে রাশিয়া সম্বন্ধে আমার ধারণা লিখেছিলুম। সে চিঠি পাও তো রাশিয়া সম্বন্ধে কিছু খবর পাবে।

এখানে চাষীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কতটা কাজ করা হচ্ছে তারই বিবরণ কিছু দিয়েছি। আমাদের দেশে যে শ্রেণীর লোক মূক মূঢ়, জীবনের সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাদের মন অন্তর-বাহিরের দৈন্যের তলায় চাপা পড়ে গেছে, এখানে সেই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হল তখন বুঝতে পারলুম সমাজের অনাদরে মানুষের চিত্তসম্পদ কত প্রভূত পরিমাণে অবলুপ্ত হয়ে থাকে—কী অসীম তার অপব্যয়, কী নিষ্ঠুর তার অবিচার।

মস্কোতে একটি কৃষিভবন দেখতে গিয়েছিলুম। এটা ওদের ক্লাবের মতো। রাশিয়ার সমস্ত ছোটোবড়ো শহরে এবং গ্রামে এ রকম আবাস ছড়ানো আছে। এ-সব জায়গায় কৃষিবিদ্যা সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেবার ব্যবস্থা আছে; যারা নিরক্ষর তাদের পড়াশুনো শেখানোর উপায় করেছে, এখানে বিশেষ বিশেষ ক্লাসে বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করার ব্যবস্থা কৃষাণদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এই রকম প্রত্যেক বাড়িতে প্রাকৃতিক সামাজিক সকলপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয়ের মিয়ুজিয়ম, তা ছাড়া চাষীদের সকলপ্রকার প্রয়োজনের উপযোগী পরামর্শ দেবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

চাষীরা কোনো উপলক্ষে গ্রাম থেকে যখন শহরে আসে তখন খুব কম খরচে অন্তত তিন সপ্তাহ এই রকম বাড়িতে থাকতে পারে। এই বহুব্যাপক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সোভিয়েট গবর্মেন্ট এককালের নিরক্ষর চাষীদের চিত্তকে উদ্বোধিত করে সমাজব্যাপী নবজীবন-প্রতিষ্ঠার প্রশস্ততম ভিত্তি স্থাপন করেছে।

বাড়িতে ঢুকে দেখি, খাবার ঘরে কেউ কেউ বসে খাচ্ছে, পড়বার ঘরে এক দল খবরের কাগজ পড়তে প্রবৃত্ত। উপরে একটা বড়ো ঘরে আমি এসে বসলুম—সেখানে সবাই এসে জমা হল। তারা নানা স্থানের লোক, কেউ-বা অনেক দূর প্রদেশ থেকে এসেছে। বেশ সহজ ওদের ভাবগতিক; কোনো রকম সংকোচ নেই।…

…সুখোজ প্রদেশে জাইগান্ট-নামক একটি সর্ববিখ্যাত সরকারি কৃষিক্ষেত্র আছে। সেখানকার একজন চাষী রাশিয়ায় ঐকত্রিকতার কী রকম বিস্তার হচ্ছে সেই সম্বন্ধে আমাকে বললে, "আমাদের এই খেতে জমির পরিমাণ এক লক্ষ হেক্টার (hectare)। গত বছরে সেখানে তিন হাজার চাষী কাজ করত। এ বছরে সংখ্যা কিছু কমে গেছে, কিন্তু ফসলের ফলন আগেকার চেয়ে বাড়বার কথা। কেননা, জমিতে বিজ্ঞানসম্মত সার দেবার এবং কলের লাঙল ব্যবহার করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই রকম লাঙল এখন আমাদের তিন শো'র বেশি আছে। প্রতিদিন আমাদের আট ঘণ্টা কাজ করবার মেয়াদ। যারা তার বেশি কাজ করে তারা উপরি পারিশ্রমিক পায়। শীতের সময় খেতের কাজের পরিমাণ কমে, তখন চাষীরা বাড়ি-তৈরি রাস্তা-মেরামত প্রভৃতি নানা কাজে শহরে চলে যায়। এই অনুপস্থিতির সময়েও তারা বেতনের এক-তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকে আর তাদের পরিবারের লোক তাদের নির্দিষ্ট ঘরে বাস করতে পায়।"

আমি বললেম, "ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে আপন স্বতন্ত্র সম্পত্তি মিলিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে তোমাদের আপত্তি কিম্বা সম্মতি যদি থাকে আমাকে স্পষ্ট করে বলো।"

পরিদর্শক প্রস্তাব করলে হাত তুলে মত জানানো হোক। দেখা গেল যাদের সম্মতি নেই এমন লোকও অনেক আছে। অসম্মতির কারণ তাদের বলতে বললুম; ভালো করে বলতে পারলে না। একজন বললে, "আমি ভালো বুঝতে পারিনে।" বেশ বোঝা গেল, অসম্মতির কারণ মানবচরিত্রের মধ্যে। নিজের সম্পত্তির প্রতি নিজের মমতা, ওটা তর্কের বিষয় নয়, ওটা আমাদের

বই বইয়ের ঠিকানা

সংস্কারগত। নিজেকে আমরা প্রকাশ করতে চাই, সম্পত্তি সেই প্রকাশের একটা উপায়।

তার চেয়ে বড়ো উপায় যাদের হাতে আছে তারা মহৎ, তারা সম্পত্তিকে গ্রাহ্য করে না। সমস্ত খুইয়ে দিতে তাদের বাধা নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে আপন সম্পত্তি আপন ব্যক্তিরূপের ভাষা—সেটা হারালে সে যেন বোবা হয়ে যায়। সম্পত্তি যদি কেবল আপন জীবিকার জন্যে হত, আত্মপ্রকাশের জন্যে না হত, তা হলে যুক্তির দ্বারা বোঝানো সহজ হত যে, ওটা ত্যাগের দ্বারাই জীবিকার উন্নতি হতে পারে। আত্মপ্রকাশের উচ্চতম উপায়, যেমন বুদ্ধি, যেমন গুণপনা, কেউ কারো কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিতে পারে না ; সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া চলে, ফাঁকি দেওয়া চলে। সেই কারণে সম্পত্তি-বিভাগ ও ভোগ নিয়ে সমাজে এত নিষ্ঠুরতা, এত ছলনা এত অন্তহীন বিরোধ।

এর একটি মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে মনে করি নে—অর্থাৎ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্যে ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তা হলেই সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতায় প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না।

সোভিয়েটরা এই সমস্যাকে সমাধান করতে গিয়ে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। সেজন্যে জবরদস্তির সীমা নেই। এ কথা বলা চলে না যে মানুষের স্বাতন্ত্র্য থাকবে না, কিন্তু বলা চলে যে স্বার্থপরতা থাকবে না। অর্থাৎ, নিজের জন্যে কিছু নিজস্ব না হলে নয়, কিন্তু বাকি সমস্তই পরের জন্যে হওয়া চাই। আত্ম এবং পর উভয়কেই স্বীকার করে তবেই তার সমাধান সম্ভব। কোনো একটাকে বাদ দিতে গেলেই মানবচরিত্রের সত্যের সঙ্গে লড়াই বেধে যায়। পশ্চিম-মহাদেশের মানুষ জোর জিনিসটাকে অত্যন্ত বেশি বিশ্বাস করে। যে ক্ষেত্রে জোরের যথার্থ কাজ আছে সে ক্ষেত্রে সে খুবই ভালো, কিন্তু অন্যত্র সে বিপদ ঘটায়। সত্যের জোরকে গায়ের জোরের দ্বারা যত প্রবলভাবেই আমরা মেলাতে চেষ্টা করি একদা তত প্রবলভাবেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।...

...একটা কথা মনে রেখো, এরা নানা জাতির লোক কলকারখানার রহস্য আয়ত্ত করবার জন্যে এত অবাধ উৎসাহ এবং সুযোগ পেয়েছে তার একমাত্র কারণ, যন্ত্রকে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। যত লোকই শিক্ষা করুক তাতে সকল লোকেরই উপকার, কেবল ধনী লোকের নয়। আমরা আমাদের লোভের জন্যে যন্ত্রকে দোষ দিই, মাতলামির জন্যে শাস্তি দিই তালগাছকে। মাস্টারমশায় যেমন নিজের অক্ষমতার জন্যে বেঞ্চির উপরে দাঁড় করিয়ে রাখেন ছাত্রকে।

সেদিন মস্কৌ কৃষি-আবাসে গিয়ে স্পষ্ট করে স্বচক্ষে দেখতে পেলুম, দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার চাষীরা ভারতবর্ষের চাষীদের কত বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে। কেবল বই পড়তে শেখে নি ; ওদের মন গেছে বদলে, ওরা মানুষ

হয়ে উঠেছে। শুধু শিক্ষার কথা বললে সব কথা বলা হয় না, চাষের উন্নতির জন্যে সমস্ত দেশ জুড়ে যে প্রভূত উদ্যম সেও অসাধারণ। ভারতবর্ষেরই মতো এ দেশ কৃষিপ্রধান দেশ, এইজন্যে কৃষিবিদ্যাকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে দিতে না পারলে দেশের মানুষকে বাঁচানো যায় না। এরা সে কথা ভোলে নি। এরা অতি দুঃসাধ্য সাধন করতে প্রবৃত্ত।

সিভিল সার্ভিসের আমলাদের নিয়ে এরা মোটা মাইনের আপিস চালাবার কাজ করছে না ; যারা যোগ্য লোক, যারা বৈজ্ঞানিক, তারা সবাই লেগে গেছে। এই দশ বছরের মধ্যে এদের কৃষিচর্চা বিভাগের যে উন্নতি ঘটেছে তার খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে জগতের বৈজ্ঞানিক-মহলে। যুদ্ধের পূর্বে এ দেশে বীজ-বাছাইয়ের কোনো চেষ্টাই ছিল না। আজ প্রায় তিন কোটি মণ বাছাই-করা বীজ এদের হাতে জমেছে। তা ছাড়া নূতন শস্যের প্রচলন শুধু এদের কৃষি-কলেজের প্রাঙ্গণে নয়, দ্রুত বেগে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কৃষি সম্বন্ধে বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা আজরবাইজান উজবেকিস্তান ও জর্জিয়া য়ুক্রেন প্রভৃতি রাশিয়ার প্রত্যন্তপ্রদেশেও স্থাপিত হয়েছে।

রাশিয়ার সমস্ত দেশ-প্রদেশকে জাতি-উপজাতিকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে এত বড়ো সর্বব্যাপী অসামান্য অক্লান্ত উদ্যোগ আমাদের মতো ব্রিটিশ সাবজেক্টের সুদূর কল্পনার অতীত। এতটা দূর পর্যন্ত করে তোলা যে সম্ভব, এখানে আসবার আগে কখনো আমি তা মনেও করতে পারি নি। কেননা শিশুকাল থেকে আমরা যে 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার'এর আবহাওয়ায় মানুষ সেখানে এর কাছে পৌঁছতে পারে এমন দৃষ্টান্ত দেখি নি।

এবার ইংলণ্ডে থাকতে একজন ইংরেজের কাছে প্রথম শুনেছিলুম সাধারণের কল্যাণের জন্যে এরা কী রকম অসাধারণ আয়োজন করেছে। চোখে দেখলুম। এও দেখতে পেলুম, এদের রাষ্ট্রে জাতিবর্ণবিচার একটুও নেই। সোভিয়েট শাসনের অন্তর্গত বর্বরপ্রায় প্রজার মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে এরা যে প্রকৃষ্ট প্রণালীর ব্যবস্থা করেছে ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষে তা দুর্লভ। অথচ এই অশিক্ষার অনিবার্য ফলে আমাদের বুদ্ধিতে চরিত্রে যে দুর্বলতা, ব্যবহারে যে মূঢ়তা, দেশ-বিদেশের কাছে তার রটনা চলছে। ইংরেজিতেই কথা চলিত আছে, যে কুকুরকে ফাঁসি দিতে হবে তাকে বদনাম দিলে কাজ সহজ হয়। যাতে বদনামটা কোনোদিন না ঘোচে তার উপায় করলে যাবজ্জীবন মেয়াদ ও ফাঁসি দুইই মিলিয়ে দেওয়া চলে। ইতি ১ অক্টোবর ১৯৩০

●

বার্লিন

রাশিয়া ঘুরে এসে আজ আমেরিকার মুখে চলেছি, এমন সন্ধিক্ষণে তোমার চিঠি পেলুম। রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে।

বই বইয়ের ঠিকানা

দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল তারা সমাজের অন্ধকুঠরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এত কালের মরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত সচেষ্ট, সচেতন। এদের সামনে একটা নূতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত—সর্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণমাত্রায়।

এরা তিনটে জিনিস নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে—শিক্ষা কৃষি এবং যন্ত্র। এই তিন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত অন্ন এবং কর্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা করছে। আমাদের দেশের মতোই এখানকার মানুষ কৃষিজীবী। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষক এক দিকে মূঢ়, আর-এক দিকে অক্ষম, শিক্ষা এবং শক্তি দুই থেকেই বঞ্চিত। তার একমাত্র ক্ষীণ আশ্রয় হচ্ছে প্রথা—পিতামহের আমলের চাকরের মতো সে কাজ করে কম, অথচ কর্তৃত্ব করে বেশি। তাকে মেনে চলতে হলে তাকে এগিয়ে চলবার উপায় থাকে না। অথচ শত শত বৎসর থেকে সে খুঁড়িয়ে চলছে।

আমাদের দেশে কোনো এক সময়ে গোবর্ধনধারী কৃষ্ণ বোধ হয় ছিলেন কৃষির দেবতা, গোয়ালার ঘরে তাঁর বিহার; তাঁর দাদা বলরাম, হলধর। ঐ লাঙল-অস্ত্রটা হল মানুষের যন্ত্রবলের প্রতীক। কৃষিকে বলদান করেছে যন্ত্র। আজকের দিনে আমাদের কৃষিক্ষেত্রের কোনো কিনারায় বলরামের দেখা নেই—তিনি লজ্জিত—যে দেশে তাঁর অস্ত্রে তেজ আছে সেই সাগরপারে তিনি চলে গেছেন। রাশিয়ায় কৃষি বলরামকে ডাক দিয়েছে, দেখতে দেখতে সেখানকার কেদারখণ্ডগুলো অখণ্ড হয়ে উঠল, তাঁর নূতন হলের স্পর্শে অহল্যাভূমিতে প্রাণসঞ্চার হয়েছে।

একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, রামেরই হলযন্ত্রধারী রূপ হচ্ছে বলরাম।

১৯১৭ খৃস্টাব্দে এখানে যে বিপ্লব হয়ে গেল তার আগে এ দেশে শতকরা নিরানব্বই জন চাষী আধুনিক হলযন্ত্র চক্ষেও দেখে নি। তারা সেদিন আমাদেরই চাষীদের মতো সম্পূর্ণ দুর্বলরাম ছিল—নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্বাক। আজ দেখতে দেখতে এদের খেতে হাজার হাজার হলযন্ত্র নেমেছে। আগে এরা ছিল যাকে আমাদের ভাষায় বলে কৃষ্ণের জীব—আজ এরা হয়েছে বলরামের দল।

কিন্তু শুধু যন্ত্রে কোনো কাজ হয় না, যন্ত্রী যদি মানুষ না হয়ে ওঠে। এদের খেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে। এখানকার শিক্ষার কাজ সজীব প্রণালীতে। আমি বরাবর বলে এসেছি, শিক্ষাকে জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে

চালানো উচিত। তার থেকে অবচ্ছিন্ন করে নিলে ওটা ভাণ্ডারের সামগ্রী হয়, পাকযন্ত্রের খাদ্য হয় না।

এখানে এসে দেখলুম, এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলেছে। তার কারণ এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখে নি। এরা পাস করবার কিম্বা পণ্ডিত করবার জন্যে শেখায় না—সর্বতোভাবে মানুষ করবার জন্যে শেখায়। আমাদের দেশে বিদ্যালয় আছে, কিন্তু বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি বড়ো, সংবাদের চেয়ে শক্তি বড়ো। পুঁথির পঙ্‌ক্তির বোঝার তলে চিত্তকে চালনা করবার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। কতবার চেষ্টা করেছি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে, কিন্তু দেখতে পাই তাদের মনে কোনো প্রশ্নও নেই। জানতে চাওয়ার সঙ্গে জানতে পাওয়ার যে যোগ আছে সে যোগ ওদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওরা কোনোদিন জানতে চাইতে শেখে নি—প্রথম থেকেই কেবলই বাঁধা নিয়মে ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তার পরে সেই শিক্ষিত বিদ্যার পুনরাবৃত্তি করে ওরা পরীক্ষার মার্কা সংগ্রহ করে।

আমার মনে আছে শান্তিনিকেতনে যখন দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে মহাত্মাজির ছাত্রেরা ছিল তখন একদিন তাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আমাদের ছেলেদের সঙ্গে পারুলবনে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা কর কি। সে বললে, জানি নে। এ সম্বন্ধে সে তাদের দলপতিকে জিজ্ঞাসা করতে চাইলে। আমি বললুম, জিজ্ঞাসা পরে কোরো, কিন্তু বেড়াতে যেতে তোমার ইচ্ছা আছে কি না আমাকে বলো। সে বললে, আমি জানি নে। অর্থাৎ, এ ছাত্র স্বয়ং কোনো বিষয়ে কিছু ইচ্ছা করবার চর্চাই করে না—তাকে চালনা করা হয়, সে চলে, আপনা থেকে তাকে কিছু ভাবতে হয় না।

এ রকম সামান্য বিষয়ে মনের এতটা অসাড়তা যদিও সাধারণত আমাদের ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায় না, কিন্তু এর চেয়ে আরও একটুখানি শক্ত রকমের চিন্তনীয় বিষয় যদি পাড়া যায় তবে দেখা যাবে, সেজন্যে এদের মন একটুখানিও প্রস্তুত নেই। এরা কেবলই অপেক্ষা করে থাকে আমরা উপরে থেকে কী বলতে পারি তাই শোনবার জন্যে। সংসারে এরকম মনের মতো নিরুপায় মন আর হতে পারে না।

এখানে শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে নানা রকম পরীক্ষা চলছে, তার বিস্তারিত বিবরণ পরে দেবার চেষ্টা করব। শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে রিপোর্ট এবং বই পড়ে অনেকটা জানা যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষার চেহারা মানুষের মধ্যে যেটা প্রত্যক্ষ দেখা যায় সেটাই সব চেয়ে বড়ো কাজের। সেইটে সেদিন দেখে এসেছি। পায়োনিয়র্স্ কম্যুন বলে এ দেশে যে-সব আশ্রম স্থাপিত হয়েছে তারই একটা দেখতে সেদিন গিয়েছিলুম। আমাদের শান্তিনিকেতনে যে রকম ব্রতীবালক ব্রতীবালিকা আছে এদের পায়োনিয়র্স্-দল কতকটা সেই ধরনের।

বাড়িতে প্রবেশ করেই দেখি, আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সিঁড়ির দুধারে বালক-বালিকার দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে আসতেই ওরা আমার

বই বইয়ের ঠিকানা

চার দিকে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল, যেন আমি ওদেরই আপন দলের। একটা কথা মনে রেখো, এরা সকলেই পিতৃমাতৃহীন। এরা যে শ্রেণী থেকে এসেছে একদা সে শ্রেণীর মানুষ কারও কাছে কোনো যত্নের দাবি করতে পারত না, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে নিতান্ত নীচ বৃত্তির দ্বারা দিনপাত করত। এদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, অনাদরের অসম্মানের কুয়াশা-ঢাকা চেহারা একেবারেই নয়। সংকোচ নেই, জড়তা নেই। তা ছাড়া সকলেরই মনের মধ্যে একটা পণ, সামনে একটা কর্মক্ষেত্র আছে বলে মনে হয়; যেন সর্বদা তৎপর হয়ে আছে, কোনো-কিছুতে অনবধানের শৈথিল্য থাকবার জো নেই।

অভ্যর্থনার জবাবে আমি ওদের অল্প যা বলেছিলুম তারই প্রসঙ্গক্রমে একজন ছেলে বললে, "পরশ্রমজীবীরা (bourgeoisie) নিজের ব্যক্তিগত মুনফা খোঁজে, আমরা চাই দেশের ঐশ্বর্যে সকল মানুষের সমান স্বত্ব থাকে। এই বিদ্যালয়ে আমরা সেই নীতি অনুসারে চলে থাকি।"

একটি মেয়ে বললে, "আমরা নিজেরা নিজেদের চালনা করি আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে কাজ করে থাকি, যেটা সকলের পক্ষেই শ্রেয় সেইটাই আমাদের স্বীকার্য।"

আর একটি ছেলে বললে, "আমরা ভুল করতে পারি, কিন্তু যদি ইচ্ছা করি যারা আমাদের চেয়ে বড়ো তাদের পরামর্শ নিয়ে থাকি। প্রয়োজন হলে ছোটো ছেলেমেয়েরা বড়ো ছেলেমেয়েদের মত নেয়, এবং তারা যেতে পারে তাদের শিক্ষকদের কাছে। আমাদের দেশের শাসনতন্ত্রের এই বিধি। আমরা এখানে সেই বিধিরই চর্চা করে থাকি।"

এর থেকে বুঝতে পারবে, এদের শিক্ষা কেবল পুঁথিপড়ার শিক্ষা নয়। নিজের ব্যবহারকে চরিত্রকে একটা বৃহৎ লোকযাত্রার অনুগত করে এরা তৈরি করে তুলছে। সেই সম্বন্ধে এদের একটা পণ আছে এবং সেই পণ-রক্ষায় এদের গৌরববোধ।

আমার ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষকদের আমি অনেকবার বলেছি, লোকহিত এবং স্বায়ত্তশাসনের যে দায়িত্ববোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি করে থাকি শান্তিনিকেতনের ছোটো সীমার মধ্যে তারই একটা সম্পূর্ণ রূপ দিতে চাই। এখানকার ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবেত স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার—সেই ব্যবস্থায় যখন এখানকার সমস্ত কর্ম সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন এইটুকুর মধ্যে আমাদের সমস্ত দেশের সমস্যার পূরণ হতে পারবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সাধারণ হিতের অনুগত করে তোলবার চর্চা রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে হতে পারে না, তার জন্যে ক্ষেত্র তৈরি করতে হয়—সেই ক্ষেত্র আমাদের আশ্রম।

একটা ছোটো দৃষ্টান্ত তোমাকে দিই। আহারের রুচি এবং অভ্যাস সম্বন্ধে বাংলাদেশে যেমন কদাচার এমন আর কোথাও নেই। পাকশালা এবং পাকযন্ত্রকে অত্যন্ত অনাবশ্যক আমরা ভারগ্রস্ত করে তুলেছি। এ সম্বন্ধে সংস্কার করা বড়ো কঠিন। স্বজাতির চিরন্তন হিতের প্রতি লক্ষ্য করে আমাদের

ছাত্ররা ও শিক্ষকেরা পথ্য সম্বন্ধে নিজের রুচিকে যথোচিতভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার পণ গ্রহণ করতে যদি পারত তা হলে আমি যাকে শিক্ষা বলি সেই শিক্ষা সার্থক হত। তিন-নয়ে সাতাশ হয় এইটে মুখস্থ করাকে আমরা শিক্ষা বলে গণ্য করে থাকি, সে সম্বন্ধে ছেলেরা কোনোমতেই ভুল না করে তার প্রতি লক্ষ্য না করাকে গুরুতর অপরাধ বলে জানি, কিন্তু যে জিনিসটাকে উদরস্থ করি সে সম্বন্ধে শিক্ষাকে তার চেয়ে কম দাম দেওয়াই মূর্খতা। আমাদের প্রতিদিনের খাওয়া সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত দেশের কাছে দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব অতি গুরুতর—সম্পূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে এটাকে মনে রাখা পাসের মার্কার চেয়ে অনেক বড়ো।...

...তার পরে আমাকে দেখাতে চাইলে কাকে ওরা বলে সজীব সংবাদপত্র। একটি মেয়ে বললে, "দেশের সম্বন্ধে আমাদের অনেক খবর জানতে হয়, আমরা যা জানি তাই আবার অন্য সবাইকে জানানো আমাদের কর্তব্য। কেননা ঠিক-মত করে তথ্যগুলিকে জানতে এবং তাদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারলে তবেই আমাদের কাজ খাঁটি হতে পারে।"

একটি ছেলে বললে, "প্রথমে আমরা বই থেকে, আমাদের শিক্ষকের কাছ থেকে শিখি; তার পরে তাই নিয়ে আমরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করি, তার পরে সেইগুলি সাধারণকে জানাবার জন্যে যাবার হুকুম হয়।"

সজীব সংবাদপত্র অভিনয় করে আমাকে দেখালে। বিষয়টা হচ্ছে এদের পঞ্চবার্ষিক সংকল্প। ব্যাপারটা হচ্ছে, এরা কঠিন পণ করেছে, পাঁচ বছরের মধ্যে সমস্ত দেশকে যন্ত্রশক্তিতে সুদক্ষ করে তুলবে, বিদ্যুৎশক্তি বাষ্পশক্তিকে দেশের এক ধার থেকে আর-এক ধার পর্যন্ত কাজে লাগিয়ে দেবে। এদের দেশ বলতে কেবল য়ুরোপীয় রাশিয়া বোঝায় না। এশিয়ার অনেক দূর পর্যন্ত তার বিস্তার। সেখানেও নিয়ে যাবে এদের শক্তির বাহনকে। ধনীকে ধনীতর করবার জন্যে নয়, জনসমষ্টিকে শক্তিসম্পন্ন করবার জন্যে—সেই জনসমষ্টির মধ্যে মধ্য-এশিয়ার অসিতচর্ম মানুষও আছে। তারাও শক্তির অধিকারী হবে বলে ভয় নেই, ভাবনা নেই।

এই কাজের জন্যে এদের প্রভূত টাকার দরকার; য়ুরোপীয় বড়োবাজারে এদের হুণ্ডি চলে না, নগদ দামে কেনা ছাড়া উপায় নেই। তাই পেটের অন্ন দিয়ে এরা জিনিস কিনছে, উৎপন্ন শস্য পশুমাংস ডিম মাখন সমস্ত চালান হচ্ছে বিদেশের হাটে। সমস্ত দেশের লোক উপবাসের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনও দেড় বছর বাকি। অন্য দেশের মহাজনরা খুশি নয়। বিদেশী এঞ্জিনিয়াররা এদের কলকারখানা অনেক নষ্টও করেছে। ব্যাপারটা বৃহৎ ও জটিল, সময় অত্যন্ত অল্প। সময় বাড়াতে সাহস হয় না, কেননা সমস্ত ধনীজগতের প্রতিকূলতার মুখে এরা দাঁড়িয়ে, যত শীঘ্র সম্ভব আপন শক্তিতে ধন-উৎপাদন এদের পক্ষে নিতান্ত দরকার। তিন বছর কষ্টে কেটে গেছে, এখনও দু বছর বাকি।

বই বইয়ের ঠিকানা

সজীব খবরের কাগজটা অভিনয়ের মতো ; নেচে গেয়ে পতাকা তুলে এরা জানিয়ে দিতে চায় দেশের অর্থশক্তিকে যন্ত্রবাহিনী করে ক্রমে ক্রমে কী পরিমাণে এরা সফলতা লাভ করছে। দেখবার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। যারা জীবনযাত্রার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে বহু কষ্টে কাল কাটাচ্ছে তাদের বোঝানো চাই, অনতিকালের মধ্যে এই কষ্টের অবসান হবে এবং বদলে যা পাবে তার কথা স্মরণ করে যেন তারা আনন্দের সঙ্গে গৌরবের সঙ্গে কষ্টকে বরণ করে নেয়।

এর মধ্যে সান্ত্বনার কথাটা এই যে, কোনো এক দল লোক নয়, দেশের সকল লোকই একসঙ্গে তপস্যায় প্রবৃত্ত। এই সজীব সংবাদপত্র অন্য দেশের বিবরণও এইরকম ক'রে প্রচার করে। মনে পড়ল, পতিসরে দেহতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব নিয়ে এক যাত্রার পালা শুনেছিলাম—প্রণালীটা একই, লক্ষ্যটা আলাদা। মনে করছি দেশে ফিরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে সুরুলে সজীব সংবাদপত্র চালাবার চেষ্টা করব।

ওদের দৈনিক কার্যপদ্ধতি হচ্ছে এইরকম। সকাল সাতটার সময় ওরা বিছানা থেকে ওঠে। তার পর পনেরো মিনিট ব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতরাশ। আটটার সময় ক্লাস বসে। একটার সময় কিছুক্ষণের জন্য আহার ও বিশ্রাম। বেলা তিনটে পর্যন্ত ক্লাস চলে। শেখবার বিষয় হচ্ছে—ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক প্রাকৃতবিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ন, প্রাথমিক জীববিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, হাতের কাজ, ছুতোরের কাজ, বই-বাঁধাই, হাল আমলের যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার, ইত্যাদি। রবিবার নেই। প্রত্যেক পঞ্চম দিনে ছুটি। তিনটের পরে বিশেষ দিনের কার্য-তালিকা অনুসারে পায়োনিয়ররা (পুরোযায়ীর দল) কারখানা, হাসপাতাল, গ্রাম প্রভৃতি দেখতে যায়। পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করতে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মাঝে মাঝে নিজেরা অভিনয় করে ; মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখতে, সিনেমা দেখতে যায়। সন্ধ্যাবেলায় গল্প পড়া, গল্প বলা, তর্কসভা, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সভা। ছুটির দিনে পায়োনিয়ররা কিছু পরিমাণে নিজেদের কাপড় কাচে, ঘর পরিষ্কার করে, বাড়ি এবং বাড়ির চারি দিক পরিষ্কার করে, ক্লাস-পাঠের অতিরিক্ত পড়া পড়ে, বেড়াতে যায়। ভর্তি হবার বয়েস সাত-আট, বিদ্যালয় ত্যাগ করবার বয়েস ষোলো। এদের অধ্যয়নকাল আমাদের দেশের মতো লম্বা লম্বা ছুটি দিয়ে ফাঁক করে দেওয়া নয়, সুতরাং অল্প দিনে অনেক বেশি পড়তে পারে।

এখানকার বিদ্যালয়ের মস্ত একটা গুণ, এরা যা পড়ে তার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকে। তাতে পড়ার বিষয় মনে চিত্রিত হয়ে ওঠে, ছবির হাত পেকে যায়, আর পড়ার সঙ্গে রূপসৃষ্টি করার আনন্দ মিলিত হয়। হঠাৎ মনে হতে পারে, এরা বুঝি কেবলই কাজের দিকে ঝোঁক দিয়েছে, গোঁয়ারের মতো ললিতকলাকে অবজ্ঞা ক'রে। একেবারেই তা নয়। সম্রাটের আমলের তৈরি বড়ো বড়ো রঙ্গশালায় উচ্চ-অঙ্গের নাটক ও অপেরার অভিনয়ে বিলম্বে টিকিট পাওয়াই শক্ত হয়।

নাট্যাভিনয়কলায় এদের মতো ওস্তাদ জগতে অল্পই আছে, পূর্বতন কালে আমীর-ওমরাওরাই সে-সমস্ত ভোগ করে এসেছেন—তখনকার দিনে যাদের পায়ে না ছিল জুতো, গায়ে ছিল ময়লা ছেঁড়া কাপড়, আহার ছিল আধপেটা, দেবতা মানুষ সবাইকেই যারা অহোরাত্র ভয় করে করে বেড়িয়েছে, পরিত্রাণের জন্যে পুরুত-পাণ্ডাকে দিয়েছে ঘুস, আর মনিবের কাছে ধুলোয় মাথা লুটিয়ে আত্মাবমাননা করেছে, তাদেরই ভিড়ে থিয়েটারে জায়গা পাওয়া যায় না।

আমি যেদিন অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম সেদিন হচ্ছিল টলস্টয়ের রিসারেক্‌শান। জিনিসটা জনসাধারণের পক্ষে সহজে উপভোগ্য বলে মনে করা যায় না। কিন্তু শ্রোতারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে শুনছিল। অ্যাংলোস্যাক্‌সন চাষী-মজুর-শ্রেণীর লোকে এ জিনিস রাত্রি একটা পর্যন্ত এমন স্তব্ধ শান্ত ভাবে উপভোগ করছে এ কথা মনে করা যায় না, আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দাও।

আর-একটা উদাহরণ দিই। মস্কো শহরে আমার ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। এ ছবিগুলো সৃষ্টিছাড়া সে কথা বলাই বাহুল্য। শুধু যে বিদেশী তা নয়, বলা চলে যে তারা কোনো দেশীই নয়। কিন্তু লোকের ঠেলাঠেলি ভিড়। অল্প কয়দিনে পাঁচ হাজার লোক ছবি দেখেছে। আর যে যা বলুক, অন্তত আমি তো এদের রুচির প্রশংসা না করে থাকতে পারব না।

রুচির কথা ছেড়ে দাও, মনে করা যাক এ একটা ফাঁকা কৌতূহল। কিন্তু কৌতূহল থাকাটাই যে জাগ্রত চিত্তের পরিচয়। মনে আছে, একদা আমাদের ইঁদারার জন্যে আমেরিকা থেকে একটা বায়ুচল চক্রযন্ত্র এনেছিলুম, তাতে কুয়োর গভীর তলা থেকে জল উঠেছিল। কিন্তু যখন দেখলুম ছেলেদের চিত্তের গভীর তলদেশ থেকে একটুও কৌতূহল টেনে তুলতে পারলে না তখন মনে বড়োই ধিক্‌কার লাগল। এই তো আমাদের ওখানে আছে বৈদ্যুত আলোর কারখানা, ক'জন ছেলের তাতে একটুও ঔৎসুক্য আছে। অথচ এরা তো ভদ্রশ্রেণীর ছেলে। বুদ্ধির জড়তা যেখানে সেইখানে কৌতূহল দুর্বল।

এখানে ইস্কুলের ছেলেদের আঁকা অনেকগুলি ছবি আমরা পেয়েছি—দেখে বিস্মিত হতে হয়—সেগুলো রীতিমতো ছবি, কারো নকল নয়, নিজের উদ্ভাবন। এখানে নির্মাণ এবং সৃষ্টি দুইয়েরই প্রতি লক্ষ্য দেখে নিশ্চিত হয়েছি। এখানে এসে অবধি স্বদেশের শিক্ষার কথা অনেক ভাবতে হয়েছে। আমার নিঃসহায় সামান্য শক্তি দিয়ে কিছু এর আহরণ এবং প্রয়োগ করতে চেষ্টা করব। কিন্তু আর সময় কই—আমার পক্ষে পঞ্চবার্ষিক সংকল্পও হয়তো পূরণ না হতে পারে। প্রায় ত্রিশ বছর যেমন একা-একা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লগি ঠেলে কাটিয়েছি, আরো দু-চার বছর তেমনি করেই ঠেলতে হবে ; বিশেষ এগোবে না তাও জানি, তবু নালিশ করব না। আজ আর সময় নেই। আজ রাত্রের গাড়িতে জাহাজের ঘাটের অভিমুখে যেতে হবে, সমুদ্রে কাল পাড়ি দেব।

ইতি ২ অক্টোবর ১৯৩০

বই বইয়ের ঠিকানা

ব্রেমেন স্টীমার
অতলান্তিক

রাশিয়া থেকে ফিরে এসে আজ চলেছি আমেরিকার ঘাটে। কিন্তু রাশিয়ার স্মৃতি আজও আমার সমস্ত মন অধিকার করে আছে। তার প্রধান কারণ, অন্যান্য যে-সব দেশে ঘুরেছি তারা সমগ্রভাবে মনকে নাড়া দেয় না। তাদের নানা কর্মের উদ্যম আছে আপন আপন মহলে। কোথাও আছে পলিটিক্স্‌, কোথাও আছে হাসপাতাল, কোথাও আছে বিশ্ববিদ্যালয়, কোথাও আছে ম্যুজিয়ম—বিশেষজ্ঞরা তাই নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে সমস্ত দেশটা এক অভিপ্রায় মনে নিয়ে, সমস্ত কর্মবিভাগকে এক স্নায়ুজালে জড়িত ক'রে এক বিরাট দেহ, এক বৃহৎ ব্যক্তিস্বরূপ ধারণ করেছে। সবকিছু মিলে গেছে একটি অখণ্ড সাধনার মধ্যে।

যে-সব দেশে অর্থ এবং শক্তির অধ্যবসায় ব্যক্তিগত স্বার্থ-দ্বারা বিভক্ত সেখানে এ রকম চিত্তের নিবিড় ঐক্য অসম্ভব। যখন এখানে পঞ্চবার্ষিক য়ুরোপীয় যুদ্ধ চলছিল তখন দায়ে পড়ে দেশের অধিকাংশ ভাবনা ও কাজ এক অভিপ্রায়ে মিলিত হয়ে এক চিত্তের অধিকারে এসেছিল ; এটা হয়েছিল অস্থায়ীভাবে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় যে কাণ্ড চলছে তার প্রকৃতিই এই—সাধারণের কাজ, সাধারণের চিত্ত, সাধারণের স্বত্ব বলে একটা অসাধারণ সত্তা এরা সৃষ্টি করতে লেগে গেছে।

উপনিষদের একটা কথা আমি এখানে এসে খুব স্পষ্ট করে বুঝেছি—মা গৃধঃ। লোভ কোরো না। কেন লোভ করবে না ? যেহেতু সমস্ত কিছু এক সত্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ব্যক্তিগত লোভেতেই সেই একের উপলব্ধির মধ্যে বাধা আনে। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। সেই একের থেকে যা আসছে তাকেই ভোগ করো। এরা আর্থিক দিক থেকে সেই কথাটা বলছে। সমস্ত মানবসাধারণের মধ্যে এরা একটি অদ্বিতীয় মানবসত্যকেই বড়ো বলে মানে ; সেই একের যোগে উৎপন্ন যা-কিছু, এরা বলে, তাকেই সকলে মিলে ভোগ করো। মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং। কারও ধনে লোভ কোরো না। কিন্তু ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনের লোভ আপনিই হয়। সেইটিকে ঘুচিয়ে দিয়ে এরা বলতে চায় : তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

য়ুরোপে অন্য-সকল দেশেরই সাধনা ব্যক্তির লাভকে ব্যক্তির ভোগকে নিয়ে। তারই মন্থন-আলোড়ন খুবই প্রচণ্ড, আর পৌরাণিক সমুদ্রমন্থনের মতোই তার থেকে বিষ ও সুধা দুইই উঠেছে। কিন্তু সুধার ভাগ কেবল এক দলেই পাচ্ছে, অধিকাংশই পাচ্ছে না—এই নিয়ে অসুখ অশান্তির সীমা নেই। সবাই মেনে নিয়েছিল এইটেই অনিবার্য ; বলেছিল মানবপ্রকৃতির মধ্যেই লোভ আছে এবং লোভের কাজই হচ্ছে ভোগের মধ্যে অসমান ভাগ করে দেওয়া।

অতএব প্রতিযোগিতা চলবে এবং লড়াইয়ের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। কিন্তু সোভিয়েটরা যা বলতে চায় তার থেকে বুঝতে হবে, মানুষের মধ্যে ঐক্যটাই সত্য ; ভাগটাই মায়া—সম্যক চিন্তা সম্যক চেষ্টা-দ্বারা সেটাকে যে মুহূর্তে মানব না সেই মুহূর্তেই স্বপ্নের মতো সে লোপ পাবে।

রাশিয়ায় সেই না-মানার চেষ্টা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকাণ্ড করে চলছে। সব-কিছু এই এক চেষ্টার অন্তর্গত হয়ে গেছে। এইজন্যে রাশিয়ায় এসে একটা বিরাট চিত্তের স্পর্শ পাওয়া গেল। শিক্ষার বিরাট পর্ব আর কোনো দেশে এমন করে দেখি নি, তার কারণ অন্য দেশে শিক্ষা যে করে শিক্ষার ফল তারই—'দুধুভাতু খায় সেই'। এখানে প্রত্যেকের শিক্ষায় সকলের শিক্ষা। একজনের মধ্যে শিক্ষার যে অভাব হবে সে অভাব সকলকেই লাগবে। কেননা, সম্মিলিত শিক্ষারই যোগে এরা সম্মিলিত মনকে বিশ্বসাধারণের কাজে সফল করতে চায়। এরা 'বিশ্বকর্মা' ; অতএব এদের বিশ্বমনা হওয়া চাই। অতএব এদের জন্যেই যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা ব্যাপারকে এরা নানা প্রণালী দিয়ে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ম্যুজিয়ম। নানাপ্রকার ম্যুজিয়মের জালে এরা সমস্ত গ্রাম শহরকে জড়িয়ে ফেলেছে। সে ম্যুজিয়ম আমাদের শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরির মতো অকারী (passive) নয়, সকারী (active)।

রাশিয়ায় region study অর্থাৎ স্থানিক তথ্যসন্ধানের উদ্যোগ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এরকম শিক্ষাকেন্দ্র প্রায় দু হাজার আছে, তার সদস্য-সংখ্যা সত্তর হাজার পেরিয়ে গেছে। এই-সব কেন্দ্রে তত্তৎস্থানের অতীত ইতিহাস এবং অতীত ও বর্তমানের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান হয়। তা ছাড়া সে-সব জায়গার উৎপাদিকা শক্তি কিরকম শ্রেণীর, কিম্বা কোনো খনিজ পদার্থ সেখানে প্রচ্ছন্ন আছে কি না, তার খোঁজ হয়ে থাকে। এই-সব কেন্দ্রের সংগে যে-সব ম্যুজিয়ম আছে তারই যোগে সাধারণের শিক্ষা-বিস্তার একটা গুরুতর কর্তব্য। সোভিয়েট রাষ্ট্রে সর্বসাধারণের জ্ঞানোন্নতির যে নবযুগ এসেছে, এই স্থানিক তথ্যসন্ধানের ব্যাপক চর্চা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ম্যুজিয়ম তার একটা প্রধান প্রণালী।

এই রকম নিকটবর্তী স্থানের তথ্যানুসন্ধান শান্তিনিকেতনের কালীমোহন কিছু পরিমাণে করেছেন, কিন্তু এই কাজের সংগে আমাদের ছাত্র ও শিক্ষকেরা যুক্ত না থাকাতে তাদের এতে কোনো উপকার হয় নি। সন্ধান করবার ফল পাওয়ার চেয়ে সন্ধান করবার মন তৈরি করা কম কথা নয়। কলেজ-বিভাগের ইকনমিক্‌স্‌ ক্লাসের ছাত্রদের নিয়ে প্রভাত এই রকম চর্চার পত্তন করেছেন শুনেছিলুম ; কিন্তু এ কাজটা আরো বেশি সাধারণভাবে করা দরকার, পাঠভবনের ছেলেদেরও এই কাজে দীক্ষিত করা চাই, আর এই সংগে সমস্ত প্রাদেশিক সামগ্রীর ম্যুজিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক।

এখানে ছবির ম্যুজিয়মের কাজ কী রকম চলে তার বিবরণ শুনলে নিশ্চয় তোমার ভালো লাগবে। মস্কো শহরে ট্রেটিয়াকভ গ্যালারি (Tretyakov

বই বইয়ের ঠিকানা

gallery) নামে এক বিখ্যাত চিত্রভাণ্ডার আছে। সেখানে ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত এক বছরের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ লোক ছবি দেখতে এসেছে। যত দর্শক আসতে চায় তাদের ধরানো শক্ত হয়ে উঠেছে। সেইজন্যে ছুটির দিনে আগে থাকতে দর্শকদের নাম রেজেস্ট্রি করানো দরকার হয়েছে।

১৯১৭ খৃস্টাব্দে সোভিয়েট শাসন প্রবর্তিত হবার পূর্বে যে-সব দর্শক এই রকম গ্যালারিতে আসত তারা ধনী মানী জ্ঞানী দলের লোক এবং তারা, যাদের এরা বলে bourgeoisie, অর্থাৎ পরশ্রমজীবী। এখন আসে অসংখ্য স্বশ্রমজীবীর দল, যথা রাজমিস্ত্রি, লোহার, মুদি, দর্জি ইত্যাদি। আর আসে সোভিয়েট সৈনিক, সেনানায়ক, ছাত্র এবং চাষী-সম্প্রদায়।

আর্টের বোধ ক্রমে ক্রমে এদের মনে জাগিয়ে তোলা আবশ্যক। এদের মতো আনাড়িদের পক্ষে চিত্রকলার রহস্য প্রথম দৃষ্টিতে ঠিকমতো বোঝা অসাধ্য। দেয়ালে দেয়ালে ছবি দেখে দেখে এরা ঘরে ঘরে বেড়ায়, বুদ্ধি যায় পথ হারিয়ে। এই কারণে প্রায় সব মূ্যজিয়মেই উপযুক্ত পরিচায়ক রেখে দেওয়া হয়েছে। ম্যুজিয়মের শিক্ষাবিভাগে কিম্বা অন্যত্র তদনুরূপ রাষ্ট্রকর্মশালায় যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক কর্মী আছে তাদেরই মধ্যে থেকে পরিচায়ক বাছাই করে নেওয়া হয়। যারা দেখতে আসে তাদের সঙ্গে এদের দেনাপাওনার কোনো কারবার থাকে না। ছবিতে যে বিষয়টা প্রকাশ করছে সেইটে দেখলেই যে ছবি দেখা হয়, দর্শকেরা যাতে সেই ভুল না করে পরিদর্শয়িতার সেটা জানা চাই।

চিত্রবস্তুর সংস্থান (composition), তার বর্ণকল্পনা (colour scheme), তার অঙ্কন, তার অবকাশ (space) তার উজ্জ্বলতা (illumination), যাতে করে তার বিশেষ সম্প্রদায় ধরা পড়ে সেই তার বিশেষ আঙ্গিক (technique), এ-সকল বিষয়ে আজও অল্প লোকেরই জানা আছে। এইজন্যে পরিচায়কের বেশ দস্তুরমতো শিক্ষা থাকা চাই, তবেই দর্শকদের ঔৎসুক্য ও মনোযোগ সে জাগিয়ে রাখতে পারে। আর-একটি কথা তাকে বুঝতে হবে, ম্যুজিয়মে কেবল একটিমাত্র ছবি নেই, অতএব একটা ছবিকে চিনে নেওয়া দর্শকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়, ম্যুজিয়মে যে-সব বিশেষ শ্রেণীর ছবি রক্ষিত আছে তাদের শ্রেণীগত রীতি বোঝা চাই। পরিচায়কদের কর্তব্য কয়েকটি করে বিশেষ ছাঁদের ছবি বেছে নিয়ে তাদের প্রকৃতি বুঝিয়ে দেওয়া। আলোচ্য ছবিগুলির সংখ্যা খুব বেশি হলে চলবে না এবং সময়ও বিশ মিনিটের বেশি হওয়া ঠিক নয়। ছবির যে একটি স্বকীয় ভাষা, একটি ছন্দ আছে, সেইটেই বুঝিয়ে দেবার বিষয় ; ছবির রূপের সঙ্গে ছবির বিষয়ের ও ভাবের সম্বন্ধ কী সেইটে ব্যাখ্যা করা দরকার। ছবির পরস্পর-বৈপরীত্য দ্বারা তাদের বিশেষত্ব বোঝানো অনেক সময় কাজে লাগে। কিন্তু দর্শকের মন একটুমাত্র শ্রান্ত হলেই তাদের তখন ছুটি দেওয়া চাই।

অশিক্ষিত দর্শকদের এরা কী করে ছবি দেখতে শেখায় তারই একটা রিপোর্ট থেকে উল্লিখিত কথাগুলি তোমাকে সংগ্রহ করে পাঠালুম। এর থেকে আমাদের দেশের লোকের যেটি ভাববার কথা আছে সেটি হচ্ছে এই : পূর্বে যে চিঠি

লিখেছি তাতে আমি বলেছি, সমস্ত দেশকে কৃষিবলে যন্ত্রবলে অতি দ্রুত মাত্রায় শক্তিমান করে তোলবার জন্যে এরা একান্ত উদ্যমের সঙ্গে লেগে গেছে। এটা ঘোরতর কেজো কথা। অন্য-সব ধনী দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের জোরে টিঁকে থাকবার জন্যে এদের এই বিপুল সাধনা। আমাদের দেশে যখন এই জাতীয় দেশব্যাপী রাষ্ট্রিক সাধনার কথা ওঠে তখনই আমরা বলতে শুরু করি, এই একটিমাত্র লাল মশাল জ্বালিয়ে তুলে দেশের অন্য-সকল বিভাগের সকল আলো নিবিয়ে দেওয়া চাই, নইলে মানুষ অন্যমনস্ক হবে। বিশেষত ললিতকলা সকল প্রকার কঠোর সংকল্পের বিরোধী। স্বজাতিকে পালোয়ানি করাবার জন্যে কেবলই তাল ঠুকিয়ে পাঁয়তারা করাতে হবে ; সরস্বতীর বীণাটাকে নিয়ে যদি লাঠি বানানো সম্ভব হয় তবেই সেটা চলবে, নতুবা নৈব নৈব চ। এই কথাগুলো যে কতখানি মেকি পৌরুষের কথা তা এখানে এলে স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে এরা দেশ জুড়ে কারখানা চালাতে যে-সব শ্রমিকদের পাকা করে তুলতে চায় তারাই যাতে শিক্ষিত মন নিয়ে ছবির রস বুঝতে পারে তারই জন্যে এত প্রভূত আয়োজন। এরা জানে, রসজ্ঞ যারা নয় তারা বর্বর ; যারা বর্বর তারা বাইরে রুক্ষ, অন্তরে দুর্বল। রাশিয়ায় নবনাট্যকলার অসামান্য উন্নতি হয়েছে। এদের ১৯১৭ খৃস্টাব্দের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর দুর্দিন দুর্ভিক্ষের মধ্যেই এরা নেচেছে, গান গেয়েছে, নাট্যাভিনয় করেছে—এদের ঐতিহাসিক বিরাট নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ঘটে নি।

মরুভূমিতে শক্তি নেই। শক্তির যথার্থ রূপ দেখা যায় সেইখানেই যেখানে পাথরের বুক থেকে জলের ধারা কল্লোলিত হয়ে বেরিয়ে আসে, যেখানে বসন্তের রূপহিল্লোলে হিমাচলের গাম্ভীর্য মনোহর হয়ে ওঠে। বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষ থেকে শক শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কালিদাসকে নিষেধ করেন নি মেঘদূত লিখতে। জাপানীরা তলোয়ার চালাতে পারে না এ কথা বলবার জো নেই, কিন্তু সমান নৈপুণ্যেই তারা তুলিও চালায়। রাশিয়ায় এসে যদি দেখতুম, এরা কেবলই মজুর সেজে কারখানাঘরের সরঞ্জাম জোগাচ্ছে আর লাঙল চালাচ্ছে, তা হলেই বুঝতুম এরা শুকিয়ে মরবে। যে বনস্পতি পল্লবমর্মর বন্ধ করে দিয়ে খট্ খট্ আওয়াজে অহংকার করে বলতে থাকে, আমার রসের দরকার নেই, সে নিশ্চয়ই ছুতোরের দোকানের নকল বনস্পতি—সে খুবই শক্ত হতে পারে, কিন্তু খুবই নিষ্ফল। অতএব আমি বীরপুরুষদের বলে রাখছি এবং তপস্বীদের সাবধান করে দিচ্ছি যে, দেশে যখন ফিরে যাব পুলিসের যষ্টিধারার শ্রাবণবর্ষণেও আমার নাচগান বন্ধ হবে না।

রাশিয়ার নাট্যমঞ্চে যে কলাসাধনার বিকাশ হয়েছে সে অসামান্য। তার মধ্যে নূতন সৃষ্টির সাহস ক্রমাগতই দেখা দিচ্ছে, এখনো থামে নি। ওখানকার সমাজবিপ্লবে এই নূতন সৃষ্টিরই অসমসাহস কাজ করেছে। এরা সমাজে রাষ্ট্রে কলাতত্ত্বে কোথাও নূতনকে ভয় করে নি।

যে পুরাতন ধর্মতন্ত্র এবং পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহু শতাব্দী ধরে এদের

বই বইয়ের ঠিকানা

বুদ্ধিকে অভিভূত এবং প্রাণশক্তিকে নিঃশেষপ্রায় করে দিয়েছে, এই সোভিয়েট-বিপ্লবীরা তাদের দুটোকেই দিয়েছে নির্মূল করে ; এত বড়ো বন্ধনজর্জর জাতিকে এত অল্প কালে এত বড়ো মুক্তি দিয়েছে দেখে মন আনন্দিত হয়। কেননা, যে ধর্ম মূঢ়তাকে বাহন ক'রে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড়ো শত্রু হতে পারে না—সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বদ্ধ করুক-না। এ পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মতো ; আলিঙ্গন ক'রে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ ক'রে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার।

সোভিয়েটরা রুশসম্রাট-কৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে এই দেশকে বাঁচিয়েছে—অন্য দেশের ধার্মিকেরা ওদের যত নিন্দাই করুক আমি নিন্দা করতে পারব না। ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো। রাশিয়ার বুকের 'পরে ধর্ম ও অত্যাচারী রাজার পাথর চাপা ছিল ; দেশের উপর থেকে সেই পাথর নড়ে যাওয়ায় কী প্রচণ্ড নিষ্কৃতি হয়েছে এখানে এলে সেটা স্বচক্ষে দেখতে পেতে। ইতি ৩ অক্টোবর ১৯৩০

●

আতলান্তিক মহাসাগর

রাশিয়া থেকে ফিরে এসেছি, চলেছি আমেরিকার পথে। রাশিয়াযাত্রায় আমার একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—ওখানে জনসাধারণের শিক্ষা-বিস্তারের কাজ কিরকম চলছে আর ওরা তার ফল কিরকম পাচ্ছে সেইটে অল্প সময়ের মধ্যে দেখে নেওয়া।

আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যতকিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য—সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে। সাইমন কমিশনে ভারতবর্ষের সমস্ত অপরাধের তালিকা শেষ করে ব্রিটিশ শাসনের কেবল একটিমাত্র অপরাধ কবুল করেছে। সে হচ্ছে, যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষাবিধানের ত্রুটি। কিন্তু আর কিছু বলবার দরকার ছিল না। মনে করুন যদি বলা হয়, গৃহস্থ সাবধান হতে শেখে নি, এক ঘর থেকে আর-এক ঘরে যেতে চৌকাঠে হুঁচট লেগে সে আছাড় খেয়ে পড়ে, জিনিসপত্র কেবলই হারায় তার পরে খুঁজে পায় না, ছায়া দেখলে তাকে জুজু বলে ভয় করে, নিজের ভাইকে দেখে চোর এসেছে বলে লাঠি উঁচিয়ে মারতে যায়, কেবলই বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকে, উঠে হেঁটে বেড়াবার সাহসই নেই, খিদে পায় কিন্তু খাবার কোথায় আছে খুঁজে পায় না, অদৃষ্টের উপর অন্ধ নির্ভর করে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত পথ তার কাছে লুপ্ত, অতএব নিজের গৃহস্থালির তদারকের ভার তার উপর দেওয়া চলে না—তার পরে সবশেষে গলা অত্যন্ত খাটো করে যদি বলা হয়, আমি ওর বাতি নিবিয়ে রেখেছি—তা হলে সেটা কেমন হয়?

ওরা একদিন ডাইনী বলে নিরপরাধাকে পুড়িয়েছে, পাপিষ্ঠ বলে বৈজ্ঞানিককে মেরেছে, ধর্মমতের স্বাতন্ত্র্যকে অতি নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করেছে, নিজেরই ধর্মের ভিন্ন সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রাধিকারকে খর্ব করে রেখেছে ; এ ছাড়া কত অন্ধতা, কত মূঢ়তা, কত কদাচার, মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে তার তালিকা স্তূপাকার করে তোলা যায়—এ সমস্ত দূর হল কী করে? বাইরেকার কোনো 'কোর্ট অফ ওয়ার্ড্‌স্‌'এর হাতে ওদের অক্ষমতার সংস্কার-সাধনের ভার দেওয়া হয় নি ; একটিমাত্র শক্তি ওদের এগিয়ে দিয়েছে, সে হচ্ছে ওদের শিক্ষা।...

...রাশিয়ায় যখন যাত্রা করলুম খুব বেশি আশা করি নি। কেননা, কতটা সাধ্য এবং অসাধ্য তার আদর্শ ব্রিটিশ-ভারতবর্ষ থেকেই আমি পেয়েছি। ভারতের উন্নতিসাধনের দুরূহতা যে কত বেশি সে কথা স্বয়ং খৃস্টান পাদ্রি টম্‌সন অতি করুণ স্বরে সমস্ত পৃথিবীর কাছে জানিয়েছেন। আমাকেও মানতে হয়েছে দুরূহতা আছে বইকি, নইলে আমাদের এমন দশা হবেই বা কেন? একটা কথা আমার জানা ছিল, রাশিয়ার প্রজাসাধারণের উন্নতিবিধান ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি দুরূহ বই কম নয়। প্রথমত, এখানকার সমাজে যারা ভদ্রেতর শ্রেণীতে ছিল আমাদের দেশের সেই শ্রেণীর লোকের মতোই তাদের অন্তর-বাহিরের অবস্থা। সেইরকমই নিরক্ষর নিরুপায়, পূজার্চনা পুরুতপাণ্ডা দিনক্ষণ তাগাতাবিজে বুদ্ধিশুদ্ধি সমস্ত চাপা-পড়া, উপরওয়ালাদের পায়ের ধুলোতেই মলিন তাদের আত্মসম্মান, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সুযোগ সুবিধা তারা কিছুই পায় নি, প্রপিতামহদের-ভূতে-পাওয়া তাদের ভাগ্য, সেই ভূত তাদের বেঁধে রেখেছে হাজার বছরের আগেকার অচল খোঁটায়, মাঝে মাঝে য়িহুদি প্রতিবেশীদের 'পরে খুন চেপে যায়—তখন পাশবিক নিষ্ঠুরতার আর অন্ত থাকে না। উপরওয়ালাদের কাছ থেকে চাবুক খেতে যেমন মজবুত নিজেদের সমশ্রেণীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করতে তারা তেমনি প্রস্তুত।

এই তো হল ওদের দশা—বর্তমানে যাদের হাতে ওদের ভাগ্য, ইংরেজের মতো তারা ঐশ্বর্যশালী নয়, কেবলমাত্র ১৯১৭ খৃস্টাব্দের পর থেকে নিজের দেশে তাদের অধিকার আরম্ভ হয়েছে ; রাষ্ট্রব্যবস্থা আটেঘাটে পাকা হবার মতো সময় এবং সম্বল তারা পায় নি ; ঘরে বাইরে প্রতিকূলতা ; তাদের মধ্যে আত্মবিদ্রোহ সমর্থন করবার জন্যে ইংরেজ, এমন-কি, আমেরিকানরাও গোপনে ও প্রকাশ্যে চেষ্টা করেছে। জনসাধারণকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে তারা যে পণ করেছে তার 'ডিফিকাল্‌টি' ভারতকর্তৃপক্ষের ডিফিকাল্‌টির চেয়ে বহু গুণে বড়ো।

অতএব রাশিয়ায় গিয়ে বেশি কিছু দেখতে পাব এ রকম আশা করা অন্যায় হত। কীই বা জানি, কীই বা দেখেছি, যাতে আমাদের আশার জোর বেশি হতে

বই বইয়ের ঠিকানা

পারে। আমাদের দুঃখী-দেশে-লালিত অতিদুর্বল আশা নিয়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। গিয়ে যা দেখলুম তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। 'ল অ্যান্ড্ অর্ডার' কী পরিমাণে রক্ষিত হচ্ছে বা না হচ্ছে তার তদন্ত করবার যথেষ্ট সময় পাই নি—শোনা যায়, যথেষ্ট জবরদস্তি আছে ; বিনা বিচারে দ্রুত পদ্ধতিতে শাস্তি, সেও চলে ; আর-সব বিষয়ে স্বাধীনতা আছে কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিধানের বিরুদ্ধে নেই। এটা তো হল চাঁদের কলঙ্কের দিক, কিন্তু আমার দেখবার প্রধান লক্ষ্য ছিল আলোকের দিক। সে দিকটাতে যে দীপ্তি দেখা গেল সে অতি আশ্চর্য—যারা একেবারেই অচল ছিল তারা সচল হয়ে উঠেছে।

শোনা যায় য়ুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবকৃপায় এক মুহূর্তে চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেছে ; এখানে তাই হল। দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্ছে, পদাতিকের অধম যারা ছিল তারা বছর-দশেকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানবসমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত হাতিয়ার স্ববশ।

আমাদের সম্রাটবংশীয় খৃস্টান পাদ্রিরা বহুকাল ভারতবর্ষে কাটিয়েছেন, ডিফিকাল্‌টিজ যে কিরকম অনড় তা তাঁরা দেখে এসেছেন। একবার তাঁদের মস্কো আসা উচিত। কিন্তু এলে বিশেষ ফল হবে না—কারণ বিশেষ করে কলঙ্ক দেখাই তাঁদের ব্যবসা-গত অভ্যাস ; আলো চোখে পড়ে না, বিশেষত যাদের উপর বিরাগ আছে। ভুলে যান তাঁদের শাসনচন্দ্রেও কলঙ্ক খুঁজে বের করতে বড়ো চশমার দরকার করে না।

প্রায় সত্তর বছর আমার বয়স হল—এত কাল আমার ধৈর্যচ্যুতি হয় নি। নিজেদের দেশের অতি দুর্বহ মূঢ়তার বোঝার দিকে তাকিয়ে নিজের ভাগ্যকেই বেশি করে দোষ দিয়েছি। অতি সামান্য শক্তি নিয়ে অতি সামান্য প্রতিকারের চেষ্টাও করেছি, কিন্তু জীর্ণ আশার রথ যত মাইল চলেছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় দড়ি ছিঁড়েছে, চাকা ভেঙেছে। দেশের হতভাগাদের দুঃখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়েছি। কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চেয়েছি ; তাঁরা বাহবাও দিয়েছেন ; যেটুকু ভিক্ষে দিয়েছেন তাতে জাত যায়, পেট ভরে না। সব চেয়ে দুঃখে এবং লজ্জার কথা এই যে, তাঁদের প্রসাদলালিত আমাদের স্বদেশী জীবরাই সব চেয়ে বাধা দিয়েছে। যে দেশ পরের কর্তৃত্বে চালিত সেই দেশে সব চেয়ে দুরন্তর ব্যাধি হল এই—সে-সব জায়গায় দেশের লোকের মনে যে ঈর্ষা, যে ক্ষুদ্রতা, যে স্বদেশবিরুদ্ধতার কলুষ জন্মায় তার মতো বিষ নেই।

বাইরের সকল কাজের উপরেও একটা জিনিস আছে সেটা আত্মার সাধনা। রাষ্ট্রিক আর্থিক নানা গোলমালে যখন মনটা আবিল হয়ে ওঠে তখন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই নে বলেই তার জোর কমে যায়। আমার মধ্যে সে বিপদ আছে, সেইজন্যেই আসল জিনিসকে আঁকড়ে ধরতে চাই ; কেউ বা আমাকে উপহাস করে, কেউ বা আমার উপর রাগ করে, তাদের নিজের পথেই আমাকে টেনে নিতে চায়। কিন্তু কোথা থেকে জানি নে আমি এসেছি এই পৃথিবীর

তীর্থে, আমার পথ আমার তীর্থদেবতার বেদীর কাছে। মানুষের দেবতাকে স্বীকার করে এবং প্রণাম করে যাব, আমার জীবনদেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েছেন। যখন আমি সেই দেবতার নির্মাল্য ললাটে পরে যাই তখন সব জাতের লোকই আমাকে ডেকে আসন দেয়, আমার কথা মন দিয়ে শোনে। যখন ভারতবর্ষীয়ের মুখোস পরে দাঁড়াই তখন বাধা বিস্তর। যখন আমাকে এরা মানুষরূপে দেখে তখনই এরা আমাকে ভারতবর্ষীয়রূপেই শ্রদ্ধা করে ; যখন নিছক ভারতবর্ষীয়রূপে দেখা দিতে চাই তখন এরা আমাকে মানুষরূপে সমাদর করতে পারে না। আমার স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে আমার চলবার পথ ভুল বোঝার দ্বারা বন্ধুর হয়ে ওঠে। আমার পৃথিবীর মেয়াদ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে ; অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।

আমার এখানকার খবর সত্য মিথ্যা নানা ভাবে দেশে গিয়ে পৌঁছয়। সে সম্বন্ধে সব সময় উদাসীন থাকতে পারি নে বলে নিজের উপর ধিক্‌কার জন্মে। বার বার মনে হয়, বানপ্রস্থের বয়সে সমাজস্থের মতো ব্যবহার করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়।

যাই হোক, এ দেশের 'এনর্‌মাস ডিফিকাল্‌টিজ'এর কথা বইয়ে পড়েছিলুম, কানে শুনেছিলুম, কিন্তু সেই ডিফিকাল্‌টিজ অতিক্রমণের চেহারা চোখে দেখলুম। ইতি ৪ অক্টোবর ১৯৩০

ব্রেমেন জাহাজ

আমাদের দেশে পলিটিক্‌সকে যারা নিছক পালোয়ানি বলে জানে সবরকম ললিতকলাকে তারা পৌরুষের বিরোধী বলে ধরে রেখেছে। এ সম্বন্ধে আমি আগেই লিখেছি। রাশিয়ার জার ছিল একদিন দশাননের মতো সম্রাট, তার সাম্রাজ্য পৃথিবীর অনেকখানিকেই অজগর সাপের মতো গিলে ফেলেছিল, লেজের পাকে যাকে সে জড়িয়েছে তার হাড়গোড় দিয়েছে পিষে।

প্রায় বছর তেরো হল এরই প্রতাপের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঝুটোপুটি বেধে গিয়েছিল। সম্রাট যখন গুষ্টিসুদ্ধ গেল সরে তখনো তার সাঙ্গোপাঙ্গরা দাপিয়ে বেড়াতে লাগল—তাদের অস্ত্র এবং উৎসাহ জোগালে অপর সাম্রাজ্যভোগীরা। বুঝতেই পারছ, ব্যাপারখানা সহজ ছিল না। একদা যারা ছিল সম্রাটের উপগ্রহ ধনীর দল, চাষীদের 'পরে যাদের ছিল অসীম প্রভুত্ব, তাদের সর্বনাশ বেধে গেল। লুটপাট কাড়াকাড়ি চলল, তাদের বহুমূল্য ভোগের সামগ্রী ছারখার করবার জন্যে প্রজারা হন্যে হয়ে উঠেছে। এতবড়ো উচ্ছৃংখল উৎপাতের সময় বিপ্লবী নেতাদের কাছ থেকে কড়া হুকুম এসেছে—আর্ট-সামগ্রীকে কোনোমতে যেন নষ্ট হতে দেওয়া না হয়। ধনীদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ থেকে ছাত্ররা অধ্যাপকেরা অর্ধঅভুক্ত শীতক্লিষ্ট অবস্থায় দল বেঁধে যা-কিছু রক্ষাযোগ্য জিনিস সমস্ত উদ্ধার করে য়ুনিভার্সিটির মার্জিয়মে সংগ্রহ করতে লাগল।

বই বইয়ের ঠিকানা

মনে আছে আমরা যখন চীনে গিয়েছিলুম কী দেখেছিলুম। য়ুরোপের সাম্রাজ্যভোগীরা পিকিনের বসন্তপ্রাসাদকে কিরকম ধূলিসাৎ করে দিয়েছে, বহুযুগের অমূল্য শিল্পসামগ্রী কিরকম লুটেপুটে ছিঁড়ে ভেঙে দিয়েছে উড়িয়ে পুড়িয়ে। তেমন সব জিনিস জগতে আর কোনোদিন তৈরি হতেই পারবে না।

সোভিয়েটেরা ব্যক্তিগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু যে ঐশ্বর্যে সমস্ত মানুষের চিরদিনের অধিকার—বর্বরের মতো তাকে নষ্ট হতে দেয় নি। এতদিন যারা পরের ভোগের জন্যে জমি চাষ করে এসেছে এরা তাদের যে কেবল জমির স্বত্ব দিয়েছে তা নয়, জ্ঞানের জন্যে আনন্দের জন্যে মানবজীবনে যা-কিছু মূল্যবান সমস্ত তাদের দিতে চেয়েছে। শুধু পেটের ভাত পশুর পক্ষে যথেষ্ট, মানুষের পক্ষে নয়—এ কথা তারা বুঝেছিল এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের পক্ষে পালোয়ানির চেয়ে আর্টের অনুশীলন অনেক বড়ো এ কথা তারা স্বীকার করেছে।

এদের বিপ্লবের সময় উপরতলার অনেক জিনিস নীচে তলিয়ে গেছে এ কথা সত্য, কিন্তু টিঁকে রয়েছে এবং ভরে উঠেছে মুজিয়ম থিয়েটার লাইব্রেরি সংগীতশালা।

আমাদের দেশের মতোই একদা এদের গুণীর গুণপনা প্রধানত ধর্মমন্দিরেই প্রকাশ পেত। মোহন্তেরা নিজের স্থূল রুচি নিয়ে তার উপরে যেমন খুশি হাত চালিয়েছে। আধুনিক শিক্ষিত ভক্ত বাবুরা পুরীর মন্দিরকে যেমন চুনকাম করতে সংকুচিত হয় নি তেমনি এখানকার মন্দিরের কর্তারা আপন সংস্কার অনুসারে সংস্কৃত করে প্রাচীন কীর্তিকে অবাধে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে—তার ঐতিহাসিক মূল্য যে সর্বজনের সর্বকালের পক্ষে এ কথা তারা মনে করে নি, এমন কি, পুরোনো পুজোর পাত্রগুলিকে নূতন করে ঢালাই করেছে। আমাদের দেশেও মঠে মন্দিরে অনেক জিনিস আছে ইতিহাসের পক্ষে যা মূল্যবান। কিন্তু কারও তা ব্যবহার করবার জো নেই—মোহন্তেরাও অতলস্পর্শ মোহে মগ্ন—সেগুলিকে ব্যবহার করবার মতো বুদ্ধি ও বিদ্যার ধার ধারে না। ক্ষিতিবাবুর কাছে শোনা যায়, প্রাচীন অনেক পুঁথি মঠে মঠে আটক পড়ে আছে, দৈত্যপুরীতে রাজকন্যার মতো, উদ্ধার করবার উপায় নেই।

বিপ্লবীরা ধর্মমন্দিরের সম্পত্তির বেড়া ভেঙে দিয়ে সমস্তকেই সাধারণের সম্পত্তি করে দিয়েছে। যেগুলি পুজোর সামগ্রী সেগুলি রেখে বাকি সমস্ত জমা করা হচ্ছে মুজিয়মে। একদিকে যখন আত্মবিপ্লব চলছে, যখন চারদিকে টাই-ফয়েডের প্রবল প্রকোপ, রেলের পথ সব উৎখাত, সেই সময়ে বৈজ্ঞানিক সন্ধানীর দল গিয়েছে প্রত্যন্তপ্রদেশ সমস্ত হাৎড়িয়ে পুরাকালীন শিল্পসামগ্রী উদ্ধার করবার জন্যে। কত পুঁথি কত ছবি কত খোদকারির কাজ সংগ্রহ হল তার সীমা নেই।

এতো গেল ধনীগৃহে বা ধর্মমন্দিরে যা-কিছু পাওয়া গেছে তারই কথা। দেশের সাধারণ চাষীদের কর্মিকদের কৃত শিল্পসামগ্রী, পূর্বতনকালে যা অবজ্ঞাভাজন ছিল, তার মূল্য নিরূপণ করবার দিকেও দৃষ্টি পড়েছে। শুধু ছবি নয়, লোকসাহিত্য লোকসংগীত প্রভৃতি নিয়েও প্রবল বেগে কাজ চলছে।

এই তো গেল সংগ্রহ, তার পরে এই-সমস্ত সংগ্রহ নিয়ে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা ইতিপূর্বেই তার বিবরণ লিখেছি। এত কথা যে তোমাকে লিখছি তার কারণ এই, দেশের লোককে আমি জানাতে চাই, আজ কেবলমাত্র দশ বছরের আগেকার রাশিয়ার জনসাধারণ আমাদের বর্তমান জনসাধারণের সমতুল্যই ছিল ; সোভিয়েট শাসনে এইজাতীয় লোককেই শিক্ষার দ্বারা মানুষ করে তোলবার আদর্শ কতখানি উচ্চ। এর মধ্যে বিজ্ঞান সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা সমস্তই আছে—অর্থাৎ, আমাদের দেশের ভদ্রনামধারীদের জন্যে শিক্ষার যে আয়োজন তার চেয়ে অনেকগুণেই সম্পূর্ণতর।

কাগজে পড়লুম, সম্প্রতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন-উপলক্ষে হুকুম পাস হয়েছে প্রজাদের কান ম'লে শিক্ষা-কর আদায় করা, এবং আদায়ের ভার পড়েছে জমিদারদের 'পরে। অর্থাৎ, যারা অমনিতেই আধমরা হয়ে রয়েছে শিক্ষার ছুতো করে তাদেরই মার বাড়িয়ে দেওয়া।

শিক্ষা-কর চাই বই কি, নইলে খরচ জোগাবে কিসে ? কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্যে যে কর কেন দেশের সবাই মিলে সে কর দেবে না ? সিভিল সার্ভিস আছে, মিলিটারি সার্ভিস আছে, গভর্নর ভাইসরয় ও তাঁদের সদস্যবর্গ আছেন, কেন তাঁদের পরিপূর্ণ পকেটে হাত দেবার জো নেই ? তাঁরা কি এই চাষীদের অন্নের ভাগ থেকেই বেতন নিয়ে ও পেনসন নিয়ে অবশেষে দেশে গিয়ে ভোগ করেন না ? পাটকলের যে-সব বড়ো বড়ো বিলাতী মহাজন পাটের চাষীর রক্ত দিয়ে মোটা মুনাফার সৃষ্টি করে দেশে রওনা করে, সেই মৃতপ্রায় চাষীদের শিক্ষা দেবার জন্যে তাদের কোনোই দায়িত্ব নেই ? যে-সব মিনিস্টার শিক্ষা-আইন পাস নিয়ে ভরা পেটে উৎসাহ প্রকাশ করেন তাঁদের উৎসাহের কানাকড়ি মূল্যও কি তাঁদের নিজের তহবিল থেকে দিতে হবে না ?

একেই বলে শিক্ষার জন্যে দরদ ? আমি তো একজন জমিদার, আমার প্রজাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে কিছু দিয়েও থাকি ; আরও দ্বিগুণ তিনগুণ যদি দিতে হয় তো তাও দিতে রাজি আছি। কিন্তু এই কথাটা প্রতিদিন ওদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার হবে যে, আমি তাদের আপন লোক, তাদের শিক্ষায় আমারই মঙ্গল—এবং আমিই তাদের দিচ্ছি, দিচ্ছে না এই রাজ্যশাসকদের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন শ্রেণীর একজনও এক পয়সাও।

সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণের উন্নতিবিধানের চাপ খুবই বেশি ; সেজন্যে আহারে বিহারে লোকে কষ্ট পাচ্ছে কম নয়, কিন্তু এই কষ্টের ভাগ উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সকলেই নিয়েছে। তেমন কষ্টকে তো কষ্ট বলব না, সে যে তপস্যা। প্রাথমিক শিক্ষার নামে কণামাত্র শিক্ষা চালিয়ে ভারত-গবর্মেন্ট এতদিন পরে দুশো বছরের কলংক মোচন করতে চান, অথচ তার দাম দেবে তারাই যারা দাম দিতে সকলের চেয়ে অক্ষম—গবর্মেন্টের প্রশ্রয়লালিত বহুদাশী বাহন যারা তারা নয়, তারা আছে গৌরব ভোগ করবার জন্যে।

আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে,

বই বইয়ের ঠিকানা

অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যেও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে? দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে? মানুষকে যারা কেবলই ফাঁকি দেয় দেবতা কি তাদের কোনোখানে আছে?

অনেক কথা বলবার আছে। এ রকম তথ্য সংগ্রহ করে লেখা আমার অভ্যস্ত নয়, কিন্তু না লেখা অন্যায় হবে বলে লিখতে বসেছি। রাশিয়ার শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে লিখব বলে আমার সংকল্প আছে। কতবার মনে হয়েছে আর কোথাও নয়, রাশিয়ায় এসে একবার তোমাদের সব দেখে যাওয়া উচিত। ভারতবর্ষ থেকে অনেক চর সেখানে যায়, বিপ্লবপন্থীরাও আনাগোনা করে; কিন্তু আমার মনে হয়, কিছুর জন্যে নয়, কেবল শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার।

যাক, আমার নিজের খবর দিতে উৎসাহ পাই নে। আমি যে আর্টিস্ট এই অভিমান মনে প্রবল হবার আশংকা আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত বাইরে খ্যাতি পেয়েছি, অন্তরে পৌঁছয় না। কেবলই মনে হয় দৈবগুণে পেয়েছি, নিজগুণে নয়।

ভাসছি এখন মাঝ-সমুদ্রে। পারে গিয়ে কপালে কী আছে জানি নে। শরীর ক্লান্ত, মন অনিচ্ছুক। শূন্যে ভিক্ষাপাত্রের মতো ভারী জিনিস জগতে আর কিছুই নেই, সেটা জগন্নাথকে শেষ নিবেদন করে দিয়ে কবে আমি ছুটি পাব? ইতি ৫ অক্টোবর ১৯৩০

●

D. "Bremen"

বিজ্ঞানশিক্ষায় পুঁথির পড়ার সঙ্গে চোখের দেখার যোগ থাকা চাই, নইলে সে শিক্ষার বারো আনা ফাঁকি হয়। শুধু বিজ্ঞান কেন, অধিকাংশ শিক্ষাতেই এ কথা খাটে। রাশিয়াতে বিবিধ বিষয়ের মুজিয়মের যোগে সেই শিক্ষার সহায়তা করা হয়েছে। এই মুজিয়ম শুধু বড়ো বড়ো শহরে নয়, প্রদেশে প্রদেশে, সামান্য পল্লীগ্রামের লোকেরও আয়ত্তগোচরে।

চোখে দেখে শেখার আর-একটা প্রণালী হচ্ছে ভ্রমণ। তোমরা তো জানোই, আমি অনেক দিন থেকেই ভ্রমণ-বিদ্যালয়ের সংকল্প মনে বহন করে এসেছি। ভারতবর্ষ এত বড়ো দেশ, সকল বিষয়েই তার এত বৈচিত্র্য বেশি যে, তাকে সম্পূর্ণ করে উপলব্ধি করা হণ্টারের গেজেটিয়র পড়ে হতে পারে না। এক সময়ে পদব্রজে তীর্থভ্রমণ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল—আমাদের তীর্থগুলিও ভারতবর্ষের সকল অংশে ছড়ানো। ভারতবর্ষকে যথাসম্ভব সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার এই ছিল উপায়। শুধুমাত্র শিক্ষাকে লক্ষ্য করে পাঁচ বছর ধরে

ছাত্রদের যদি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়ে নেওয়া যায় তা হলে তাদের শিক্ষা পাকা হয়।...

...সোভিয়েট রাশিয়ায় দেখছি সর্বসাধারণের জন্যে দেশভ্রমণের ব্যবস্থা ফলাও করে তুলেছে। বৃহৎ এদের দেশ, বিচিত্রজাতীয় মানুষ তার অধিবাসী। জার-শাসনের সময়ে এদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ জানাশোনা মেলামেশার সুযোগ ছিল না বললেই হয়। বলা বাহুল্য, তখন দেশভ্রমণ ছিল শখের জিনিস, ধনী লোকের পক্ষেই ছিল সম্ভব। সোভিয়েট আমলে সর্বসাধারণের জন্যে তার উদ্যোগ। শ্রমক্লান্ত এবং রুগ্ণ কর্মিকদের শ্রান্তি এবং রোগ দূর করবার জন্যে প্রথম থেকেই সোভিয়েটরা দূরে নিকটে নানা স্থানে স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের চেষ্টা করেছে। আগেকার কালের বড়ো বড়ো প্রাসাদ তারা এই কাজে লাগিয়েছে। সে-সব জায়গায় গিয়ে বিশ্রাম এবং আরোগ্যলাভ যেমন একটা লক্ষ্য তেমনি শিক্ষালাভ আর-একটা।

লোকহিতের প্রতি যাদের অনুরাগ আছে এই ভ্রমণ-উপলক্ষে তারা নানা স্থানে নানা লোকের আনুকূল্য করবার অবকাশ পায়। জনসাধারণকে দেশভ্রমণে উৎসাহ দেওয়া এবং তার সুবিধা করে দেওয়ার জন্যে পথের মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ শিক্ষাবিতরণের উপযোগী প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে, সেখানে পথিকদের আহার নিদ্রার ব্যবস্থা আছে, তা ছাড়া সকল রকম দরকারি বিষয়ে তারা পরামর্শ পেতে পারে। ককেশীয় প্রদেশ ভূতত্ত্ব-আলোচনার উপযুক্ত স্থান। সেখানে এই রকম পান্থশিক্ষালয় থেকে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ পাবার আয়োজন আছে। যে-সব প্রদেশ বিশেষভাবে নৃতত্ত্ব-আলোচনার উপযোগী সে-সব জায়গায় পথিকদের জন্যে নৃতত্ত্ববিৎ উপদেশক তৈরি করে নেওয়া হয়েছে।

গ্রীষ্মের সময় হাজার হাজার ভ্রমণেচ্ছু আপিসে নাম রেজিস্ট্রি করে। মে মাস থেকে আরম্ভ করে দলে দলে নানা পথ বেয়ে প্রতিদিন যাত্রা চলে—এক-একটি দলে পঁচিশ-ত্রিশটি করে যাত্রী। ১৯২৮ খৃস্টাব্দে এই যাত্রীসংঘের সভ্যসংখ্যা ছিল তিন হাজারের কাছাকাছি, ২৯শে হয়েছে বারো হাজারের উপর।

এ সম্বন্ধে য়ুরোপের অন্যত্র বা আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করা সংগত হবে না; সর্বদাই মনে রাখা দরকার হবে যে রাশিয়ায় দশ বছর আগে শ্রমিকদের অবস্থা আমাদের মতোই ছিল—তারা শিক্ষা করবে, বিশ্রাম করবে, বা আরোগ্য লাভ করবে, সেজন্যে কারো কোনো খেয়াল ছিল না; আজ এরা যে-সমস্ত সুবিধা সহজেই পাচ্ছে তা আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের আশাতীত এবং ধনীদের পক্ষেও সহজ নয়। তা ছাড়া শিক্ষালাভের ধারা সমস্ত দেশ বেয়ে এক-সঙ্গে কত প্রণালীতেই প্রবাহিত তা আমাদের সিবিল-সার্বিসে-পাওয়া দেশের লোকের পক্ষে ধারণা করাই কঠিন।

যেমন শিক্ষার ব্যবস্থা তেমনি স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সোভি-য়েট রাশিয়ায় যে রকম বৈজ্ঞানিক অনুশীলন চলছে তা দেখে য়ুরোপ-আমেরিকার পণ্ডিতেরা প্রচুর প্রশংসা করছেন। শুধু মোটা বেতনের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে

বই বইয়ের ঠিকানা

পুঁথি সৃষ্টি করা নয়, সর্বজনের মধ্যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ যাতে পরিব্যাপ্ত হয়, এমন কি এ দেশের চৌরঙ্গী থেকে যারা বহু দূরে থাকে তারাও যাতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে অযত্নে বা বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়, সে দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে।

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যক্ষ্মা রোগ ছড়িয়ে পড়ছে—রাশিয়া দেখে অবধি এ প্রশ্ন মন থেকে তাড়াতে পারছি নে যে, বাংলাদেশের এই-সব অর্পাবিত্ত মুহূর্তে-দের জন্যে কটা আরোগ্যাশ্রম আছে। এ প্রশ্ন আমার মনে সম্প্রতি আরও জেগেছে এইজন্যে যে, খৃস্টান ধর্মযাজক ভারতশাসনের অসাধারণ ডিফিকাল্‌টিজ নিয়ে আমেরিকার লোকের কাছে বিলাপ করছেন।

ডিফিকাল্‌টিজ আছে বই কি। একদিকে সেই ডিফিকাল্‌টিজের মূলে আছে ভারতীয়দের অশিক্ষা, অপরদিকে ভারতশাসনের ভুরিব্যয়িতা। সেজন্যে দোষ দেব কাকে? রাশিয়ায় অন্নবস্ত্রের সচ্ছলতা আজও হয়নি, রাশিয়াও বহুবিস্তৃত দেশ, সেখানে বহু বিচিত্র জাতির বাস, সেখানেও অজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অনাচার ছিল পর্বতপ্রমাণ—কিন্তু শিক্ষাও বাধা পাচ্ছে না, স্বাস্থ্যও না। সেইজন্যেই প্রশ্ন না করে থাকা যায় না, ডিফিকাল্‌টিটা ঠিক কোনখানে?

যারা খেটে খায় তারা সোভিয়েট স্বাস্থ্যনিবাসে বিনা ব্যয়ে থাকতে পারে, তা ছাড়া এই স্বাস্থ্যনিবাসের সঙ্গে সঙ্গে থাকে আরোগ্যালয় (sanatorium)। সেখানে শুধু চিকিৎসা নয়, পথ্য ও শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। এই-সমস্ত ব্যবস্থাই সর্বসাধারণের জন্যে। সেই সর্বসাধারণের মধ্যে এমন সব জাত আছে যারা য়ুরোপীয় নয় এবং য়ুরোপীয় আদর্শ অনুসারে যাদের অসভ্য বলা হয়ে থাকে।

এই রকম পিছিয়ে-পড়া জাত, যারা য়ুরোপীয় রাশিয়ার প্রাঙ্গণের ধারে বা বাইরে বাস করে, তাদের শিক্ষার জন্যে ১৯২৮ খৃস্টাব্দের বাজেটে কত টাকা ধরে দেওয়া হয়েছে তা দেখলে শিক্ষার জন্যে কী উদার প্রয়াস তা বুঝতে পারবে। য়ুক্রেনিয়ান রিপাব্লিকের জন্যে ৪০ কোটি ৩০ লক্ষ, অতিককেশীয় রিপাব্লিকের জন্যে ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ, উজবেকিস্তানের জন্যে ৯ কোটি ৭০ লক্ষ, তুর্কমেনিস্তানের জন্যে ২ কোটি ৯ লক্ষ রুব্‌ল্‌।

অনেক দেশে আরবী অক্ষরের চলন থাকাতে শিক্ষাবিস্তারের বাধা হচ্ছিল, সেখানে রোমক বর্ণমালা চালিয়ে দেওয়াতে শিক্ষার কাজ সহজ হয়েছে।

যে বুলেটিন থেকে তথ্য সংগ্রহ করছি তারই দুটি অংশ তুলে দিই:

Another of the most important tasks in the sphere of culture is undoubtedly the stabilization of local administrative institutions and the transfer of all local government and administrative work in the federative and autonomous republics to a language which is familiar to the toiling masses. This is by no means simple, and great efforts

are still needed in this regard, owing to the low cultural level of the mass of the workers and peasants, and lack of sufficient skilled labour.

একটুখানি ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। সোভিয়েট সম্মিলনীর অন্তর্গত কতকগুলি রিপাব্লিক ও স্বতন্ত্রশাসিত (autonomous) দেশ আছে। তারা প্রায়ই য়ুরোপীয় নয়, এবং তাদের আচার ব্যবহার আধুনিক কালের সঙ্গে মেলে না। উদ্‌ধৃত অংশ থেকে বোঝা যাবে যে, সোভিয়েটদের মতে দেশের শাসনতন্ত্র দেশের লোকের শিক্ষারই একটা প্রধান উপায় ও অঙ্গ। আমাদের দেশের রাষ্ট্র-চালনার ভাষা যদি দেশের লোকের আপন ভাষা হত, তা হলে শাসনতন্ত্রের শিক্ষা তাদের পক্ষে সুগম হত। ভাষা ইংরেজি হওয়াতে শাসননীতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা সাধারণের আয়ত্তাতীত হয়েই রইল। মধ্যস্থের যোগে কাজ চলছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ যোগ রইল না। আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্রচালনার শিক্ষা ও অভ্যাস থেকে যেমন জনসাধারণ বঞ্চিত, দেশশাসননীতির জ্ঞান থেকেও তারা তেমনি বঞ্চিত। রাষ্ট্রশাসনের ভাষাও পরভাষা হওয়াতে পরাধীনতার নাগপাশের পাক আরও বেড়ে গেছে। রাজমন্ত্রসভায় ইংরেজি ভাষায় যে আলোচনা হয়ে থাকে তার সফলতা কতদূর আমি আনাড়ি তা বুঝি নে, কিন্তু তার থেকে প্রজাদের যে শিক্ষা হতে পারত তা একটুও হল না।

আর-একটা অংশ:

Whenever questions of cultural-economic construction in the national republics and districts come before the organs of the Soviet Government, they are settled not on the lines of guardianship, but on the lines of the maximum development of independence among the broad masses of workers and peasants and of initiative of the local Soviet organs.

যাদের কথা বলা হল তারা হচ্ছে পিছিয়ে-পড়া জাত। তাদের আগাগোড়া সমস্তই ডিফিকল্‌টিজ, কিন্তু এই ডিফিকল্‌টিজ সরিয়ে দেবার জন্যে সোভি-য়েটরা দুশো বছর চুপচাপ বসে থাকবার বন্দোবস্ত করে নি। ইতিমধ্যে দশ বছর কাজ করেছে। দেখেশুনে ভাবছি, আমরা কি উজবেকদের চেয়ে, তুর্কমানীদের চেয়েও, পিছিয়ে-পড়া জাত? আমাদের ডিফিকল্‌টিজের মাপ কি এদের চেয়েও বিশগুণ বেশি?

একটা কথা মনে পড়ল। এদের এখানে খেলনার ম্যুজিয়ম আছে। এই খেলনা-সংগ্রহের সংকল্প বহুকাল থেকে আমার মনের মধ্যে ঘুরেছে। তোমাদের নন্দনালয়ে কলাভাণ্ডারে এই কাজ অবশেষে আরম্ভও হল। রাশিয়া থেকে কিছু খেলনা পেয়েছি। অনেকটা আমাদেরই মতো।

পিছিয়ে-পড়া জাতের সম্বন্ধে আরো কিছু জানাবার আছে। কাল লিখব।

বই বইয়ের ঠিকানা

পরশু সকালে পৌঁছব নিয়ুইয়র্কে—তার পরে লেখবার যথেষ্ট অবসর পাব কি না কে জানে। ইতি ৭ অক্টোবর ১৯৩০

●

ব্রেমেন জাহাজ

পিছিয়ে-পড়া জাতের শিক্ষার জন্যে সোভিয়েট রাশিয়ায় কিরকম উদ্যোগ চলছে সে কথা তোমাকে লিখেছি। আজ দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

উরাল পর্বতের দক্ষিণে বাষ্কিরদের বাস। জারের আমলে সেখানকার সাধারণ প্রজার অবস্থা আমাদের দেশের মতোই ছিল। তারা চির-উপবাসের ধার দিয়েই চলত। বেতনের হার ছিল অতি সামান্য, কোনো কারখানায় বড়ো রকমের কাজ করবার মতো শিক্ষা ছিল না, অবস্থাগতিকে তাদের ছিল নিতান্তই মজুরের কাজ। বিপ্লবের পরে এই দেশের প্রজাদের স্বতন্ত্র শাসনের অধিকার দেবার চেষ্টা আরম্ভ হল।

প্রথমে যাদের উপর ভার পড়েছিল তারা আগেকার আমলের ধনী জোতদার, ধর্মযাজক, এবং বর্তমানে আমাদের ভাষায় যাদের বলে থাকি শিক্ষিত। সাধারণের পক্ষে সেটাতে সুবিধা হল না। আবার এই সময়ে উৎপাত আরম্ভ করলে কল্‌চাকের সৈন্য। সে ছিল জার-আমলের পক্ষপাতী, তার পিছনে ছিল ক্ষমতাশালী বহিঃশত্রুদের উৎসাহ এবং আনুকূল্য। সোভিয়েটেরা যদি-বা তাদের তাড়ালে, এল ভীষণ দুর্ভিক্ষ। দেশে চাষবাসের ব্যবস্থা ছারখার হয়ে গেল।

১৯২২ খৃষ্টাব্দ থেকে সোভিয়েট আমলের কাজ ঠিকমতো শুরু হতে পেরেছে। তখন থেকে দেশে শিক্ষাদান এবং অর্থোৎপত্তির ব্যবস্থা প্রবল বেগে গড়ে উঠতে লাগল। এর আগে বাষ্কিরিয়াতে নিরক্ষরতা ছিল প্রায় সর্বব্যাপী। এই কয় বছরের মধ্যে এখানে আটটি নর্মাল স্কুল, পাঁচটি কৃষিবিদ্যালয়, একটি ডাক্তারি-শিক্ষালয়, অর্থকরী বিদ্যা শেখবার জন্যে দুটি, কারখানার কাজে হাত পাকাবার জন্যে সতেরোটি, প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে ২৪৯৫টি এবং মধ্য-প্রাথমিকের জন্যে ৮৭টি স্কুল শুরু হয়েছে। বর্তমানে বাষ্কিরিয়াতে দুটি আছে সরকারী থিয়েটার, দুটি মিউজিয়ম, চোদ্দটি পৌর গ্রন্থাগার, ১১২টি গ্রামের পাঠগৃহ (reading room), ৩০টি সিনেমা শহরে এবং ৪৬টি গ্রামে, চাষীরা কোনো উপলক্ষে শহরে এলে তাদের জন্যে বহুতর বাসা, ৮৯১টি খেলা ও আরামের জায়গা (recreation corners), তা ছাড়া হাজার হাজার কর্মী ও চাষীদের ঘরে রেডিয়ো-শ্রুতিযন্ত্র। বীরভূম জেলার লোক বাষ্কিরদের চেয়ে নিঃসন্দেহ স্বভাবত উন্নততর শ্রেণীর জীব। বাষ্কিরিয়ার সঙ্গে বীরভূমের শিক্ষা ও আরামের ব্যবস্থা মিলিয়ে দেখো। উভয় পক্ষের ডিফিকল্‌টিজেরও তুলনা করা কর্তব্য হবে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে যতগুলি রিপাব্লিক হয়েছে তার মধ্যে তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তান সব চেয়ে অল্প দিনের। তাদের গড়ন হয়েছে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর, অর্থাৎ বছর-ছয়েকের চেয়েও তাদের বয়স কম। তুর্কমেনিস্তানের জনসংখ্যা সবশুদ্ধ সাড়ে দশ লক্ষ। এদের মধ্যে নয় লক্ষ

লোক চাষের কাজ করে। কিন্তু নানা কারণে খেতের অবস্থা ভালো নয়, পশুপালনের সুযোগও তদ্রূপ।

এ রকম দেশকে বাঁচাবার উপায় কারখানার কাজ খোলা, যাকে বলে industrialization। বিদেশী বা স্বদেশী ধনী মহাজনদের পকেট ভরাবার জন্যে কারখানার কথা হচ্ছে না, এখানকার কারখানার উপস্বত্ব সর্বসাধারণের। ইতিমধ্যেই একটা বড়ো সুতোর কল এবং রেশমের কল খোলা হয়েছে। আশকাবাদ শহরে একটা বৈদ্যুতজনন স্টেশন বসেছে, অন্যান্য শহরেও উদ্যোগ চলছে। যন্ত্র-চালনক্ষম শ্রমিক চাই, তাই বহুসংখ্যক তুর্কমেনি যুবকদের মধ্য-রুশিয়ার বড়ো বড়ো কারখানায় শিক্ষার জন্যে পাঠানো হয়ে থাকে। আমাদের যুবকদের পক্ষে বিদেশী-চালিত কারখানায় শিক্ষার সুযোগ লাভ যে কত দুঃসাধ্য তা সকলেরই জানা আছে।

বুলেটিনে লিখছে, তুর্কমেনিস্তানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা এত কঠিন যে তার তুলনা বোধ হয় অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বিরলবসতি জনসংস্থান দূরে দূরে, দেশে রাস্তার অভাব, জলের অভাব, লোকালয়ের মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো মরুভূমি, লোকের আর্থিক দুরবস্থা অত্যন্ত বেশি।

আপাতত মাথাপিছু পাঁচ রুবল করে শিক্ষার খরচ পড়ছে। এ দেশের প্রজাসংখ্যার সিকি পরিমাণ লোক যাযাবর (nomads)। তাদের জন্যে প্রাথমিক পাঠশালার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডিং স্কুল খোলা হয়েছে, ইঁদারার কাছাকাছি যেখানে বহু পরিবার মিলে আড্ডা করে সেই রকম জায়গায়। পড়ুয়াদের জন্যে খবরের কাগজও প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

মস্কো শহরে নদীতীরে সাবেক কালের একটি উদ্যানবেষ্টিত সুন্দর প্রাসাদে তুর্কমেনদের জন্যে শিক্ষক শিক্ষিত করবার একটি বিদ্যাভবন (Turcomen People's Home of Education) স্থাপিত হয়েছে। সেখানে সম্প্রতি এক শো তুর্কমেন ছাত্র শিক্ষা পাচ্ছে, বারো-তেরো বছর তাদের বয়স। এই বিদ্যাভবনের ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসননীতি-অনুসারে। এই ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি কর্মবিভাগ আছে, যেমন স্বাস্থ্যবিভাগ, গার্হস্থ্যবিভাগ (house-hold commission), ক্লাস-কমিটি। স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে দেখা হয় সমস্ত মহলগুলি (corpartments), ক্লাসগুলি, বাসের ঘর, আঙিনা পরিষ্কার আছে কি না। কোনো ছেলের যদি অসুখ করে, তা সে যতই সামান্য হোক, তার জন্যে ডাক্তার দেখাবার বন্দোবস্ত এই বিভাগের 'পরে। গার্হস্থ্যবিভাগের অন্তর্গত অনেকগুলি উপবিভাগ আছে। এই বিভাগের কর্তব্য হচ্ছে দেখা ছেলেরা পরিষ্কার পরিপাটি আছে কি না। ক্লাসে পড়বার কালে ছেলেদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা ক্লাস-কমিটির কাজ। প্রত্যেক বিভাগ থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে অধ্যক্ষসভা গড়ে ওঠে। এই অধ্যক্ষসভার প্রতিনিধিরা স্কুল-কৌন্সিলে ভোট দেবার অধিকার পায়। ছেলেদের নিজেদের মধ্যে বা আর-কারও সঙ্গে বিবাদ হলে অধ্যক্ষসভা তার তদন্ত করে ; এই সভার বিচার স্বীকার করে নিতে সব ছাত্রই বাধ্য।

বই বইয়ের ঠিকানা

এই বিদ্যাভবনের সংগে একটি ক্লাব আছে। সেখানে অনেক সময়ে ছেলেরা নিজের ভাষায় নিজেরা নাট্যাভিনয় করে, গানবাজনার সংগত হয়। ক্লাবের একটি সিনেমা আছে, তার থেকে মধ্য-এশিয়ার জীবনযাত্রার চিত্রাবলী ছেলেরা দেখতে পায়। এ ছাড়া দেয়ালে-টাঙানো খবরের কাগজ বের করা হয়।

তুর্কমেনিস্তানের চাষের উন্নতির জন্যে সেখানে বহুসংখ্যক কৃষিবিদ্যার ওস্তাদ পাঠানো হচ্ছে। দুশো'র বেশি আদর্শ-কৃষিক্ষেত্র খোলা হয়েছে। তা ছাড়া জল এবং জমি-ব্যবহার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হল তাতে কুড়ি হাজার দরিদ্রতম কৃষক-পরিবার কৃষির খেত, জল এবং কৃষির বাহন পেয়েছে।

এই বিরলপ্রজ দেশে ১৩০টা হাসপাতাল খোলা হয়েছে, ডাক্তারের সংখ্যা ছয়শো। বুলেটিনে লেখক সলজ্জ ভাষায় বলছেন :

However, there is no occasion to rejoice in the fact, since there are 2,640 inhabitants to each hospital bed, and as regards doctors, Turcmenistan must be relegated to the last place in the Union. We can boast of some attainments in the field of modernization and the struggle against crass ignorance, though again we must warn the reader that Turcmenistan, being on a very low level of civilization, has preserved a good many customs of the distant past. However, the recent laws, passed in order to combat the selling of women into marriage and child marriages, had produced the desired effect.

তুর্কমেনিস্তানের মতো মরুপ্রদেশে ছয় বৎসরের মধ্যে আপাতত ১৩০টা হাসপাতাল স্থাপন করে এরা লজ্জা পায়—এমনতরো লজ্জা দেখা আমাদের অভ্যাস নেই বলে বড়ো আশ্চর্য বোধ হল। অমাদের ভাগ্যদোষে বিস্তর 'ডিফিকল্টিজ' দেখতে পেলুম, সেগুলো নড়ে বসবার কোনো লক্ষণ দেখায় না তাও দেখলুম, কিন্তু বিশেষ লজ্জা দেখতে পাই নে কেন!

সত্য কথা বলি, ইতিপূর্বে আমারও মনে দেশের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে আশা করবার মতো সাহস চলে গিয়েছিল। খৃস্টান পাদ্রির মতো আমিও ডিফিকল্টিজের হিসাব দেখে স্তম্ভিত হয়েছি—মনে মনে বলেছি, এত বিচিত্র জাতের মানুষ, এত বিচিত্র জাতের মূর্খতা, এত পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম, কী জানি কত কাল লাগবে আমাদের ক্লেশের বোঝা আমাদের কলুষের আবর্জনা নড়াতে।

সাইমন কমিশনের ফসল যে আবহাওয়ায় ফলেছে স্বদেশ সম্বন্ধে আমার প্রত্যাশার ভীরুতা সেই আবহাওয়ারই। সোভিয়েট রাশিয়াতে এসে দেখলুম, এখানকার উন্নতির ঘড়ি আমাদেরই মতো বন্ধ ছিল, অন্তত জনসাধারণের ঘরে—কিন্তু বহু শত বছরের অচল ঘড়িতেও আট-দশ বছর দম লাগাতেই দিব্যি চলতে লেগেছে। এত দিন পরে বুঝতে পেরেছি আমাদের ঘড়িও চলতে

পারত কিন্তু দম দেওয়া হল না। ডিফিকল্টিজের মন্ত্র আওড়ানোতে এখন থেকে আর বিশ্বাস করতে পারব না।

এইবার বুলেটিন থেকে দুই-একটি অংশ উদ্ধৃত করে চিঠি শেষ করব :

The imperialist policy of the Czarist generals, after the conquest of Azerbaijan, consisted in converting the districts, inhabited by Mahommedans, into colonies, destined to supply raw material to the central Russian markets.

মনে আছে, অনেক কাল হল, পরলোকগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় একদা রেশমগুটির চাষ-প্রচলন সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন। তারই পরামর্শ নিয়ে আমিও রেশমগুটির চাষ-প্রবর্তনের চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলুম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, রেশমগুটির চাষে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে যথেষ্ট আনুকূল্য পেয়েছিলেন। কিন্তু যত বার এই গুটি থেকে সুতো ও সুতো থেকে কাপড় বোনা চাষীদের মধ্যে চলতি করবার ইচ্ছা করেছেন তত বারই ম্যাজিস্ট্রেট দিয়েছেন বাধা।

The agents of the Czar's Government were ruthlessly carrying out the principle of 'Divide and Rule' and did all in their power to sow hatred and discord between the various races. National animosities were fostered by the Government and Mahommedans and Armenians were systematically incited against each other. The ever-recurring conflicts betwween these two nations at times assumed the form of massacres.

হাসপাতালের সংখ্যাল্পতা নিয়ে বুলেটিন-লেখক লজ্জা স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু একটা বিষয়ে গৌরব প্রকাশ না করে থাকতে পারেন নি :

It is an undoubted fact, which even the worst enemies of the Soviets cannot deny: for the last eight years the peace between the races of Azerbijan has never been disturbed.

ভারতবর্ষের রাজত্বে লজ্জা-প্রকাশের চলন নেই, গৌরব-প্রকাশেরও রাস্তা দেখা যায় না।

এই লজ্জা-স্বীকারের উপলক্ষে একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। বুলেটিনে আছে সমস্ত তুর্কমেনিস্তানে শিক্ষার জন্যে জন-পিছু পাঁচ রুবল খরচ হয়ে থাকে। রুবলের মূল্য আমাদের টাকার হিসাবে আড়াই টাকা। পাঁচ রুবল বলতে বোঝায় সাড়ে বারো টাকা। এই বাবদ কর-আদায়ের কোনো একটা ব্যবস্থা হয়তো আছে, কিন্তু সেই কর-আদায় উপলক্ষে প্রজাদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটিয়ে দেবার কোনো আশঙ্কা নিশ্চয় সৃষ্টি করা হয় নি।
ইতি ৮ অক্টোবর ১৯৩০

বই বইয়ের ঠিকানা

তুর্কমেনদের কথা পূর্বেই বলেছি, মরুভূমিবাসী তারা, দশ লক্ষ মানুষ। এই চিঠি তারই পরিশিষ্ট। সোভিয়েট গবর্মেণ্ট সেখানে কী কী বিদ্যায়তন-স্থাপনের সংকল্প করেছে তার একটা ফর্দ তুলে দিচ্ছি।

Beginning with October 1st, 1930, the new budget year, a number of new scientific institutions and institutes will be opened in Turcomenia, namely:

1. Turcomen Geological Committee
2. Turcomen Institute of Applied Botany
3. Institute for Study and Research of Stock Breeding
4. Institute of Hydrology and Geophysics
5. Institute for Economic Research
6. Chemico-Bateriological Institute, and Institute of Social Hygiene.

The activity of all the scientific institutions of Turcomenia will be regulated by a special scientific management attached to the Council of People's Commissars of Turcomenia.

In connection with the removal of the Turcomen Government from Ashkhabad to Chardjni the construction of buildings for the following museums has been started: Historical, Agricultural, Industrial and Trade Museum, Art Museum, Museum of the Revolution. In addition, the construction of an Observatory, State Library, House of Published Books and House of Science and Culture is planned.

The Department of Language and Literature of the Institute of the Turcomen Culture has completed the revision and translation into Russian of Turcomenian poetry including folk-lore material and old poetry texts.

Five itinerant cultural bases have been organized in Turcomenia. During the year 1930 two courses for training practical nurses and midwives were completed. Altogether 46 persons were graduated. All graduates are sent to the village. ইতি ৮ অক্টোবর ১৯৩০

সোভিয়েত রাশিয়ায় জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যে কত বিবিধ রকমের উপায় অবলম্বন করা হয়েছে তার কিছু কিছু আভাস পূর্বের চিঠিপত্র থেকে পেয়ে থাকবে। আজ তোমাকে তারই মধ্যে একটা উদ্যোগের সংক্ষেপ বিবরণ লিখে পাঠাচ্ছি।

কিছুদিন হল মস্কো শহরে সাধারণের জন্যে একটি আরামবাগ খোলা হয়েছে। বুলেটিনে তার নাম দিয়েছে Moscow Park of Education and Recreation। তার মধ্যে প্রধান মণ্ডপটি প্রদর্শনীর জন্যে। সেখানে ইচ্ছা করলে খবর পাওয়া যায় সমস্ত প্রদেশে কারখানার শতসহস্র শ্রমিকদের জন্যে কত ডিস্পেন্সারি খোলা হয়েছে, মস্কো প্রদেশে স্কুলের সংখ্যা কত বাড়ল; ম্যুনিসিপ্যাল বিভাগে দেখিয়েছে কত নতুন বাসাবাড়ি তৈরি হল, কত নতুন বাগান, শহরের কত বিষয়ে কত রকমের উন্নতি হয়েছে। নানা রকমের মডেল আছে, পুরানো পাড়াগাঁ, এবং আধুনিক পাড়াগাঁ, ফল ও সবজি উৎপাদনের আদর্শ খেত, সোভিয়েত আমলে সোভিয়েত কারখানায় যে-সব যন্ত্র তৈরি হচ্ছে তার নমুনা, হাল আমলের কো-অপারেটিভ ব্যবস্থায় কী রুটি তৈরি হচ্ছে আর ওদের বিপ্লবের সময়েতেই বা কিরকম হত। তা ছাড়া নানা তামাশা, নানা খেলার জায়গা, একটা নিত্য-মেলার মতো আর-কি।

পার্কের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র জায়গা কেবল ছোটো ছেলেদের জন্যে, সেখানে বয়স্ক লোকদের প্রবেশ নিষেধ, সেখানকার প্রবেশদ্বারে লেখা আছে 'ছেলেদের উৎপাত কোরো না।' এইখানে ছেলেদের যতরকম খেলনা, খেলা; ছেলেদের থিয়েটার—সে থিয়েটারের ছেলেরাই চালক, ছেলেরাই অভিনেতা।

এই ছেলেদের বিভাগ থেকে কিছু দূরে আছে creche, বাংলায় তার নাম দেওয়া যেতে পারে শিশুরক্ষণী। মা-বাপ যখন পার্কে ঘুরে বেড়াতে প্রবৃত্ত তখন এই জায়গায় ধাত্রীদের জিম্মায় ছোটো শিশুদের রেখে যেতে পারে। একটা দোতলা মণ্ডপ (Pavillion) আছে ক্লাবের জন্যে। উপরের তলায় লাইব্রেরি। কোথাও বা সতরঞ্চ খেলার ঘর, কোথাও আছে মানচিত্র আর দেওয়ালে-ঝোলানো খবরের কাগজ। তা ছাড়া সাধারণের জন্যে আহারের বেশ ভালো কো-অপারেটিভ দোকান আছে, সেখানে মদ বিক্রি বন্ধ। মস্কো পশুশালা-বিভাগ থেকে এখানে একটা দোকান খুলেছে এই দোকানে নানারকম পাখি মাছ চারাগাছ কিনতে পাওয়া যায়। প্রাদেশিক শহরগুলিতেও এই রকমের পার্ক খোলবার প্রস্তাব আছে।

যেটা ভেবে দেখবার বিষয় সেটা হচ্ছে এই যে, জনসাধারণকে এরা ভদ্রসাধারণের উচ্ছিষ্টে মানুষ করতে চায় না। শিক্ষা আরাম জীবনযাত্রার সুযোগ সমস্তই এদের ষোলো আনা পরিমাণে। তার প্রধান কারণ জনসাধারণ ছাড়া এখানে আর কিছু নেই। এরা সমাজগ্রন্থের পরিশিষ্ট অধ্যায় নয়—সকল অধ্যায়েই এরা।

আর-একটা দৃষ্টান্ত তোমাকে দিই। মস্কো শহর থেকে কিছু দূরে সাবেক

বই বইয়ের ঠিকানা

কালের একটি প্রাসাদ আছে। রাশিয়ার প্রাচীন অভিজাতবংশীয় কাউণ্ট আপ্রাক্‌সিনদের সেই ছিল বাসভবন। পাহাড়ের উপর থেকে চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখতে—শস্যক্ষেত্র, নদী এবং পার্বত্য অরণ্য। দুটি আছে সরোবর আর অনেকগুলি উৎস। থামওয়ালা বড়ো বড়ো প্রকোষ্ঠ, উঁচু বারান্দা, প্রাচীন কালের আসবাব ছবি ও পাথরের মূর্তি দিয়ে সাজানো দরবারগৃহ ; এ ছাড়া আছে সংগীতশালা, খেলার ঘর, লাইব্রেরি, নাট্যশালা ; এ ছাড়া অনেকগুলি সুন্দর বহির্ভবন বাড়িটিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে আছে।

এই বৃহৎ প্রাসাদে অনুগভো নাম দিয়ে একটি কো-অপারেটিভ স্বাস্থ্যাগার স্থাপন করা হয়েছে এমন-সমস্ত লোকদের জন্যে যারা একদা এই প্রাসাদে দাসশ্রেণীতে গণ্য হত। সোভিয়েত রাষ্ট্রসংঘে একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে, শ্রমিকদের জন্যে বাসা নির্মাণ যার প্রধান কর্তব্য ; সেই সোসাইটির নাম বিশ্রান্তিনিকেতন—The Home of Rest। এই অনুগভো তারই তত্ত্বাধীনে।

এমনতরো আরো চারটে সানাটোরিয়াম এর হাতে আছে। খাটুনির ঋতুকাল শেষ হয়ে গেলে অন্তত ত্রিশ হাজার শ্রমক্লান্ত এই পাঁচটি আরোগ্যশালায় এসে বিশ্রাম করতে পারবে। প্রত্যেক লোক এক পক্ষকাল এখানে থাকতে পারে। আহারের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত, আরামের ব্যবস্থা যথেষ্ট, ডাক্তারের ব্যবস্থাও আছে। কো-অপারেটিভ প্রণালীতে এইরকম বিশ্রান্তিনিকেতন স্থাপনের উদ্যোগ ক্রমশই সাধারণের সম্মতিলাভ করেছে।

আর কিছু নয়, শ্রমিকদের বিশ্রামের প্রয়োজন এমনভাবে আর কোথাও কেউ চিন্তাও করে নি, আমাদের দেশের অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষেও এরকম সুযোগ দুর্লভ।

শ্রমিকদের জন্যে এদের ব্যবস্থা কিরকম সে তো শুনলে, এখন শিশুদের সম্বন্ধে এদের বিধান কিরকম সে কথা বলি। শিশু জারজ কিম্বা বিবাহিত দম্পতির সন্তান সে সম্বন্ধে কোনো পার্থক্য এরা গণ্যই করে না। আইন এই যে, শিশু যে পর্যন্ত না আঠারো বছর বয়সে সাবালক হয় সে পর্যন্ত তাদের পালনের ভার বাপ-মায়ের। বাড়িতে তাদের কী ভাবে পালন করা বা শিক্ষা দেওয়া হয় স্টেট সে সম্বন্ধে উদাসীন নয়। ষোলো বছর বয়সের পূর্বে সন্তানকে কোথাও খাটুনির কাজে নিযুক্ত করতে পারবে না। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তাদের কাজের সময়-পরিমাণ ছয় ঘণ্টা। ছেলেদের প্রতি পিতামাতা আপন কর্তব্য করছে কি না তার তদারকের ভার অভিভাবক-বিভাগের 'পরে। এই বিভাগের কর্মচারী মাঝে মাঝে পরিদর্শন করতে আসে, দেখে ছেলেদের স্বাস্থ্য কিরকম আছে, পড়াশুনো কিরকম চলছে। যদি দেখা যায় ছেলেদের প্রতি অযত্ন হচ্ছে, তা হলে বাপ-মায়ের হাত থেকে ছেলেদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তবু ছেলেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকে বাপ-মায়েরই। এইরকম ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার ভার পড়ে সরকারি অভিভাবক-বিভাগের উপর।

ভাবখানা এই, সন্তানেরা কেবল তো বাপ-মায়ের নয়, মুখ্যত সমস্ত

সমাজের। তাদের ভালোমন্দ নিয়ে সমস্ত সমাজের ভালোমন্দ। এরা যাতে মানুষ হয়ে ওঠে তার দায়িত্ব সমাজের, কেননা তার ফল সমাজেরই। ভেবে দেখতে গেলে পরিবারের দায়িত্বের চেয়ে সমাজের দায়িত্ব বেশি বৈ কম নয়। জনসাধারণ সম্বন্ধেও এদের মনের ভাব ঐ রকমেরই। এদের মতে জনসাধারণের অস্তিত্ব প্রধানত বিশিষ্টসাধারণেরই সুযোগ-সুবিধার জন্যে নয়। তারা সমগ্র সমাজের অংগ, সমাজের কোনো বিশেষ অংশের প্রত্যংগ নয়। অতএব তাদের জন্যে দায়িত্ব সমস্ত স্টেটের। ব্যক্তিগতভাবে নিজের ভোগের বা প্রতাপের জন্যে কেউ সমগ্র সমাজকে ডিঙিয়ে যেতে গেলে চলবে না।

যাই হোক, মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাসিস্ট্‌দেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায় ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে। এইরকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ কিছুদিনের মতো ভালো ফল দিতেও পারে, কিন্তু কখনোই চিরদিন পারে না। উপযুক্তমত নায়ক পরম্পরাক্রমে পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়।

তা ছাড়া অবাধ ক্ষমতার লোভ মানুষের বুদ্ধিবিকার ঘটায়। একটা সুবিধার কথা এই যে, যদিও সোভিয়েট মূলনীতি সম্বন্ধে এরা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অতি নির্দয়ভাবে পীড়ন করতে কুণ্ঠিত হয়নি, তথাপি সাধারণভাবে শিক্ষার দ্বারা চর্চার দ্বারা ব্যক্তির আত্মনিহিত শক্তিকে বাড়িয়েই চলেছে—ফ্যাসিস্ট্‌দের মতো নিয়তই তাকে পেষণ করে নি। শিক্ষাকে আপন বিশেষ মতের একান্ত অনুবর্তী করে কতকটা গায়ের জোরে কতকটা মোহমন্ত্রের জোরে এক-ঝোঁকা করে তুলেছে, তবুও সাধারণের বুদ্ধির চর্চা বন্ধ করে নি। যদিও সোভিয়েট নীতি-প্রচার সম্বন্ধে এরা যুক্তির জোরের উপরেও বাহুবলকে খাড়া করে রেখেছে, তবুও যুক্তিকে একেবারে ছাড়ে নি এবং ধর্মমূঢ়তা এবং সমাজ-প্রথার অন্ধতা থেকে সাধারণের মনকে মুক্ত রাখবার জন্যে প্রবল চেষ্টা করেছে।

মনকে একদিকে স্বাধীন করে অন্যদিকে জুলুমের বশ করা সহজ নয়। ভয়ের প্রভাব কিছুদিন কাজ করবে, কিন্তু সেই ভীরুতাকে ধিক্‌কার দিয়ে শিক্ষিত মন একদিন আপন চিন্তা-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার জোরের সঙ্গে দাবি করবেই। মানুষকে এরা দেহের দিকে নিপীড়িত করেছে, মনের দিকে নয়। যারা যথার্থই দৌরাত্ম্য করতে চায় তারা মানুষের মনকে মারে আগে—এরা মনের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তুলছে। এইখানেই পরিত্রাণের রাস্তা রয়ে গেল।

আজ আর ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যে পৌঁছব নিয়ুইয়র্কে। তার পর আবার নতুন পালা। এরকম করে সাত ঘাটের জল খেয়ে বেড়াতে আর ভালো লাগে না। এবারে এ অঞ্চলে না আসবার ইচ্ছায় মনে অনেক তর্ক উঠেছিল, কিন্তু লোভই শেষকালে জয়ী হল। ইতি ৯ অক্টোবর ১৯৩০

বই বইয়ের ঠিকানা

ল্যান্সডাউন

ইতিমধ্যে দুই-একবার দক্ষিণ-দরজার কাছ ঘেঁষে গিয়েছি। মলয়-সমীরণের দক্ষিণদ্বার নয়, যে দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ু বেরোবার পথ খোঁজে। ডাক্তার বললে, নাড়ীর সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের মুহূর্তকালের যে-বিরোধ ঘটেছিল সেটা যে অল্পের উপর দিয়েই কেটে গেছে এটাকে অবৈজ্ঞানিক ভাষায় মিরাক্‌ল্‌ বলা যেতে পারে। যাই হোক, যমদূতের ইশারা পাওয়া গেছে; ডাক্তার বলছে, এখন থেকে সাবধান হতে হবে। অর্থাৎ উঠে হেঁটে বেড়াতে গেলেই বুকের কাছটাতে বাণ এসে লাগবে—শুয়ে পড়লেই লক্ষ্য এড়িয়ে যাবে। তাই ভালোমানুষের মতো আধ-শোওয়া অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। ডাক্তার বলে, এমন করে বছর-দশেক নিরাপদে কাটতে পারে, তার পরে দশম দশাকে কেউ ঠেকাতে পারে না। বিছানায় হেলান দিয়ে আছি, আমার লেখার লাইনও আমার দেহরেখার নকল করতে প্রবৃত্ত। রোসো, একটু উঠে বসি।

দেখলুম কিছু দুঃসংবাদ পাঠিয়েছ, শরীরের এ অবস্থায় পড়তে ভয় করে, পাছে ঢেউয়ের ঘায়ে ভাঙন লাগে। বিষয়টা কী তার আভাস পূর্বেই পেয়েছিলুম—বিস্তারিত বিবরণের ধাক্কা সহ্য করা আমার পক্ষে শক্ত। তাই আমি নিজে পড়ি নি, অমিয়কে পড়তে দিয়েছি।

যে বাঁধন দেশকে জড়িয়েছে টান মেরে মেরে সেটা ছিঁড়তে হয়। প্রত্যেক টানে চোখের তারা উলটে যায়, কিন্তু এ ছাড়া বন্ধনমুক্তির অন্য উপায় নেই। ব্রিটিশরাজ নিজের বাঁধন নিজের হাতেই ছিঁড়ছে, তাতে আমাদের তরফে বেদনা যথেষ্ট, কিন্তু তার তরফে লোকসান কম নয়। সকলের চেয়ে বড়ো লোকসান এই যে, ব্রিটিশরাজ আপন মান খুইয়েছে। ভীষণের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ভয় করি, সেই ভয়ের মধ্যেও সম্মান আছে, কিন্তু কাপুরুষের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ঘৃণা করি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ আমাদের ঘৃণার দ্বারা ধিক্কৃত। এই ঘৃণায় আমাদের জোর দেবে, এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিতব।

সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেছি—দেশের গৌরবের পথ যে কত দুর্গম তা অনেকটা স্পষ্ট করে দেখলুম। যে অসহ্য দুঃখ পেয়েছে সেখানকার সাধকেরা, পুলিসের মার তার তুলনায় পুষ্পবৃষ্টি। দেশের ছেলেদের বোলো, এখনও অনেক বাকি আছে—তার কিছুই বাদ যাবে না। অতএব তারা যেন এখনই বলতে শুরু না করে, বড়ো লাগছে—সে কথা বললেই লাঠিকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়।

দেশবিদেশে ভারতবর্ষ আজ গৌরবলাভ করেছে কেবলমাত্র মারকে স্বীকার না ক'রে—দুঃখকে উপেক্ষা করবার সাধনা আমরা যেন কিছুতে না ছাড়ি। পশুবল কেবলই চেষ্টা করছে আমাদের পশুকে জাগিয়ে তুলতে; যদি সফল হতে পারে তবেই আমরা হারব। দুঃখ পাচ্ছি সেজন্যে আমরা দুঃখ করব না। এই

আমাদের প্রমাণ করবার অবকাশ এসেছে যে, আমরা মানুষ—পশুর নকল করতে গেলেই এই শুভযোগ নষ্ট হবে। শেষ পর্যন্ত আমাদের বলতে হবে, ভয় করি নে। বাংলাদেশের মাঝে মাঝে ধৈর্য নষ্ট হয়, সেইটেই আমাদের দুর্বলতা। আমরা যখন নখদন্ত মেলতে যাই তখনই তার দ্বারা নখীদন্তীদের সেলাম করা হয়। উপেক্ষা কোরো, নকল কোরো না। অশ্রুবর্ষণ নৈব নৈব চ।

আমার সব চেয়ে দুঃখ এই, যৌবনের সম্বল নেই। আমি পড়ে আছি গতিহীন হয়ে পান্থশালায়—যাত্রা পথে চলছে তাদের সঙ্গে চলবার সময় চলে গেছে। ইতি ২৮ অক্টোবর ১৯৩০

উপসংহার

সোভিয়েট শাসনের প্রথম পরিচয় আমার মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে সে কথা পূর্বেই বলেছি। তার কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে সেটা আলোচনার যোগ্য।

সেখানকার যে ছবিটি আমার মনের মধ্যে মূর্তি নিয়েছে তার পিছনে দুলছে ভারতবর্ষের দুর্গতির কালো রঙের পটভূমিকা। এই দুর্গতির মূলে যে ইতিহাস আছে তার থেকে একটি তত্ত্ব পাওয়া যায়, সেই তত্ত্বটিকে চিন্তা করে দেখলে আলোচ্য প্রসঙ্গে আমার মনের ভাব বোঝা সহজ হবে।

ভারতবর্ষে মুসলমান-শাসন-বিস্তারের ভিতরকার মানসটি ছিল রাজ-মহিমালাভ। সেকালে সর্বদাই রাজা নিয়ে যে হাত-চালাচালি হত তার গোড়ায় ছিল এই ইচ্ছা। গ্রীসের সেকেন্দর শাহ ধূমকেতুর অনলোজ্জ্বল পুচ্ছের মতো তাঁর রণবাহিনী নিয়ে বিদেশের আকাশ ঘেঁটিয়ে বেড়িয়েছিলেন, সে কেবল তাঁর প্রতাপ প্রসারিত করবার জন্যে। রোমকদেরও ছিল সেই প্রবৃত্তি। ফিনীশীয়েরা নানা সমুদ্রের তীরে তীরে বাণিজ্য করে ফিরেছে, কিন্তু তারা রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করে নি।

একদা য়ুরোপ হতে বণিকের পণ্যতরী যখন পূর্ব-মহাদেশের ঘাটে ঘাটে পাড়ি জমালে তখন থেকে পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাসে এক নূতন পর্ব ক্রমশ অভিব্যক্ত হয়ে উঠল, ক্ষাত্রযুগ গেল চলে, বৈশ্যযুগ দেখা দিল। এই যুগে বণিকদের দল বিদেশে এসে তাদের পণ্যহাটের খিড়কিমহলে রাজ্য জুড়ে দিতে লাগল। প্রধানত তারা মুনফার অঙ্ক বাড়াতে চেয়েছিল, বীরের সম্মান তাদের লক্ষ্য ছিল না। এই কাজে তারা নানা কুটিল পন্থা অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত হয় নি; কারণ তারা চেয়েছিল সিদ্ধি, কীর্তি নয়।

এই সময় ভারতবর্ষ তার বিপুল ঐশ্বর্যের জন্য জগতে বিখ্যাত ছিল—তখনকার বিদেশী ঐতিহাসিকেরা সে কথা বারম্বার ঘোষণা করে গেছেন। এমন কি, স্বয়ং ক্লাইভ বলে গেছেন যে, "ভারতবর্ষের ধনশালিতার কথা যখন চিন্তা করে দেখি তখন অপহরণনৈপুণ্যে নিজের সংযমে আমি নিজেই বিস্মিত হই।"—এই প্রভূত ধন, এ কখনো সহজে হয় না—ভারতবর্ষ এ ধন উৎপন্ন

বই বইয়ের ঠিকানা

করেছিল। তখন বিদেশ থেকে যারা এসে এখানকার রাজাসনে বসেছে তারা এ ধন ভোগ করেছে, কিন্তু নষ্ট করে নি। অর্থাৎ তারা ভোগী ছিল, কিন্তু বণিক ছিল না।

তার পর বাণিজ্যের পথ সুগম করার উপলক্ষে বিদেশী বণিকেরা তাদের কারবারের গদিটার উপরে রাজতক্ত চড়িয়ে বসল। সময় ছিল অনুকূল। তখন মোগলরাজত্বে ভাঙন ধরেছে, মারাঠিরা শিখেরা এই সাম্রাজ্যের গ্রন্থিগুলো শিথিল করতে প্রবৃত্ত, ইংরেজের হাতে সেটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ধ্বংসের পথে।

পূর্বতন রাজগৌরবলোলুপেরা যখন এ দেশে রাজত্ব করত তখন এ দেশে অত্যাচার অবিচার অব্যবস্থা ছিল না এ কথা বলা চলে না কিন্তু তারা ছিল এ দেশের অঙ্গীভূত। তাদের আঁচড়ে দেশের গায়ে যা ক্ষত হয়েছিল তা ত্বকের উপরে ; রক্তপাত অনেক হয়েছে, কিন্তু অস্থিবন্ধনীগুলোকে নড়িয়ে দেয় নি। ধন-উৎপাদনের বিচিত্র কাজ তখন অব্যাহত চলছিল, এমন-কি, নবাব-বাদশাহের কাছ থেকে সে-সমস্ত প্রশ্রয় পেয়েছে। তা যদি না হত তাহলে এখানে বিদেশী বণিকের ভিড় ঘটবার কোনো কারণ থাকত না—মরুভূমিতে পঙ্গপালের ভিড় জমবে কেন ?

তার পরে ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের অশুভসংগমকালে বণিক রাজা দেশের ধনকল্পতরুর শিকড়গুলোকে কী করে ছেদন করতে লাগলেন, সে ইতিহাস শতবার-কথিত এবং অত্যন্ত শ্রুতিকটু। কিন্তু পুরাতন বলে সেটাকে বিস্মৃতির মুখঢাকা চাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা চলবে না। এ দেশের বর্তমান দুর্বহ দারিদ্র্যের উপক্রমণিকা সেইখানে। ভারতবর্ষের ধনমহিমা ছিল, কিন্তু সেটা কোন্ বাহন-যোগে দ্বীপান্তরিত হয়েছে সে কথা যদি ভুলি তবে পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসের একটা তত্ত্বকথা আমাদের এড়িয়ে যাবে। আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণাশক্তি বীর্যাভিমান নয়, সে হচ্ছে ধনের লোভ, এই তত্ত্বটি মনে রাখা চাই। রাজগৌরবের সঙ্গে প্রজাদের একটা মানবিক সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু ধনলাভের সঙ্গে তা থাকতেই পারে না। ধন নির্মম, নৈর্ব্যক্তিক। যে মুরগি সোনার ডিম পাড়ে লোভ যে কেবল তার ডিমগুলোকেই ঝুড়িতে তোলে তা নয়, মুরগিটাকে সুদ্ধ সে জবাই করে।

বণিক্‌রাজের লোভ ভারতের ধন-উৎপাদনের বিচিত্র শক্তিকেই পঙ্গু করে দিয়েছে। বাকি রয়েছে কেবল কৃষি, নইলে কাঁচা মালের জোগান বন্ধ হয় এবং বিদেশী পণ্যের হাটে মূল্য দেবার শক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ভারতবর্ষের সদ্যঃপাতী জীবিকা এই অতিক্ষীণ বৃন্তের উপর নির্ভর করে আছে।···

···ভারতবর্ষে বর্তমান বিপ্লব উপলক্ষে দণ্ডচালনা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে, তার পীড়ন ছিল ন্যূনতম মাত্রায়। এ কথা মেনে নিতে আমরা অনিচ্ছুক, কিন্তু অতীত ও বর্তমানের প্রচলিত শাসননীতির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে কথাটাকে অত্যুক্তি বলতে পারব না। মার খেয়েছি, অন্যায় মারও যথেষ্ট খেয়েছি, এবং সব চেয়ে কলঙ্কের কথা গুপ্ত মার—তারও অভাব ছিল না। একথাও বলব—

অনেক স্থলেই যারা মার খেয়েছে মাহাত্ম্য তাদেরই, যারা মেরেছে তারা আপন মান খুইয়েছে। কিন্তু সাধারণ রাষ্ট্রশাসন-নীতির আদর্শে আমাদের মারের মাত্রা ন্যূনতম বৈকি! বিশেষত আমাদের 'পরে ওদের নাড়ীর টান নেই, তা ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষকে জালিয়ানওয়ালাবাগ করে তোলা এদের পক্ষে বাহুবলের দিক থেকে অসম্ভব ছিল না। আমেরিকার সমগ্র নিগ্রোজাতি যুক্তরাজ্যের সঙ্গে নিজেদের যোগ বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে যদি স্পর্ধাপূর্বক অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হত তা হলে কিরকম বীভৎসভাবে রক্তপ্লাবন ঘটত বর্তমান শান্তির অবস্থাতেও তা অনুমান করে নিতে অধিক কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া ইটালি প্রভৃতি দেশে যা ঘটেছে তা নিয়ে আলোচনা করা বাহুল্য।···

···দেশ যারা শাসন করছে আর যে প্রজারা শাসিত হচ্ছে তাদের ভাগ্য যদি এককক্ষবর্তী হয় তা হলে অন্তত অন্নের দিক থেকে নালিশের কথা থাকে না, অর্থাৎ সুভিক্ষে দুর্ভিক্ষে উভয়ের ভাগ প্রায় সমান হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের মাঝখানে মহালোভ ও মহাসমুদ্রের ব্যবধান সেখানে অমাবস্যার তরফে বিদ্যা স্বাস্থ্য সম্মান সম্পদের কৃপণতা ঘুচতে চায় না, অথচ নিশীথরাত্রির চৌকিদারদের হাতে বুষচক্ষু লণ্ঠনের আয়োজন বেড়ে চলে। এ কথা হিসাব করে দেখতে স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের খুব বেশি খিটিমিটির দরকার হয় না যে আজ একশো বাট বৎসর ধরে ভারতের পক্ষে সর্ববিষয়ে দারিদ্র্য ও ব্রিটেনের পক্ষে সর্ববিষয়ে ঐশ্বর্য পিঠোপিঠি সংলগ্ন হয়ে আছে। এর যদি একটি সম্পূর্ণ ছবি আঁকতে চাই তবে বাংলাদেশে যে চাষী পাট উৎপন্ন করে আর সুদূর ডাণ্ডিতে যারা তার মুনফা ভোগ করে উভয়ের জীবনযাত্রার দৃশ্য পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখতে হয়। উভয়ের মধ্যে যোগ আছে লোভের, বিচ্ছেদ আছে ভোগের, এই বিভাগ দেড়শো বছরে বাড়ল বৈ কমল না।···

···কিন্তু ভারতের যে ধনে বিদেশী বণিক বা রাজপুরুষেরা ধনী তার ন্যূনতম উচ্ছিষ্টমাত্রই ভারতের ভাগে পড়ে। পাটের চাষীর শিক্ষার জন্যে স্বাস্থ্যের জন্যে সুগভীর অভাবগুলো অনাবৃষ্টির নালাডোবার মতো হাঁ করে রইল, বিদেশগামী মুনফা থেকে তার দিকে কিছুই ফিরল না। যা গেল তা নিঃশেষে গেল। পাটের মুনফা সম্ভবপর করবার জন্যে গ্রামের জলাশয়গুলি দূষিত হল—এই অসহ্য জলকষ্ট নিবারণের উদ্দেশে বিদেশী মহাজনদের ভরা থলি থেকে এক পয়সা খসল না। যদি জলের ব্যবস্থা করতে হয় তবে তার সমস্ত ট্যাক্সের টান এই নিঃস্ব নিরন্নদের রক্তের উপরই পড়ে। সাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যে রাজকোষে টাকা নেই। কেন নেই ? তার প্রধান কারণ প্রভূতপরিমাণ টাকা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণই ত্যাগ করে চলে যায়—এ হল লোভের টাকা, যাতে করে আপন টাকা ষোলোআনাই পর হয়ে যায়। অর্থাৎ, জল উবে যায় এপারের জলাশয়ে, আর মেঘ হয়ে তার বর্ষণ হতে থাকে ওপারের দেশে। সে দেশে হাসপাতালে বিদ্যালয়ে এই হতভাগ্য অশিক্ষিত অসুস্থ মুমূর্ষু ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল অপ্রত্যক্ষভাবে রসদ জুগিয়ে আসছে।

বই বইয়ের ঠিকানা

দেশের লোকের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার চরম দুঃখদুর্দশা অনেককাল স্বচক্ষে দেখে আসছি। দারিদ্র্যে মানুষ কেবল যে মরে তা নয়, নিজেকে অবজ্ঞার যোগ্য করে তোলে। তাই স্যর জন সাইমন বললেন যে :

In our view the most formidable of the evils from which India is suffering have their roots in social and economic customs of long-standing which can only be remedied by the action of the Indian people themselves.

এটা হল অবজ্ঞার কথা। ভারতের প্রয়োজনকে তিনি যে আদর্শ থেকে বিচার করছেন সেটা তাঁদের নিজেদের আদর্শ নয়। প্রচুর ধন-উৎপাদনের জন্যে যে অবারিত শিক্ষা, যে সুযোগ, যে স্বাধীনতা তাঁদের নিজেদের আছে, যে-সমস্ত সুবিধা থাকাতে তাঁদের জীবনযাত্রার আদর্শ জ্ঞানে কর্মে ভোগে নানা দিক থেকে প্রভূত পরিমাণে পরিপুষ্ট হতে পেরেছে, জীর্ণবস্ত্র শীর্ণতনু রোগ-ক্লান্ত শিক্ষাবঞ্চিত ভারতের পক্ষে সে আদর্শ কল্পনার মধ্যেই আনেন না—আমরা কোনোমতে দিনযাপন করব লোকবৃদ্ধি নিবারণ ক'রে এবং খরচপত্র কমিয়ে, আর আজ তাঁরা নিজের জীবিকার যে পরিস্ফীত আদর্শ বহন করছেন তাকে চিরদিন বহুল পরিমাণে সম্ভব করে রাখব আমাদের জীবিকা খর্ব ক'রে। এর বেশি কিছু ভাববার নেই, অতএব রেমেডির দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদেরই হাতে, যারা রেমেডিকে দুঃসাধ্য করে তুলেছে তাদের বিশেষ কিছু করবার নেই।...

...রাজকীয় লোভ ও তৎপ্রসূত দুর্বিসহ ঔদাসীন্যের চেহারাটা যখন মনের মধ্যে নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে বসেছে এমন সময়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর যথেষ্ট দেখেছি ; সে এতই উত্তুঙ্গ যে দরিদ্র দেশের ঈর্ষাও তার উচ্চ চূড়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। রাশিয়ায় সেই ভোগের সমারোহ একেবারেই নেই। বোধ করি সেইজন্যেই তার ভিতরকার একটা রূপ দেখা সহজ ছিল।

ভারতবর্ষ যার থেকে একেবারেই বঞ্চিত তারই আয়োজনকে সর্বব্যাপী করবার প্রবল প্রয়াস এখানে দেখতে পেলাম। বলা বাহুল্য, আমি আমার বহু দিনের ক্ষুধিত-দেখার ভিতর দিয়ে সমস্তটা দেখেছি। পশ্চিম-মহাদেশের অন্য কোনো স্বাধিকার-সৌভাগ্যশালী দেশবাসীর চক্ষে দৃশ্যটা কিরকম ঠেকে সে কথা ঠিকমত বিচার করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতীতকালের ভারতবর্ষের কী পরিমাণ ধন ব্রিটিশ দ্বীপে চালান গিয়েছে এবং বর্তমানে কী পরিমাণ অর্থ বর্ষে বর্ষে নানা প্রণালী দিয়ে সেই দিকে চলে যাচ্ছে তার অঙ্কসংখ্যা নিয়ে তর্ক করতে চাই নে। কিন্তু অতি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, এবং অনেক ইংরেজ লেখকও তা স্বীকার করেন যে, আমাদের দেশের রক্তহীন দেহে মন চাপা পড়ে গেছে, জীবনে আনন্দ নেই, আমরা অন্তরে বাহিরে মরছি—এবং তার root cause যে ভারতবাসীরই মর্মগত অপরাধের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ কোনো গবর্মেন্টই এর প্রতিকার করতে নিরতিশয় অক্ষম, এ অপবাদ আমরা একেবারেই স্বীকার করব না।...

...রাশিয়ায় পা বাড়িয়েই প্রথমেই চোখে পড়ল সেখানকার যে চাষী ও শ্রমিক সম্প্রদায়, আজ আট বৎসর পূর্বে, ভারতীয় জনসাধারণেরই মতো নিঃসহায় নিরন্ন নির্যাতিত নিরক্ষর ছিল, অনেক বিষয়ে যাদের দুঃখভার আমাদের চেয়ে বেশি বৈ কম ছিল না, অন্তত তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এ অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই যে উন্নতি লাভ করেছে দেড়শো বছরেও আমাদের দেশে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও, তা হয় নি। আমাদের দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ স্বদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যে দুরাশার ছবি মরীচিকার পটে আঁকতেও সাহস পায় নি এখানে তার প্রত্যক্ষ রূপ দেখলুম দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তৃত।

নিজেকে এ প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞাসা করেছি—এত বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার সম্ভবপর হল কী করে। মনের মধ্যে এই উত্তর পেয়েছি যে, লোভের বাধা কোনোখানে নেই। শিক্ষার দ্বারা সব মানুষই যথোচিত সক্ষম হয়ে উঠবে, এ কথা মনে করতে কোথাও খটকা লাগছে না। দূর এশিয়ার তুর্কমেনিস্তান-বাসী প্রজাদেরও পুরোপুরি শিক্ষা দিতে এদের মনে একটুও ভয় নেই, প্রত্যুত প্রবল আগ্রহ আছে। তুর্কমেনিস্তানের প্রথাগত মূঢ়তার মধ্যেই সেখানকার লোকের সমস্ত দুঃখের কারণ, এই কথাটা রিপোর্টে নির্দেশ করে উদাসীন হয়ে বসে নেই।

কোচিন-চায়নায় শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে শুনেছি কোনো ফরাসী পাণ্ডিত্য-ব্যবসায়ী বলেছেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজরাজ দেশী লোককে শিক্ষা দিতে গিয়ে যে ভুল করেছেন ফ্রান্স যেন সে ভুল না করেন। এ কথা মানতে হবে যে ইংরেজের চরিত্রে এমন একটা মহত্ত্ব আছে যে জন্যে বিদেশী-শাসন-নীতিতে তাঁরা কিছু কিছু ভুল করে বসেন, শাসনের ঠাস-বুনানিতে কিছু কিছু খেই হারায়, নইলে আমাদের মুখ ফুটতে হয়তো আরো এক-আধ শতাব্দী দেরি হত।...

...ভারতের যে কঠিন সমস্যা, যাতে আমরা এত কাল ধ'রে ধনে প্রাণে মনে মরছি, এ সমস্যাটা পাশ্চাত্যে কোথাও নেই। সে সমস্যাটি এই যে, ভারতের সমস্ত স্বত্ব দ্বিধাকৃত ও সেই সর্বনেশে বিভাগের মূলে আছে লোভ। এই কারণে রাশিয়ায় এসে যখন সেই লোভকে তিরস্কৃত দেখলুম তখন সেটা আমাকে যত বড়ো আনন্দ দিলে এতটা হয়তো স্বভাবত অন্যকে না দিতে পারে। তবুও মূল কথাটা মন থেকে তাড়াতে পারি নে, সে হচ্ছে এই যে, আজ কেবল ভারত নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই যে-কোনো বড়ো বিপদের জালবিস্তার দেখা যাচ্ছে তার প্রেরণা হচ্ছে লোভ—সেই লোভের সঙ্গেই যত ভয়, যত সংশয় ; সেই লোভের পিছনেই যত অস্ত্রসজ্জা, যত মিথ্যুক ও নিষ্ঠুর রাষ্ট্রনীতি।

আর-একটা তর্কের বিষয় হচ্ছে ডিক্টেটরশিপ অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যাপারে নায়কতন্ত্র নিয়ে। কোনো বিষয়েই নায়কিয়ানা আমি নিজে পছন্দ করি নে। ক্ষতি বা শাস্তির ভয়কে অগ্রবর্তী ক'রে, অথবা ভাষায় ভঙ্গিতে বা ব্যবহারে জিদ প্রকাশের দ্বারা, নিজের মতপ্রচারের রাস্তাটাকে সম্পূর্ণ সমতল করবার লেশমাত্র চেষ্টা আমি কোনোদিন নিজের কর্মক্ষেত্রে করতে পারি নে। সন্দেহ নেই যে, এক-নায়কতার বিপদ আছে বিস্তর ; তার ক্রিয়ার একতানতা ও নিত্যতা অনিশ্চিত,

বই বইয়ের ঠিকানা

যে চালক ও যারা চালিত তাদের মধ্যে ইচ্ছার অসম্পূর্ণ যোগসাধন হওয়াতে বিপ্লবের কারণ সর্বদাই ঘটে ; তা ছাড়া সবলে চালিত হওয়ার অভ্যাস চিত্তের ও চরিত্রের বলহানি করে—এর সফলতা যখন বাইরের দিকে দুই-চার ফসলে হঠাৎ আঁজলা ভরে তোলে, ভিতরের শিকড়কে দেয় মেরে।

জনগণের ভাগ্য যদি তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারাই সৃষ্ট ও পালিত না হয় তবে সেটা খাঁচা, দানাপানি সেখানে ভালো মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে নীড় বলা চলে না, সেখানে থাকতে থাকতে পাখা যায় আড়ষ্ট হয়ে। এই নায়কতা শাস্ত্রের মধ্যেই থাক্, গুরুর মধ্যেই থাক্, আর রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই থাক্, মনুষ্যত্বহানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই।...

...ডিক্টেটরশিপ একটা মস্ত আপদ, সে কথা আমি মানি এবং সেই আপদের বহু অত্যাচার রাশিয়ায় আজ ঘটছে সে কথাও আমি বিশ্বাস করি। এর নঙর্থক দিকটা জবরদস্তির দিক, সেটা পাপ ; কিন্তু সদর্থক দিকটা দেখেছি, সেটা হল শিক্ষা, জবরদস্তির একেবারে উল্টো।...

...রাশিয়াতেও সম্প্রতি নায়কের প্রবল শাসন দেখা গেল। কিন্তু এই শাসন নিজেকে চিরস্থায়ী করবার পন্থা নেয় নি—একদা সে পন্থা নিয়েছিল জারের রাজত্ব, অশিক্ষা ও ধর্মমোহের দ্বারা জনসাধারণের মনকে অভিভূত ক'রে এবং কসাকের কশাঘাতে তাদের পৌরুষকে জীর্ণ করে দিয়ে। বর্তমান আমলে রাশিয়ায় শাসনদণ্ড নিশ্চল আছে বলে মনে করি নে কিন্তু শিক্ষাপ্রচারের প্রবলতা অসাধারণ। তার কারণ, এর মধ্যে ব্যক্তি বা দলগত ক্ষমতালিপ্সা বা অর্থলোভ নেই। একটা বিশেষ অর্থনৈতিক মতে সর্বসাধারণকে দীক্ষিত করে জাতি বর্ণ ও শ্রেণী-নির্বিশেষে সকলকেই মানুষ করে তোলবার একটা দুর্নিবার ইচ্ছা আছে। তা যদি না হত তাহলে ফরাসী পণ্ডিতের কথা মানতে হত যে, শিক্ষা দেওয়াটা একটা মস্ত ভুল।

অর্থনৈতিক মতটা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য কি না সে কথা বলবার সময় আজও আসে নি ; কেননা এ মত এত দিন প্রধানত পুঁথির মধ্যেই টলে টলে বেড়াচ্ছিল, এমন বৃহৎ ক্ষেত্রে এত বড়ো সাহসের সঙ্গে ছাড়া পায় নি। যে প্রবল লোভের কাছে এই মত প্রথম থেকেই সাংঘাতিক বাধা পেত সেই লোভকেই এরা সাংঘাতিকভাবে সরিয়ে দিয়েছে। পরীক্ষার ভিতর দিয়ে পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে এ মতের কতটুকু কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আজ নিশ্চিত কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এ কথাটা নিশ্চিত বলা যেতে পারে যে, রাশিয়ায় জনসাধারণ এতকাল পরে যে শিক্ষা নির্বারিত ও প্রচুরভাবে পাচ্ছে তাতে করে তাদের মনুষ্যত্ব স্থায়ীভাবে উৎকর্ষ এবং সম্মানলাভ করল।

বর্তমান রাশিয়ায় নিষ্ঠুর শাসনের জনশ্রুতি সর্বদাই শোনা যায়—অসম্ভব না হতে পারে। নিষ্ঠুর শাসনের ধারা সেখানে চিরদিন চলে এসেছে, হঠাৎ তিরোভূত না হওয়াই সম্ভব। অথচ সেখানে চিত্রযোগে, সিনেমাযোগে, ইতিহাসের ব্যাখ্যায়, সাবেক আমলের নিদারুণ শাসনবিধি ও অত্যাচারকে সোভিয়েট

গবর্মেণ্ট অবিরত প্রত্যক্ষ করিয়ে দিচ্ছে। এই গবর্মেণ্ট নিজেও যদি এইরকম নিষ্ঠুর পথ অবলম্বন করে থাকে তবে নিষ্ঠুরাচারের প্রতি এত প্রবল করে ঘৃণা উৎপাদন করে দেওয়াটাকে আর-কিছু না হোক অদ্ভুত ভুল বলতে হবে। সিরাজউদ্দৌলা-কর্তৃক কালা-গর্তের নৃশংসতাকে যদি সিনেমা প্রভৃতি দ্বারা সর্বত্র লাঞ্ছিত করা হত তবে তার সঙ্গে সঙ্গেই জালিয়ানওয়ালাবাগের কাণ্ড করাটাকে অন্তত মূর্খতা বললে দোষ হত না। কারণ, এ ক্ষেত্রে বিমুখ অস্ত্র অস্ত্রীকেই লাগবার কথা।

সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচার-বুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ ; সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি। সেদিনকার য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় এইরকম মুখ চাপা দেওয়া এবং গবর্মেণ্ট-নীতির বিরুদ্ধবাদীর মতস্বাতন্ত্র্যকে জেলখানায় বা ফাঁসিকাঠে বিলুপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা দেখা গিয়েছিল।

যেখানে আশুফললাভের লোভ অতি প্রবল সেখানে রাষ্ট্রনায়কেরা মানুষের মতস্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে মানতে চায় না। তারা বলে ও-সব কথা পরে হবে, আপাতত কাজ উদ্ধার করে নিই। রাশিয়ার অবস্থা যুদ্ধকালের অবস্থা ; অন্তরে বাহিরে শত্রু। ওখানকার সমস্ত পরীক্ষাকে পণ্ড করে দেবার জন্যে চারিদিকে নানা ছলবলের কাণ্ড চলছে। তাই ওদের নির্মাণকার্যের ভিতটা যত শীঘ্র পাকা করা চাই, এজন্যে বলপ্রয়োগ করতে ওদের কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু গরজ যত জরুরিই হোক, বল জিনিসটা এক-তরফা জিনিস। ওটাতে ভাঙে, সৃষ্টি করে না। সৃষ্টিকার্যে দুই পক্ষ আছে, উপাদানকে স্বপক্ষে আনা চাই মারধোর ক'রে নয় তার নিয়মকে স্বীকার ক'রে।

রাশিয়া যে কাজে লেগেছে এ হচ্ছে যুগান্তরের পথ বানানো ; পুরাতন বিধিবিশ্বাসের শিকড়গুলোকে তার সাবেক জমি থেকে উপড়ে দেওয়া ; চিরাভ্যাসের আরামকে তিরস্কৃত করা। এরকম ভাঙনের উৎসাহে যে আবর্ত সৃষ্টি করে তার মাঝখানে পড়লে মানুষ তার মাত্রাজ্ঞানের আর অন্ত পায় না—স্পর্ধা বেড়ে ওঠে ; মানবপ্রকৃতিকে সাধনা করে বশ করবার অপেক্ষা আছে এ কথা ভুলে যায় ; মনে করে তাকে তার আশ্রয় থেকে ছিঁড়ে নিয়ে একটা 'সীতা-হরণ'-ব্যাপার করে তাকে পাওয়া যেতে পারে। তার পরে লঙ্কায় আগুন লাগে তো লাগুক। উপযুক্ত সময় নিয়ে স্বভাবের সঙ্গে রফা করবার তর সয় না যাদের তারা উৎপাতকে বিশ্বাস করে ; অবশেষে লাঠিয়ে পিটিয়ে রাতারাতি যা গড়ে তোলে তার উপরে ভরসা রাখা চলে না, তার উপরে দীর্ঘকালের ভর সয় না।...

...সোভিয়েট রাশিয়ার লোকশিক্ষা সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য সে আমি বলেছি, তা ছাড়া সেখানকার পলিটিক্স্ মুনাফা-লোলুপদের লোভের দ্বারা কলুষিত নয় বলে রাশিয়া-রাষ্ট্রের অন্তর্গত নানাবিধ প্রজা জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সমান অধিকারের দ্বারা ও প্রকৃষ্ট শিক্ষার সুযোগে সম্মানিত হয়েছে এ কথাটারও

বই বইয়ের ঠিকানা

আলোচনা করেছি। আমি ব্রিটিশ-ভারতের প্রজা বলেই এই দুটি ব্যাপার আমাকে এত গভীরভাবে আনন্দ দিয়েছে।

এখন বোধ করি একটি শেষ প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হবে। বলশেভিক অর্থনীতি সম্বন্ধে আমার মত কী এ কথা অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন। আমার ভয় এই যে, আমরা চিরদিন শাস্ত্রশাসিত পাণ্ডাচালিত দেশ, বিদেশের আমদানি বচনকে একেবারেই বেদবাক্য বলে মেনে নেবার দিকেই আমাদের মুগ্ধ মনের ঝোঁক। গুরুমন্ত্রের মোহ থেকে সামলিয়ে নিয়ে আমাদের বলা দরকার যে, প্রয়োগের দ্বারাই মতের বিচার হতে পারে, এখনো পরীক্ষা শেষ হয় নি। যে-কোনো মতবাদ মানুষসম্বন্ধীয়, তার প্রধান অংশ হচ্ছে মানবপ্রকৃতি। এই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য কী পরিমাণে ঘটবে তার সিদ্ধান্ত হতে সময় লাগে। তত্ত্বটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করবার পূর্বে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তবু সে সম্বন্ধে আলোচনা করা চলে, কেবলমাত্র লজিক নিয়ে বা অঙ্ক কষে নয়— মানবপ্রকৃতিকে সামনে রেখে।

মানুষের মধ্যে দুটো দিক আছে, একদিকে সে স্বতন্ত্র আর-এক দিকে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত। এর একটাকে বাদ দিলে যেটা বাকি থাকে সেটা অবাস্তব। যখন কোনো-একটা ঝোঁকে পড়ে মানুষ একদিকেই একান্ত উধাও হয়ে যায় এবং ওজন হারিয়ে নানাপ্রকার বিপদ ঘটাতে থাকে, তখন পরামর্শদাতা এসে সংকটটাকে সংক্ষেপ করতে চান, বলেন, 'অন্যদিকটাকে একেবারেই ছেঁটে দাও।' ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যখন উৎকট স্বার্থপরতায় পৌঁছিয়ে সমাজে নানাপ্রকার উৎপাত মথিত করে তখন উপদেষ্টা বলেন, 'স্বার্থ থেকে স্ব'টাকে এক কোপে দাও উড়িয়ে, তা হলেই সমস্ত ঠিক চলবে।' তাতে হয়তো উৎপাত কমতে পারে, কিন্তু চলা বন্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়া গাড়িটাকে খানায় ফেলবার জো করে—ঘোড়াটাকে গুলি করে মারলেই যে তার পর থেকে গাড়িটা সুস্থভাবে চলবে, এমন চিন্তা না করে লাগামটা সম্বন্ধে চিন্তা করবার দরকার হয়ে ওঠে।···

···মোট কথা হচ্ছে, আধুনিক কালে ব্যক্তিগত ধনসঞ্চয় ধনীকে যে প্রবল শক্তির অধিকার দিচ্ছে তাতে সর্বজনের সম্মান ও আনন্দ থাকতে পারে না। তাতে এক পক্ষে অসীম লোভ, অপর পক্ষে গভীর ঈর্ষা, মাঝখানে দুস্তর পার্থক্য। সমাজে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতা অসম্ভব বড়ো হয়ে উঠল। এই প্রতিযোগিতা নিজের দেশের এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর, এবং বাহিরে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের। তাই চার দিকে সংশয়হিংস্র অস্ত্র শাণিত হয়ে উঠছে, কোনো উপায়েই তার পরিমাণ কেউ খর্ব করতে পারছে না। আর পরদেশী যারা এই দুরস্থিত ভোগরাক্ষসের ক্ষুধা মেটাবার কাজে নিযুক্ত তাদের রক্তবিরল কৃশতা যুগের পর যুগে বেড়েই চলেছে। এই বহুবিস্তৃত কৃশতার মধ্যে পৃথিবীর অশান্তি বাসা বাঁধতে পারে না এ কথা যারা বলদর্পে কল্পনা করে তারা নিজের গোঁয়ার্তুমির অন্ধতার দ্বারা বিড়ম্বিত। যারা নিরন্তর দুঃখ পেয়ে চলেছে সেই

হতভাগারাই দুঃখবিধাতার প্রেরিত দূতদের প্রধান সহায়; তাদের উপবাসের মধ্যে প্রলয়ের আগুন সঞ্চিত হচ্ছে।

বর্তমান সভ্যতার এই অমানবিক অবস্থায় বলশেভিক নীতির অভ্যুদয়। বায়ুমণ্ডলের এক অংশে তনুত্ব ঘটলে ঝড় যেমন বিদ্যুদ্দন্ত পেষণ করে মারমূর্তি ধরে ছুটে আসে, এও সেইরকম কাণ্ড। মানবসমাজে সামঞ্জস্য ভেঙে গেছে বলেই এই একটা অপ্রাকৃতিক বিপ্লবের প্রাদুর্ভাব। সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির উপেক্ষা ক্রমশই বেড়ে উঠছিল বলেই সমষ্টির দোহাই দিয়ে আজ ব্যষ্টিকে বলি দেবার আত্মঘাতী প্রস্তাব উঠেছে। তীরে অগ্নিগিরির উৎপাত বাধিয়েছে বলে সমুদ্রকেই একমাত্র বন্ধু বলে এই ঘোষণা। তীরহীন সমুদ্রের রীতিমত পরিচয় যখন পাওয়া যাবে তখন কূলে ওঠবার জন্যে আবার আঁকুবাঁকু করতে হবে। সেই ব্যষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা কখনোই মানুষ চিরদিন সইবে না। সমাজ থেকে লোভের দুর্গগুলোকে জয় করে আয়ত্ত করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে বৈতরণী পার করে দিয়ে সমাজরক্ষা করবে কে? অসম্ভব নয় যে, বর্তমান রুগ্ণ যুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসা; কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না, বস্তুত ডাক্তারের শাসন যেদিন ঘুচবে সেই দিনই রোগীর শুভদিন।

আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে পল্লীতে ধন-উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায়নীতির জয় হোক, এই আমি কামনা করি। কারণ, এই নীতিতে যে সহযোগিতা আছে তাতে সহযোগীদের ইচ্ছাকে চিন্তাকে তিরস্কৃত করা হয় না বলে মানবপ্রকৃতিকে স্বীকার করা হয়। সেই প্রকৃতিকে বিরুদ্ধ করে দিয়ে জোর খাটাতে গেলে সে জোর খাটবে না।

এইসঙ্গে একটা কথা বিশেষ করে বলা দরকার। আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের দেশের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক তখন কখনো ইচ্ছে করি নে যে গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সেইরকম সংস্কার, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও কর্ম, যা গ্রামসীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত—বর্তমান যুগের যে প্রকৃতি তার সঙ্গে যা কেবলমাত্র পৃথক নয়, যা বিরুদ্ধ। বর্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী, যদিও তার হৃদয়ের অনুবেদনা সম্পূর্ণ সে-পরিমাণে ব্যাপক হয় নি। গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে যে প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনো দিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।

ইংলণ্ডে একদা কোনো-এক গ্রামে একজন কৃষকের বাড়িতে ছিলুম। দেখলুম লণ্ডনে যাবার জন্যে ঘরের মেয়েগুলির মন চঞ্চল। শহরের সর্ববিধ ঐশ্বর্যের তুলনায় গ্রামের সম্বলের এত দীনতা যে, গ্রামের চিত্তকে স্বভাবতই সর্বদা শহরের দিকে টানছে। দেশের মাঝখানে থেকেও গ্রামগুলির যেন নির্বাসন। রাশিয়ায় দেখেছি—গ্রামের সঙ্গে শহরের বৈপরীত্য ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা। এই চেষ্টা যদি ভালো করে সিদ্ধ হয় তাহলে শহরের অস্বাভাবিক অতিবৃদ্ধি নিবারণ হবে। দেশের প্রাণশক্তি চিন্তাশক্তি দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আপন কাজ করতে পারবে।···

বই বইয়ের ঠিকানা